শ্রীঅর্চ্চনাপুরী

প্রকাশক:
স্বামী সুরেশ্বরানন্দ,
শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম,
সিউড়ি (বীরভূম)

তৃতীয় সংস্করণ:
শ্রীসত্যানন্দ-শুভ-দ্বিতীয়া,
৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬২

প্রাপ্তিস্থান:

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম
সিউড়ি (বীরভূম)

শ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তন
২, প্রাণকৃষ্ণ সাহা লেন,
বরাহনগর, কলিকাতা-৩৬

শ্রীসত্যানন্দ দেবায়তন
১, ইব্রাহিমপুর রোড, যাদবপুর,
কলিকাতা-৩২

ন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস
এ/৬৮, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট,
কলিকাতা-১২

মহেশ লাইব্রেরী
২/১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

মুদ্রক:
শ্রীত্রিদিবেশ বসু,
কে. পি. বসু প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
১১, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন,
কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

"মা"

নিবেদন

[প্রথম সংস্করণ]

আজ জগৎ জুড়ে স্থুরু হয়ে গেছে শ্রীশ্রীমা'র পূজা-আরাধনা।

সকলেই আনে তাদের নিবেদন-সম্ভার।

ক্ষুদ্র ও দীন হলেও, এই বিশ্বজোড়া আয়োজনে আমাদেরও আছে অংশ, তাই আমরাও ক'রেছি যোগাড়, সামর্থ্য অনুযায়ী পূজা-উপায়ন, বিশ্বজননী শ্রীশ্রীসারদেশ্বরীদেবীর শতবার্ষিকী উপলক্ষে।

লেখিকা তাঁর ধ্যান ও অনুভূতির সুরকম্পনে রচনা ক'রেছেন এই বইখানি।

উদ্দেশ্য : ঈশ্বর-প্রীতি।

ভুল, দোষ সব মার্জ্জনা ক'রবেন লেখিকার বয়সের মাপকাঠিতে। শ্রদ্ধা জানাই প্রচ্ছদপটের নন্দিত শিল্পী শ্রীনন্দলাল বসুকে। শ্রদ্ধা জানাই সুচিন্তিত ভূমিকা-লেখক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য অধ্যাপক ডঃ সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে।

ব্রহ্মচারী শ্রীযুক্ত অক্ষয়চৈতন্যের 'জননী সারদেশ্বরী', শ্রীআশুতোষ মিত্রের 'শ্রীমা', 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশিত 'শ্রীমা'র কথা' ও স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের এবং বিক্ষিপ্তভাবে প্রাপ্ত কয়েকটি বইয়ের সাহায্য-গ্রহণের ঋণ স্বীকার করি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে।

সন্ন্যাসিনী সুমনাপুরী
(প্রকাশিকা)

নিবেদন

[তৃতীয় সংস্করণ]

'জননী সারদেশ্বরী'র প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ামাত্র বিদগ্ধ পাঠকমহলে গ্রন্থটি বিশেষ সমাদর-লাভ করে। ফলে, দ্বিতীয় সংস্করণও দ্রুত শেষ হয়ে যায়। কিন্তু নানা কারণে পুস্তকটির তৃতীয়-সংস্করণ-প্রকাশে বিলম্ব ঘটতে থাকে। অবশেষে পাঠকবর্গের চাহিদাই তৃতীয়-সংস্করণ-প্রকাশের কাজকে ত্বরান্বিত ক'রেছে। পাঠকের সুবিধার্থে এই গ্রন্থে শ্রীশ্রীসারদামা'র জীবনলীলার বিশেষ বিশেষ ঘটনাবলীর একটি সূচী সন্নিবেশিত হয়েছে। ছাপার দোষ-ত্রুটীও এই সংস্করণে বহুলাংশে সংশোধন করা হয়েছে।

স্বামী সুরেশ্বরানন্দ
(প্রকাশক)

ভূমিকা

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায় নমঃ ওঁ

ওঁ শ্রীশ্রী ১০০৮ শ্রীঠাকুর সত্যানন্দদেবো জয়তি

বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে।
সারদারামকৃষ্ণাখ্যৌ বন্দেঽহং পিতরৌ সতাম্ ॥১॥

জগজ্জননী মহামায়াখ্যা পরিপূর্ণা ভগবচ্ছক্তি নারীমূর্ত্তিতে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন জননী শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী দেবীরূপে। তাঁহার মহিমা পূর্ণভাবে বুঝিতেন ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব। তাঁহারই প্রদত্ত দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়া জননীর ঐশ্বরিক রূপ ও বিভূতি উপলব্ধি করিয়াছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণতনয়বৃন্দ-- স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী সারদানন্দ প্রমুখ লীলার অন্তরঙ্গ পার্ষদবৃন্দ। নিজের মধ্যে মহত্ত্ব না থাকিলে মহত্ত্বের অনুভব ও সমাদর করা অসম্ভব। মাদৃশ অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন রাগদ্বেষবশীভূত ব্যক্তির পক্ষে শ্রীশ্রীমাতার সম্বন্ধে কোন উক্তি করা ধৃষ্টতার পরিচায়কমাত্র নহে, ইহা অপরাধও। কিন্তু মহাকবি কালিদাসের উক্তি,—"আজ্ঞা গুরূণাং হ্যবিচারণীয়া"—গুরুজনের আদেশ বিনা বিচারে পালন করিতে হইবে। মহাকবির এই উপদেশ ও আদেশের অনুবর্ত্তনে স্বামীজি মহারাজদিগের বাক্যে অভিব্যক্ত শ্রীশ্রীঠাকুরের অভিপ্রায় অবগত হইয়া ভীতভীতচিত্তে আমি শ্রীঅর্চ্চনাপুরী বিরচিত জননী শ্রীশ্রীসারদেশ্বরীর জীবনালেখ্যের মুখবন্ধ লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। সাধুগণ এই অসমসাহসিকতা মার্জ্জনা করিবেন সন্দেহ নাই। মাতা অর্চ্চনাপুরী এই জীবনালেখ্য অঙ্কিত করিয়াছেন ভক্তির আবেশে। তাঁহার চিত্ত শ্রীশ্রীমাতার ধ্যানরসে পরিপূর্ণ হইয়া পূর্ণকুম্ভের ন্যায় অতিরিক্ত ভাবাবেগে উচ্ছলিত হইয়া পরিণতি লাভ করিয়াছে ভাষায়। ভগবতী শ্রুতি বলিয়াছেন, "যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥" ভগবান্ নিজেকে স্বেচ্ছায় ভক্তিরজ্জুতে আবদ্ধ করেন এবং তাঁর স্বরূপ উপলব্ধি করিবার যোগ্য দিব্যচক্ষু দান করেন। তাই সম্ভব হইয়াছে এইরূপ হৃদয়বিদ্রাবী আখ্যানের রচনা। যাঁহারা ঐতিহাসিক, ইতিহাসের পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্যের অনুসন্ধানে নিরত, তাঁহারা বাহ্যবস্তুর ও বৃত্তান্তের বিবরণের দ্বারা ব্যক্তিচিত্তের প্রতিবিম্ব রচনা করেন। মহাপুরুষ ও মহীয়সী

দেবীগণের পূর্ণ মহিমা মর্ত্ত্যজগতের বৃত্তান্ত সঙ্কলনের দ্বারা চরিতার্থ হয় না। এই বৃত্তান্তও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উক্তি, ইঙ্গিত ও ক্রিয়ার অভ্যন্তরে যে তাৎপর্য্য ও রহস্য বিদ্যমান, তাহার উদ্ভেদন করা কেবল মনীষার সাহায্যে সম্ভব হয় না। যিনি দিব্য অনুভূতির অধিকারী এবং দিব্য চরিত্রের অভ্যন্তরবর্ত্তী দিব্যভাবের সন্ধান পান তিনি কোন্‌টি তাৎপর্য্যপূর্ণ এবং সে তাৎপর্য্যই বা কত গভীর ও গূঢ় তাহা উপলব্ধি করেন এবং উপযুক্ত বাগ্‌বিভূতি লাভ করিয়া সামান্য অধিকারীর নিকট বোধ্য ও উপাদেয় করিয়া প্রতিপাদন করিতে সমর্থ হন। এই জীবনচরিত আমার উক্তির সারবত্তা প্রমাণ করিবে।

ভগবতীর দিব্যলীলার নানা বিবরণ শ্রুতি হইতে আরম্ভ করিয়া পুরাণ ও কাব্যের মধ্যে চিত্রিত হইয়াছে। কিন্তু সেই সমস্ত লীলায় দেবী তাঁহার ষড়ৈশ্বর্য্যে পরিপূর্ণা। প্রয়োজন সিদ্ধ হইলেই তিনি অন্তর্হিতা হইয়াছেন ভক্তজনের লোচনবৃন্দের অন্তরালে। দেবীমাহাত্ম্যে দেবীর অবতরণের কথা নানাভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে। স্বয়ং দেবীর শ্রীমুখের বাণী, এই মাহাত্ম্য পাঠ ও শ্রবণ পরম স্বস্ত্যয়ন, মহামারী সমুদ্ভূত অশেষ উপদ্রববিনাশকারী, এবং ত্রিবিধ আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক দুঃখসমূহের প্রশমন ইহার সদ্যোলব্ধ ফল। ঋষি স্বকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন, "তামুপৈহি মহারাজ শরণং পরমেশ্বরীম্। আরাধিতা সৈব নৃণাং ভোগস্বর্গাপবর্গদা॥" মহারাজ সুরথ শত্রু কর্ত্তৃক অপহৃত স্বীয় রাজ্যের উদ্ধার কামনা করিয়াছিলেন। সে কামনা দেবীর বরে অনায়াসে সিদ্ধ হইয়াছিল এবং মৃত্যুর পর ভগবান্ বিবস্বানের পুত্ররূপে বৈবস্বত মনু নামে জগতে প্রখ্যাত হইবেন। তাঁহার অভিলষিত বরের অধিক ঐশ্বর্য্য দেবী তাঁহাকে দান করিলেন। ইহাই অধ্যাত্ম জগতের নিয়ম। অল্প চাহিলেও তাহা অতিরিক্ত ইষ্টলাভেরই হেতু হয়। তাঁহার ভাণ্ডার অক্ষয়, পুনঃ পুনঃ ব্যয় ও উৎসর্গের মধ্যেও তাহা পরিপূর্ণ থাকে—শ্রুতি যাহার নির্দ্দেশ করিয়াছেন—"পূর্ণমিদং পূর্ণমদঃ পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে। পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।" ইহা ভিতরেও পূর্ণ, বাহিরেও পূর্ণ। পূর্ণ হইতে পরিপূর্ণের নির্গম। অথচ পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে। লৌকিক মানদণ্ডের দ্বারা ইহার স্বরূপ নিরূপণ করা অসম্ভব। অনন্তের স্বরূপই ইহাই। একজন য়ুরোপীয় গাণিতিক অনন্তের লক্ষণ নিরূপণ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "The infinite is that of which every part is infinite." তাহাই অনন্ত যাহার প্রত্যেক অংশই অনন্ত। কথাটি প্রহেলিকা নহে। তাহা তিনি প্রমাণ করিয়াছেন অঙ্কশাস্ত্রের সাহায্যে। এক একটি অঙ্ক ১, ২, ৩ প্রভৃতি অঙ্কের সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়

অনন্ত পর্য্যন্ত এবং ইহাদের প্রত্যেক সংখ্যারই বিভাগ করিতে পারা যায় $\frac{১}{২}$, $\frac{১}{৪}$, $\frac{১}{৮}$ প্রভৃতি অনন্ত সংখ্যায়। অনন্ত সংখ্যার অংশভূত এক একটি সংখ্যাও অনন্ত। দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক চিন্তার সাহায্যে এইরূপ এক একটি তত্ত্বে আমরা উপনীত হইয়া থাকি যাহা জগতের চরম ও পরম তত্ত্ব ও প্রতিষ্ঠা, বেদান্ত যাহাকে সচ্চিদানন্দ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এইরূপ সত্যের অস্পষ্ট অনুভূতির সন্ধান দেয়। কিন্তু ইহার অনাবৃত স্বরূপ পরিপূর্ণরূপে অভিব্যক্ত হয় তত্ত্বজ্ঞানীর চিত্তে। এই তত্ত্বজ্ঞানলাভের উপায়রূপে নানা সাধনার অবতারণা হইয়াছে ভারতভূমিতে এবং তাহার বাহিরেও। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মযোগের উপদেশ প্রপঞ্চসহকারে বিবৃত হইয়াছে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ও তাঁহার অনুবর্ত্তী ব্যাখ্যাকারগণ এবং পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামী গীতার বাক্য ও পদসমূহের তাৎপর্য্য বিচার করিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে, সমস্ত সাধনার চরম পরিণতি ঘটে তত্ত্বজ্ঞানে। "সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে," "ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ। ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥" কর্ম্ম ও ভক্তিযোগ জ্ঞানযোগে উপনীত করে সাধকের সাধনা।

এই দুষ্ট কলিযুগে অর্থকাম সাধনায় নিরত মানববৃন্দের প্রকৃত ও সুখসাধ্য মার্গ ভক্তিযোগ। এই ভক্তিযোগের সাধন ও পরিপোষণ হয় অবতারগণের লীলা শ্রবণে ও চিন্তনে। যাহারা শমদমাদি সাধনসম্পদের বহুদূরে অবস্থিত, তাহাদেরও ভগবৎ প্রাপ্তি হইতে পারে কেবল ভক্তির সাহায্যে। ভগবান্ বলিয়াছেন যে, অতি দুরাচার ব্যক্তিও ভগবদ্ ভজনার দ্বারা শ্রেয়োমার্গে প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীশ্রীজননী সারদেশ্বরীর এই জীবন চরিত্র শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের দ্বারা অনুশীলিত হইলে মানবের শ্রেয়োলাভের পন্থা নিষ্কণ্টক হইবে। ঐহিক ভোগ, পারত্রিক স্বর্গ এবং পরিণামে অপবর্গ আরাধিতা হইয়া দেবী প্রসন্নচিত্তে দান করেন—ইহা শাস্ত্রবাক্য এবং সিদ্ধ, ঋষি এবং আচার্য্যগণের পুনঃপুনঃ অনুভবের দ্বারা সুপরীক্ষিত। অবিশ্বাস করিবার কোন যুক্তিসঙ্গত হেতু নাই। শাস্ত্রবাক্যানুসারে এবং তত্ত্বদর্শী সদ্গুরুর উপদিষ্ট সাধনমার্গের অনুবর্ত্তন করিয়া আজ পর্য্যন্ত কেহ বিফল মনোরথ হন নাই। বিনা পরীক্ষায় এই নিঃশ্রেয়স লাভের প্রশস্তরাজমার্গ অনঙ্গীকার করা অন্ধতার পরিচায়ক এবং হেতু।

রাগদ্বেষকলুষিতচিত্ত মাদৃশ সঙ্কীর্ণবুদ্ধি ব্যক্তির পক্ষে তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ দেওয়া বিড়ম্বনামাত্র। ইহা আত্মপ্রবঞ্চনা ও পরপ্রবঞ্চনার নিমিত্তমাত্রই হইয়া থাকে। তথাপি শাস্ত্রবাক্যের যৌক্তিক অনুশীলনের দ্বারা যাহা বোধপদবীতে

আরূঢ় হইয়াছে, তাহারই আভাসমাত্র প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিলাম। অন্ধের হস্তিদর্শনের ন্যায় অজ্ঞানাচ্ছন্ন সংসারী জীবের পক্ষে তত্ত্বজ্ঞানের প্রচেষ্টা বা উপদেশ একদেশদর্শিতাদোষেই দুষ্ট নহে, তাহা অনেক সময় বিপরীত বুদ্ধির সৃষ্টি করে। ঈদৃশ ন্যূনতা সম্বন্ধে আমি সচেতন থাকিতে চেষ্টা করি। মনুষ্যমাত্রেরই ভগবত্তত্ত্ব যাহা সমস্ত অবান্তর তত্ত্বসমূহকে স্বস্বরূপে বিধৃত করিয়া থাকে, সেই তত্ত্বের জিজ্ঞাসা স্বল্প বা অধিক মাত্রায় উদিত হয়। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারতত্ত্বের স্বরূপ বুঝিতে পারিবেন তিনি যিনি তদ্‌গতচিত্ত এবং তদ্‌গতপ্রাণ। যাঁহারা শাস্ত্রবাক্যের যৌক্তিক ব্যাখ্যা ও উপপাদন দ্বারা স্বীয় জিজ্ঞাসা চরিতার্থ করিতে সচেষ্ট হন সেই পণ্ডিতসমাজের মধ্যে আমি একজন অতি নিম্নশ্রেণীর অধিকার-লিপ্সু। যৌক্তিক বুদ্ধিতে আমার চিত্তে যে প্রশ্ন উদিত হইয়াছে তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি। পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ স্বামী বিবেকানন্দ ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের যে প্রণাম মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন তাহারই মীমাংসাসম্মত রীতিতে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিব। মন্ত্রটি সুবিদিত, তাহা এই—"স্থাপকায় চ ধর্ম্মস্য সর্ব্বধর্ম্মস্বরূপিণে। অবতারবরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ॥" যিনি ধর্ম্মের সংস্থাপক, যিনি স্বয়ং সর্ব্বধর্ম্মের স্বরূপ এবং যিনি অবতারবরিষ্ঠ সেই রামকৃষ্ণ তুমি, তোমাকে নমস্কার। ধর্ম্মের অননুভূতপূর্ব্ব গ্লানির মুহূর্ত্তে ভগবান্ রামকৃষ্ণের ধর্ম্মস্থাপনের কথা বিশেষ যুক্তি-তর্কের দ্বারা প্রতিপাদন করার প্রয়োজন নাই। যখন ইংরেজের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়সমূহে তাহাদের প্রবর্ত্তিত শিক্ষাপ্রণালীতে ব্যুৎপন্ন হইয়া হিন্দুধর্ম্মের সমস্ত আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে হিন্দুবংশোদ্ভূত বিদ্যার্থিবৃন্দ কেবল কুসংস্কার ও অজ্ঞানের পরিচয়মাত্র পাইত এবং নিজেদের জন্ম ও সংস্কারকে ধিক্কার দিয়া বিজেতা রাজপুরুষগণের খৃষ্টীয় ধর্ম্ম বরণ করিতে গৌরব বোধ করিত, যখন হিন্দুধর্ম্ম কেবল পৌত্তলিকতার আড়ম্বরমাত্র বলিয়া গৃহীত হইত এবং এই ধর্ম্মের সাহায্যে ভগবৎপ্রাপ্তির কোন সম্ভাবনা নাই এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হইতেছিল, তখন হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃতস্বরূপ আবরণমুক্ত করিয়া দেখাইয়াছিলেন ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ। সাকার ও নিরাকার উপাসনার বিবাদ চিরতরে প্রশমিত হইয়াছিল যাঁহার অনাড়ম্বর, অতি সহজ, অতি সরল ধর্ম্মপ্রবচন ও লীলার মধ্যে, তিনি যে ধর্ম্মের সংস্থাপক তাহা স্বতঃসিদ্ধ। বাক্য ও যুক্তির দ্বারা ইহা প্রমাণিত করিবার চেষ্টা পুনরুক্তি দোষে কলঙ্কিত হইবেই।

এখন 'সর্ব্বধর্ম্মস্বরূপিণে' এই দ্বিতীয় বিশেষণের আলোচনা করা যাক্। তৎকালপ্রবৃত্ত নানা ধর্ম্ম সাধনায় অনুবর্ত্তন করিয়া ভগবান্ রামকৃষ্ণ দেখিলেন

এবং দেখাইলেন যে একই ঈশ্বরতত্ত্বে সকলেরই পরিসমাপ্তি। তিনি প্রমাণ করিলেন এই জগতের মূলতত্ত্ব ও বিধর্ত্তা এক পরমেশ্বর। নানা নামে, নানা ভাষায়, নানা ভঙ্গীতে, নানা অনুষ্ঠানের বৈচিত্র্যে সকলেই তাঁহারই উপাসনা করে। এই সত্যের ঘোষণা অপৌরুষেয় ঋগ্বেদে আমরা পাইয়াছিলাম। "একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি"। ঈশ্বর এক ভিন্ন দ্বিতীয় নাই—এই তত্ত্ব মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছেন ভারতবর্ষের ঋষি ও আচার্য্যগণ ; ইহারই স্থূল ও প্রত্যক্ষ প্রকাশ ও অভিব্যক্তি অবতারগণের লীলায় এবং অতিসাধারণ অতিহীন হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীও প্রাণে প্রাণে ইহা বিশ্বাস করে। গীতায় উক্ত হইয়াছে—সমস্ত কর্ম্মই দোষের দ্বারা আবৃত, যেমন অগ্নি ধূমের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়, অতএব পূর্ব্বপুরুষাচরিত ধর্ম্মবুদ্ধিতে অনুষ্ঠীয়মান উপাসনাপদ্ধতির পরিত্যাগ নিষ্প্রয়োজন মাত্র নহে—তাহা অকল্যাণেরই হেতু। "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ"। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই বাণী পাশ্চাত্ত্যশিক্ষাদুর্ব্বিদগ্ধ দুরভিমানী হিন্দুসন্তান বিস্মৃত হইয়া যখন অকল্যাণের মার্গে বহ্নিলুব্ধ শলভের ন্যায় আত্মাহুতি প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তখন ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ দেখাইয়া দিলেন যে হিন্দুর ধর্ম্মানুষ্ঠানে, বিশ্বাসে বা সাধনায় লজ্জা বা হীনতাবোধের কোন কারণ নাই। প্রত্যুত তিনি প্রমাণিত করিলেন যে, একমাত্র ঋষিগণের দ্বারা প্রচারিত এবং ভগবতী শ্রুতির দ্বারা প্রতিপাদিত যে ধর্ম্ম, তাহাই ধর্ম্ম। যাহারা ছলে-বলে-কৌশলে পাশবিক নিগ্রহ ও উৎপীড়নের দ্বারা কিংবা ভোগবাসনা উদ্দীপিত করিয়া অর্থ ও পদ-মর্য্যাদার প্রলোভন দ্বারা ঋষিদিগের বংশধরগণকে স্বধর্ম্মচ্যুত করিতে ও পরধর্ম্ম গ্রহণ করিতে প্রণোদিত করিতেছিল—তাহাদের ধর্ম্ম কেবলমাত্র পরধর্ম্ম নহে, তাহা উপধর্ম্ম বা অপধর্ম্ম।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে পরধর্ম্ম যে কিরূপ ভয়াবহ হইতে পারে, তাহার পরিচয় আমরা সদ্যঃ পাইয়াছি। অবতার ঋষিগণের চরণরজঃ ধারণ করিয়া ভারতভূমি যে অখণ্ড সত্তায় অনাদিকাল হইতে বিরাজমান ছিল তাহা আজ পরধর্ম্মের প্রচারের ফলে এবং স্বধর্ম্ম পরিত্যাগের পরিণামস্বরূপ দ্বিধাবিভক্ত বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। ভারতবসুন্ধরার দক্ষিণ ও বাম হস্ত আজ ছিন্ন ও বিচ্ছিন্ন। পরধর্ম্মাবলম্বীর প্রাণহরণ, সম্পদলুণ্ঠন, নারীর ধর্ষণ যে ধর্ম্মের অনুশাসনের ফলে স্বর্গপ্রাপ্তির প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহা যে ভয়াবহ ইহা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বহুপূর্ব্বেই প্রচার করিয়াছেন। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ পরধর্ম্মের কবল হইতে আর্য্যধর্ম্মকে রক্ষা করিলেন। "যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥" ভারতবাসী আর্য্যধর্ম্মানুবর্ত্তী মানবতার

নিকট ভগবানের এই প্রতিশ্রুতি কখনও অপালিত হয় নাই। ভারতবর্ষের অভূতপূর্ব্ব সঙ্কটের দিনে তাই তাঁহাকে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল শ্রীরামকৃষ্ণ-রূপে। ধর্ম্মের স্বরূপ একটি কথায় তিনি ব্যক্ত করিলেন—কামিনীকাঞ্চন পরিত্যাগ। হিন্দুধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য পরনারীতে মাতৃত্ববোধে এবং একমেবাদ্বিতীয়ম্ যিনি তাঁহার উপাসনায়। যাঁহারা বাহ্যতঃ একেশ্বরবাদী অথচ অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদের উপাস্য ঈশ্বরকে অবজ্ঞা করেন, তাঁহারাই বস্তুতঃ বহু ঈশ্বরবাদী। তাঁহাদের ঈশ্বর কোন জাতিবিশেষের প্রতিভূ। অন্যজাতির ধ্বংসসাধনই সেই ঈশ্বরের আরাধনার প্রকৃষ্টতম মার্গ। হিন্দু বিশ্বাস করেন ঈশ্বর এক এবং যে কোন ভাষায়, পদ্ধতি বা অনুষ্ঠানে তাঁহার উপাসনা হউক, তাহা যদি ঐকান্তিক ভক্তি ও আস্তিক্যবুদ্ধির দ্বারা প্রণোদিত হয়, তবে তাহা একই ঈশ্বরের চরণে উপস্থিত হইবে। সেইজন্য হিন্দু—মুসলমান বা খৃষ্টানের ধর্ম্মোপাসনায় বাধা সৃষ্টি করে না। ইহা দুর্ব্বলতার অভিব্যক্তি নহে। প্রবল পরাক্রম ম্লেচ্ছনিধনকারী মহারাজ ছত্রপতি শিবাজীর সাম্রাজ্যে মুসলমান ও খৃষ্টানের ধর্ম্মানুষ্ঠান অব্যাহতই ছিল। মহারাজ রণজিৎ সিংহের সাম্রাজ্যে মুসলমান বা খৃষ্টানের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় নাই। ইহার কারণ হিন্দুর এই একমেবাদ্বিতীয় ঈশ্বরে পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা। যাঁহারই পূজা হউক, যেই বা পূজা করুক, তাহা পরমেশ্বরেরই পূজা এবং এই পরমেশ্বর এক বই দ্বিতীয় নন। বর্ত্তমানে হিন্দুবংশধরগণ এই তত্ত্ব প্রণিধান করিলে স্বজাতিকে বীর্য্যবান্, শক্তিমান্ ও জ্ঞানবান্ করিতে সমর্থ হইবে। ভগবান্ রামকৃষ্ণের সর্ব্বধর্ম্মস্বরূপতার ব্যাখ্যা করা হইল।

এখন তৃতীয় বিশেষণের ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। অবতারবরিষ্ঠায়। ভগবান্ রামকৃষ্ণ অবতারবরিষ্ঠ। ইহা কি স্তুতি (Flattery) না ভূতার্থবাদ (Statement of Truth)? যাহাতে যে গুণ নাই সেই গুণের আরোপ করার নাম স্তুতি। ভূতার্থ বা সত্যার্থকথনের নাম ভূতার্থবাদ। কালিদাসের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতে চাই যে ইহা "ভূতার্থব্যাহৃতি সাহি ন স্তুতিঃ পরমেষ্ঠিনঃ"। ইহা পরমপুরুষের স্তুতি নহে—ইহা ভূতার্থব্যাহৃতি। ইহা সত্যের যথার্থস্বরূপের প্রতিপাদক। মহাকবি ভবভূতি বলিয়াছেন—"ঋষীণাং পুনরাদ্যানাং বাচমর্থোঽনুধাবতি"—ক্রান্তদর্শী আর্য্যজ্ঞানসম্পন্ন মহাপুরুষদিগের বচন অসত্য হইতে পারে না এবং তাহা নিরর্থকও নয়। আর্বাগ্দর্শিগণ অর্থানুসন্ধান করিয়া শব্দ প্রয়োগ করেন, কিন্তু লোকোত্তর প্রভাবশালী মহানুভব পুরুষগণের উক্তি এইরূপ নহে। অর্থই তাঁহাদের বাক্যের অনুসরণ করিয়া থাকে। আমাদের বুদ্ধি ও জ্ঞানানুসারে এই বিশেষণের সার্থকতা বিচার করিতেছি। ভগবান্

রামকৃষ্ণ পূর্ব্ববর্ত্তী সর্ব্ব অবতারগণের অপেক্ষায় বরিষ্ঠ। এই বিশেষণের দ্বারা কি পূর্ব্ব অবতারগণের মহিমা খর্ব্ব করা হইয়াছে? আমাদের মনে হয়, না। এই অবতারে ভগবান্ রামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইলেন সমস্ত ঐশ্বর্য্য নিগূহিত করিয়া। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের উপাস্য ঈশ্বর দ্বিভুজ শ্রীকৃষ্ণ। সেখানেও কোন ঐশ্বর্য্য তাঁহার প্রেমঘন স্বরূপকে আচ্ছাদিত করে নাই। বস্তুতঃ ঐশ্বর্য্য ভগবৎস্বরূপকে প্রচ্ছাদিতই করে, অভিব্যক্ত করে না। ভগবানের পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিক বিভূতি ও বিশুদ্ধি রামকৃষ্ণাবতারে সুপ্রকটিত। সমস্ত শাস্ত্রের যথার্থতা তাঁহার লীলার মধ্যে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া প্রকটিত। ভগবৎপ্রাপ্তির উপায় এবং ফল যে অম্লান ও অম্লান সচ্চিদানন্দের পরিপূর্ণ প্রকাশ ও অধিগম তাহা সন্দেহাতীতরূপে সাংশয়িকের নিকটও প্রতিভাত হইয়াছিল। স্বামী বিবেকানন্দের সাংশয়িক আবর্ত্তনের নিরসন তাহার নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ। এই আধ্যাত্মিক নির্ম্মলতা প্রাকৃতজনের অধিগম্য নহে। তাহা না হইলেও শ্রীরামকৃষ্ণ অবতার ভগবতী-শক্তির ও বিশুদ্ধির পূর্ণ অভিব্যক্তি বিষয়ে তাহাদেরও সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। ভগবান্ রামকৃষ্ণ অতি পূত ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া উপনয়ন, দার-গ্রহণ প্রভৃতি ব্রাহ্মণোচিত সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। সমস্ত বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অতীত এই সন্ন্যাস আশ্রম। তিনি যখন দক্ষিণেশ্বরে সন্ন্যাসীর জীবন গ্রহণ করিয়াছিলেন সেই সময়ে উপস্থিত হইলেন তাঁহার নিকট তাঁহার ধর্ম্মপত্নী শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী। দর্শনমাত্রে তিনি বিমুগ্ধ হইলেন। বলিলেন, —"আমি যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছি তাহা গৃহস্থধর্ম্ম পালনের অনুপযুক্ত। তুমি যদি আদেশ কর বা অনুরোধ কর—আমাকে এই লোকোত্তর মার্গ পরিত্যাগ করিয়া গৃহীর জীবন গ্রহণ করিতে হইবে।" ইহা সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ। কিন্তু দেখা গেল সত্যই শ্রীশ্রীসারদা দেবী তাঁহার সহধর্ম্মিণী। তিনি তাঁহার সন্ন্যাস আশ্রমের সহায়িকাই হইলেন। প্রার্থনা করিলেন সমীপে অবস্থান মাত্র। ভগবান্ মহাদেব ও পার্ব্বতীর অবিচ্ছেদ্য দাম্পত্য সম্বন্ধের বিবরণ পুরাণাদিতে উপলব্ধ হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইহার স্বরূপ প্রাকৃত মনুষ্যের কল্পনাদ্বারা বিশুদ্ধভাবে প্রতিপাদিত হয় নাই। যাঁহারা জ্ঞানী, রাজহংসের ন্যায় যাঁহারা নীর ও ক্ষীর পৃথক করিয়া গ্রহণ করিতে পারেন, তাঁহারাই এই তত্ত্ব ও রহস্যের যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনলীলায় সন্ন্যাস ও গার্হস্থ্যাশ্রমের যে অচিন্তিতপূর্ব্ব সমন্বয় দেখা যায় তাহা উভয় আশ্রমকেই বরণীয় করিয়াছে। রামাবতারে ভগবতী সীতার বিরহদুঃখ এবং চৈতন্য অবতারে ভগবতী বিষ্ণুপ্রিয়ার অবজ্ঞাত ও ধিক্কৃত দাম্পত্যাধিকার পুনরায় স্বমহিমায় ও স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হইল শ্রীশ্রীসারদেশ্বরীর জীবনে। পূর্ব্ব লীলায় যে ন্যূনতা

ও অসমঞ্জসতা লোক-দৃষ্টিতে অপরিহরণীয় ছিল তাহা পূর্ণতা ও সামঞ্জস্য লাভ করিল শ্রীশ্রীসারদেশ্বরীর জীবন লীলায়। তাহার উপর পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবতারে পিতা, মাতা, ভ্রাতার অধিকার হয়তো সম্পূর্ণভাবে অব্যাহত ছিল না। ভগবান্ বুদ্ধ স্বীয় পুত্র ও ভ্রাতাকে সন্ন্যাস ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া তাহাদের কল্যাণমার্গ অবারিত করিয়াছিলেন। কিন্তু সন্ন্যাস ধর্ম্মের সহিত গার্হস্থ্যাশ্রমের বিরোধ ও ব্যবধান তাহার দ্বারা তীব্রভাবেই প্রকটিত হইল। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের লীলায় এই ব্যবধান ও বিরোধ বিদূরিত হইল। সন্ন্যাসী কিরূপে গৃহী হইতে পারে এবং গৃহী সন্ন্যাসী হইতে পারে তাহার পরিচয় আমরা হরপার্ব্বতীর বৃত্তান্তে পাইয়া থাকি। কিন্তু তাহার উজ্জ্বলতম, বিশুদ্ধতম, অনবদ্যতম, অম্লান ও অমলিন শত ভাস্করের তেজঃপুঞ্জপ্রভাস্বর প্রকটরূপে এই প্রথম ভারতবর্ষের ভূমিতে প্রকাশিত হইল। এই অভূতপূর্ব্ব ও অচিন্তিতপূর্ব্ব অধ্যাত্মবিভূতির অখণ্ড অভিব্যক্তি তাঁহার অবতারবরিষ্ঠত্বের অবিসংবাদিত প্রমাণ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি মহাপুরুষ-দিগের বাক্যের অনুধাবন করে অর্থ। ইহা যে সার্থক তাহা আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিলাম। ইহা কিন্তু তাহার একটি দিক্। অপর দিক্‌টির সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই একটি কথা বলিয়া বক্তব্যের উপসংহার করিতেছি। সাধুগণের পরিত্রাণ ও দুষ্কর্ম্ম-কারীদিগের বিনাশ, ধর্ম্ম সংস্থাপনের অঙ্গরূপে অপরিহরণীয়। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ অবতারে আমরা দেখি অন্যরূপ। দুষ্কর্ম্মকারী ও ধর্ম্মসংস্থাপনের বিরোধী যাঁহারা ছিলেন, তাঁহাদিগকে তিনি জয় করিলেন আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাবে। সাকার উপাসনার সমর্থক এই লোকোত্তর পুরুষপ্রবরের মিত্র ও ভক্ত হইলেন নিরাকার উপাসনার জয়গানকারী ব্রাহ্মগণ। স্বয়ং ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, যিনি বাগ্মিতার অপূর্ব্ব কৌশল ও শক্তির দ্বারা শিক্ষিত সম্প্রদায়কে সাকার উপাসনায় বিমুখ ও নিরাকার উপাসনায় উদ্যুক্ত ও অনুরক্ত করিয়াছিলেন, তিনি হইলেন তাঁহার পরম মিত্র, সুহৃদ্, ভক্ত ও প্রথম মাহাত্ম্য-প্রচারক। খৃষ্টভক্তগণ যাঁহারা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন তাঁহারাও আত্মসমর্পণ করিলেন। এই অবতারের বৈশিষ্ট্য বাহ্য ঐশ্বর্য্য প্রকটনে নহে, কিন্তু আধ্যাত্মিক শক্তির দুর্নিবার আত্ম-প্রকাশে। বিরোধিগণের চিত্ত তিনি জয় করিলেন। এই চিত্তজয়ের পুনঃপুনঃ অপূর্ব্ব সঙ্ঘটনের দ্বারা ভগবান্ রামকৃষ্ণ স্বীয় অবতারণার বৈশিষ্ট্য প্রদর্শিত করিলেন অতি প্রত্যক্ষ ও স্থূলভূমিতে। ঈদৃশ অবতার যে সর্ব্বাবতারবরিষ্ঠ তাহা লোকচক্ষুর অগোচর রহিল না।

ভগবান্ রামকৃষ্ণের প্রকটলীলার অবসানের পর তাঁহার আরব্ধকার্য্য পরিসমাপ্ত করিতে শ্রীশ্রীসারদেশ্বরীমাতার লীলায় অনুবৃত্তি চলিয়াছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ অবতারের পরিপূর্ণ উপলব্ধি সম্ভব হয় এই লীলার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গাঙ্গি-ভাবের অনুধ্যানে। শ্রবণ-মঙ্গল ও হৃৎকর্ণ-রসায়ন এই জীবনবৃত্ত আলোচনা করিয়া আমাদের ন্যায় সংসারাসক্তজীবও শ্রেয়োমার্গের সন্ধান লাভ করিবে। ঈদৃশ পুণ্যাবদানের আখ্যান ও ব্যাখ্যানের দ্বারা গ্রন্থরচয়িত্রী আমাদের সকলের নমস্যা ও পূজনীয়া হইলেন। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে প্রার্থনা এই সংসারত্যাগিনী সন্ন্যাসিনী ধৃতব্রতা গ্রন্থরচয়িত্রীকে এইরূপ প্রচেষ্টায় নিয়োজিত করিয়া যেন তিনি মানবগণের কল্যাণমার্গ উন্মুক্ত করেন। অনেক অফল কথা হয়ত বলিয়া ফেলিয়াছি, তাহাতে আমার অপরাধও বাড়িয়াছে। এই সমস্ত ত্রুটী বিচ্যুতি ও অপরাধের জন্য ভগবানের নিকট ক্ষমা ও পাঠকবৃন্দের উপেক্ষা প্রার্থনা করিতেছি।

শ্রীসাতকড়ি মুখোপাধ্যায়, এম.এ., পি-এইচ.ডি.,
প্রাক্তন আশুতোষ অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
এবং প্রাক্তন ডিরেক্টর, 'নব-নালন্দা', বিহার

শ্রীশ্রীসারদাদেবীস্তোত্রম্

প্রকৃতিং পরমামভয়াং বরদাং
নররূপধরাং জনতাপহরাম্।
শরণাগত-সেবকতোষকরীং
প্রণমামি পরাং জননীং জগতাম্॥

গুণহীনসুতানপরাধযুতান্
কৃপয়াঽদ্য সমুদ্ধর মোহগতান্।
তরণীং ভবসাগরপারকরীং
প্রণমামি পরাং জননীং জগতাম্॥

বিষয়ং কুসুমং পরিহৃত্য সদা
চরণাম্বুরুহামৃতশান্তিসুধাং
পিব ভৃঙ্গমনোভবরোগহরাং
প্রণমামি পরাং জননীং জগতাম্॥

রামকৃষ্ণগতপ্রাণাং তন্নামশ্রবণপ্রিয়াং,
তদ্ভাবরঞ্জিতাকারাং জগন্মাতৃস্বরূপিণীম্।
জানকী-রাধিকারূপধারিণীং সর্ব্বমঙ্গলাং
চিন্ময়ীং বরদাং নিত্যাং সারদাং মোক্ষদায়িনীম্॥

দেবীং প্রসন্নাং প্রণতার্ত্তিহন্ত্রীং
যোগীন্দ্রপূজ্যাং যুগধর্ম্মপাত্রীম্।
তাং সারদাং ভক্তিবিজ্ঞানদাত্রীং
দয়াস্বরূপাং প্রণমামি নিত্যম্॥

স্নেহেন বধ্নাসি মনোঽস্মদীয়ং
দোষানশেষান্ সগুণীকরোষি।
অহেতুনা নো দয়সে সদোষান্
স্বাঙ্কে গৃহীত্বা যদিদং বিচিত্রম্॥

প্রসীদ মাতর্বিনয়েন যাচে
নিত্যং ভব স্নেহবতী সুতেষু।
প্রেমৈকবিন্দুং চিরদগ্ধচিত্তে
বিষিঞ্চ চিত্তং কুরু নঃ সুশান্তম্॥

ইতি—শ্রীমদভেদানন্দস্বামিবিরচিতং শ্রীশ্রীসারদাদেবীস্তোত্রং সমাপ্তম্॥

জননী সারদেশ্বরী

ধ্যানময়ী রাত্রি ··· যেন তুষার-শিখরে সমাধি-মৌলীর আচ্ছন্ন ছায়া—নীচে শিবজটাহারা জাহ্নবী। নির্ম্মম বিরহের গৈরিক জ্যোৎস্নায় নিজেকে নিঃশেষে ধ'রে দিতে কূলে কূলে আকুল। তারি একটি শ্যামকান্ত উপকূল—যেখানে অনন্তের বিস্মিত স্তব্ধতা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক শ্বেত-শান্ত দেবলোক—মর্ত্তের অমৃতমন্থ দক্ষিণেশ্বর।

* * *

স্মৃতির শিহরনে দৃষ্টি যায় হারিয়ে ··· পথিক চেয়ে ত্মাখে সেই জ্যোৎস্না-মন্থর জাহ্নবীর কূলে এক ধ্যানসিক্ত দেবীমূর্ত্তি—যেন তুষার-তীর্থের প্রাণপ্রতিমা—যেন সাগরসঙ্গমা সরস্বতী—এমনি শতদলপর্ণা সে অঙ্গের লাবণি। শ্রীঅঙ্গের স্বপ্ন গুণ্ঠিত ক'রে স্রস্ত অঞ্চল কেঁপে কেঁপে উঠছে অশান্ত বাতাসে। আঁধার-নির্ঝর আকুল কেশ ক্ষণে ক্ষণে বিস্রস্ত চঞ্চলতায় ঢেকে ফেলছে চন্দ্রমুখের আধখানি, যেন সৃষ্টির সংঘাতে শান্তির নিথরতা। সীমন্তে সতীত্বের অরুণরাগ, করুণা-বিগলিত দুটি অচঞ্চল আঁখি দিগন্ত-বিলীন। বিশ্বের সমস্ত আকূতি সমস্ত মিনতি যেন তাঁর অন্তর মথিত ক'রে তুলেছেঃ "ঐ চাঁদের মাঝেও আছে কলঙ্ক, কিন্তু আমার মাঝে যেন সেটুকুও না থাকে, আমায় নিখাদ করো!" এই নীরব প্রার্থনার লীলায় চলে উপরের অনন্তের সঙ্গে মাটীর অনন্তের নিত্য মিলন।

কী আশ্চর্য, বিশ্বের যত শুভ্রতা যত পবিত্রতা খুঁজে ফেরে যাঁর চরণ-আশ্রয়, সেই বিশ্বজননী সারদেশ্বরীর অন্তরের এই প্রার্থনা—এ যেন আঁধার ধরণীর আঁধার কালিমা নিঃশেষে মুছে দিতে, কালো ছেলের মুখে আলোর হাসি ফুটিয়ে তুলতে জননীর গভীর ব্যাকুলতা ··· এ অমর্ত্ত স্মৃতির সাক্ষীই তো মায়ের ছেলে স্বামী যোগানন্দ।
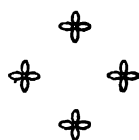
রৌদ্রনিষণ্ণ প্রান্তর—ধরণীর উধাও চোখে সেদিন কলবিঙ্কের তৃষ্ণা—কখন নেমে আসবে অলকানন্দা—মাটীর মর্ত্তে ফুটিয়ে তুলবে নন্দনের পারিজাত—ভরিয়ে তুলবে প্রাণের মরুকণ্টক স্বর্গের সুরভি-দাক্ষিণ্যে। ধরিত্রীর সে তৃষ্ণামথিত ক্রন্দন কেউ কি সেদিন শোনেনি কান পেতে! কিন্তু সত্যই সেদিন দেখা দিল যে নবীন আশার সম্ভাবনা আতপ-তপ্ত গগনে নবীন মেঘাগমের মতো—আর কেউ না রাখলেও, ভারত তার প্রাণের ইতিহাসের স্বর্ণপাতায় অঙ্কিত ক'রে রাখলো সে দিব্য অভ্যুদয় ···

বিল্ববৃক্ষমূলে দণ্ডায়মান পীড়িতা শ্যামাসুন্দরী—সারদা-জননী শ্যামাসুন্দরী। সহসা উন্মুখ নয়নে ফুটে ওঠে এক অভূতপূর্ব্ব দিব্যদর্শন—বিল্ববৃক্ষশাখায় দোলন-লীলায় মগ্ন ছোট্ট একটি কোমলা বালিকা, যেন শ্যাম বৃন্তে শুভ্রশুচি একটি যুঁইকলি—যেন মেঘের লতায় দোল-খাওয়া একটি বৃষ্টি-বকুল—মাটীর খেলায় ঝ'রে পড়তে আকুল আবেগে কাঁপছে থরথর ক'রে,—সহসা বিহ্বলা শ্যামাসুন্দরীর সমস্ত চেতনাকে আনন্দের দাক্ষিণ্যে উছল ক'রে ঝাঁপিয়ে পড়লো সেই মলয়ানিল-নন্দিত ফুলতনু, মাটীর মায়ের বুকে—চকিতে জাগলো যেন নন্দনের মহোৎসব। তারপর একটি অসহ আনন্দের মুহূর্ত্তে আলোর মৃণাল দুটি শুভ্র বাহু জড়িয়ে ধরলো শ্যামাসুন্দরীর কণ্ঠ; শ্রবণমূলকে পুলকমুখর ক'রে জাগলো অকাল ফাগুনের গুঞ্জন, "আমি তোমার ঘরেই এলুম, মা" ··· সেই দিব্যস্পর্শের আনন্দ-আবেশে আচ্ছন্ন হয়ে উঠল মা'র সারা দেহমন ··· মনে হ'ল, কী যেন তাঁর অঙ্গে প্রবেশ ক'রলো, সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হয়ে গেল সমস্ত চেতনা—লুটিয়ে পড়লেন শ্যামাসুন্দরী ফলভারনত ব্রততীর মতো।

স্মৃতির তীর্থে আবার ভেসে ওঠে আর একটি দিব্যদর্শন—সেদিনও

ছিল মুক্ত-আলোয়-কাঁপা ক্লান্ত শ্বেতকপোতের মতো চৈত্রের দ্বিপ্রহর, আর দহন-অবসন্ন ধরণীর শুষ্ক হৃদয়ে ঝরা পাতার রিক্তমর্মর। ঠিক এমনি একটি বেদনবিধুর লগ্নে, অভাবে পরিপূর্ণ পর্ণকুটীরে ক্লান্ত অবসন্ন শ্রীরামচন্দ্র—সারদা-জনক শ্রীরামচন্দ্র শায়িত। ধীরে ধীরে গভীর চিন্তায় শ্রান্ত নয়নে ঘনিয়ে আসে এক দিব্য নিদ্রা, স্নেহময়ী জননীর মতো। ধীরে, আরো ধীরে—অভাবের জগৎ যায় মুছে। স্বপ্নের দুয়ার খুলে দেখা দেয় এক অ-স্বপ্নের জগৎ। রামচন্দ্র দেখেন, হেমমন্থন-কান্তি একটি দিব্য কুমারী বালিকা মৃণাল-বন্ধনে বেঁধেছে তাঁর কণ্ঠদেশ। রূপে তার জ্যোৎস্নার সাগর যেন ঘুমিয়ে আছে, অঙ্গের রত্নাভরণে জড়িয়ে আছে বিশ্বের লক্ষ মণিময় লগ্ন। শ্রীরামচন্দ্রের মনে জাগে অপার বিস্ময়; ব'লে ওঠেন—"কে মা তুমি?" উত্তর আসে বীণা-জাগা কণ্ঠে—"এই তোমার কাছেই এলুম ···"। পুলকের তীর্থ হয়ে ওঠে তনুমন। ঘুম যায় ভেঙে, স্বপ্নের দুয়ার হয় রুদ্ধ। অভিভূত রামচন্দ্র ভাবেন—তবে কি কমলার কমল-চরণ প'ড়লো দরিদ্রের পর্ণকুটীরে?

সারদা-জনক শ্রীরামচন্দ্র, সারদা-জননী শ্যামাসুন্দরী—ভক্তি-নিষ্ঠায়, ক্ষমা-সরলতায়, পরোপকারিতায়, উদারতায় আদর্শ দেবদম্পতি। জননী সারদার শ্রীমুখেরই কথা—"আমার বাবা পরম ভক্ত ছিলেন, পরোপকারী; বাবা বড় রামভক্ত ছিলেন, নৈষ্ঠিক। মা'র কত দয়া ছিল, লোকদের কত খাওয়াতেন, কত সরল!"
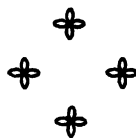
আমোদর নদীর কূল ঘেঁষে জেগে উঠেছে যে ছায়া-নিবিড় গ্রামখানি, বাঁকুড়ার দক্ষিণ-পূর্ব্বে, সেই পল্লীলক্ষ্মীর আবাহন-গেহ জয়রামবাটীর, এঁরা আদিম অধিবাসী; বিষ্ণুপুরের রাজবংশের

দলিলে আছে তার বহু প্রমাণ। দুর্ভিক্ষের ছিন্নমস্তা কতবার দেখা দিয়েছে এই বাঁকুড়ার গ্রামে গ্রামে—বিধ্বস্ত হয়ে গেছে, উজাড় হয়ে গেছে গ্রামের পর গ্রাম, কিন্তু জয়রামবাটীর বক্ষে যেন তার চির-পরাজয়। তার মাঠে ছিল সবুজের আবেগ। দীঘিতে ছিল শ্রাবণের ভাষা, বনে বনে ছিল ফাল্গুনের পূর্ব্বরাগ, মাটীতে ছিল মমতার পেলবতা, আকাশের নীলে ছিল একটি সন্নত শান্তি। এক কথায় গ্রামখানি ছিল ষড়্ঋতুর বিশ্রামভূমি। তাই কৃষকের মুখে ছিল হাসি, সুগঠিত দেহে ছিল অক্লান্ত কর্ম্মপ্রেরণা। এমনকি বৈশাখের নিষ্ঠুরতায় যখন দিকে দিকে দেখা দিত জলাভাব, জয়রামবাটীর ক্ষুদ্র আমোদরের নীল অঞ্জলিখানি ভ'রে তখনও টলমল ক'রতো স্বচ্ছ গভীর বারিরাশি—পিপাসার পানপাত্র হাতে কেউ যেতনা ফিরে তার শ্যামল তীর হতে। কল্পনায় ভেসে ওঠে বাংলার পুরাতন পল্লীচিত্র, যান্ত্রিক সভ্যতার রুক্ষতা যেখানে মানবহৃদয়কে পাষাণ ক'রে তুলতে পারে নাই, বিজ্ঞানের বৈদ্যুতিক আলো যেখানে মাটীর প্রদীপকে দেয় নাই ম্লান ক'রে, নির্ম্মল আকাশে যেখানে জ'মে ওঠে নাই বাষ্পমলিন ধূমরাশি—সেই শান্তমধুর কুহু-ডাকা পল্লীভূমি। ছিল অভাব, ছিল দুঃখ-বেদনা, তবু ছিল শান্তি—সুনিবিড় শান্তি। ছিল মাধুর্য্য আর সরলতায় পরিপূর্ণ দরদী হৃদয়। তাই দেখি দরিদ্র রামচন্দ্রের পর্ণকুটীর সে যেন অন্নপূর্ণার অন্নভাণ্ডার —নিত্য অতিথিনারায়ণ, দরিদ্রনারায়ণের সেবা-উপচারে পরিপূর্ণ। হৃদয়ের প্রসার যেখানে আকাশের মতো উজ্জ্বল, উদার—অভাবের অন্ধকার সেখানে ঘনিয়ে থাকলেও, সে হৃদয় ছড়িয়ে দেবেই কল্যাণ-আনন্দের আলো। সেই তার স্বধর্ম্ম। তাই শ্রীরামচন্দ্রের সংসার-যাত্রায় সচ্ছলতার অভাব থাকলেও, সেই উদার-হৃদয় দেবমানব ছিলেন সকলের মাননীয়, সকলের পূজনীয়, চিরপ্রণম্য। এমনি হিমালয়ের মতো উদার বক্ষ ছাড়া হিমগিরি-দুহিতা কেমন ক'রে আসবেন নেমে? আর সরলা কোমলা অথচ দৃঢ়চিত্তসম্পন্না শ্যামাসুন্দরী গৃহলক্ষ্মীর মতোই সুনিপুণ হাতে অভাবের সংসারে

ফুটিয়ে তুলেছেন লক্ষ্মীশ্রী, বিদুরের ক্ষুদকুঁড়ায় রন্ধন করেছেন দেবভোগ্য পরমান্ন, ধুলার বুকে এঁকেছেন লক্ষ্মীর আলপনা। যে-কেউ এসেছে তাঁর ধুলার মন্দিরে, সেই পেয়েছে তাঁর যত্ন, তাঁর প্রীতিপূর্ণ অন্তরের স্পর্শ। তাইতো তাঁর বুকে এসেছিলেন অলকার একমুঠো যুঁই—নন্দনের আনন্দ-নির্ঝর।

মাত্র কয়েক বিঘা লাখেরাজ জমি, যাজনকর্ম্ম আর তূলার ক্ষেত—এই তো ছিল সম্বল। স্বল্পে সন্তুষ্ট শ্রীরামচন্দ্র ফেরেন ঘরে ঘরে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণের কাজ নিয়ে, আর তূলার ক্ষেত থেকে তূলা সংগ্রহ ক'রে পৈতা কাটেন শ্যামাসুন্দরী নিজে—আর তা হতেই নির্ব্বাহ হয় অন্নপূর্ণার সংসার—শান্তির সংসার।
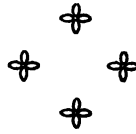
ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা। অন্ধ সংস্কারের নৈরাশ্যে ভেঙে-পড়া বাংলা। লক্ষ মতবাদের অস্থায়ী প্রতীতির মধ্যে সে তখন খুঁজছে জীবনের স্বাদ। তার বুদ্ধিবাদে, তার চিন্তায়, তার প্রতিটি পদক্ষেপে গভীর অবিশ্বাসের অবসাদ। সম্মুখে পথ আছে, অথচ সে পথ যেন মেঘ-বিলুপ্তির অন্ধকারে। চলার আশা আছে—শুধু হারিয়ে গেছে এগিয়ে চলার মন্ত্র। অগণিত মানুষের মিছিলে শুধু অসংযত কোলাহল, তবু ব'লবো এই বাংলা আমার সোনার বাংলা। সমগ্র বিশ্বের মধ্যমণি যেন এই ভারতভূমি, আর তার কন্যাতুল্য এই বাংলাদেশ। তাই যেখানে উঠেছে যত ঢেউ, সে ঢেউ এসে আঘাত করেছে ভারত তথা বাংলার প্রাণতটে। সে ঢেউ কখনও এনে দিয়েছে সম্পদ, কখনও ভেঙে দিয়েছে তার কূল, জর্জ্জরিত করেছে তার সমগ্র সত্তাকে। দিয়েছে অল্পই, নিয়ে গেছে বেশী। কিন্তু এই আঘাতের পরিবর্ত্তে দেবভূমি ভারত যে অমূল্য রত্ন লাভ করেছে

যুগে যুগে, বার বার, তার কি তুলনা আছে? সেই লাভই তার আঘাতের চরম মূল্যস্বরূপ হয়ে রয়েছে, সেই পরম ধনে ধনী হয়ে সে হয়েছে বিশ্বের বরণীয়। তাই ভারত, সোনার ভারত। এক-একটি অমূল্য রত্নে সে সমগ্র বিশ্বকে করেছে উজ্জ্বল, অন্তরের অমৃতধারায় করেছে অমৃতায়িত ; অবতার তো অন্ধকারেরই দান!

আবার এল অন্ধকার—যে আঁধার আকুল আহ্বান জানালো আলোর দিশারীকে। কিন্তু এবার শুধু বাংলা, শুধু ভারত নয়, সমগ্র বিশ্ব জুড়ে ঘটলো এক অভাবনীয় প্রচণ্ড সংঘর্ষের অভ্যুত্থান। সমগ্র সৃষ্টির চেতনা যেন আছড়ে পড়ে বেধসের চরণপ্রান্তে। দিকে দিকে ঘনিয়ে ওঠে অদিশ অন্ধকার, আর সেই আঁধারের অতিভী-ই হ'ল মহান অভ্যুদয়ের পরম মুহূর্ত্ত।

নেমে এলেন নারায়ণ, আবির্ভূতা হলেন নারায়ণী। যুগে যুগে যেমন এসেছেন, ঠিক তেমনি ক'রেই এলেন সৃষ্টির আদিশক্তি—পুরুষোত্তমের লীলাসঙ্গিনী। কিন্তু এবার যেন বিশ্বের কল্যাণে কল্যাণময়ী ধরলেন একটি স্বতন্ত্র রূপ, বিশ্বের মাঝে ক'রে নিলেন স্বতন্ত্র আসন—যা চিরমহীয়ান, চিরগরীয়ান। যেন মাটীর বুকে পড়লো আলপনার শতদল, যা ধরার ধুলায় থেকেও চির-অধরা!

এবার যেন বিশ্বজননীর শুভ আগমন—পদদলিতা, লাঞ্ছিতা মাতৃজাতিকে তুলে ধরতে, তাকে মাতৃত্বের গৌরব-আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে, তার চোখের জল মুছিয়ে দিতে, পথহারা সন্তানকে ফিরিয়ে আনতে আপন ঘরে, আর জগতের বুকে মাতৃশক্তির প্রতিষ্ঠা করতে—যার অস্ফুট কলধ্বনি এই নারী-জাগরণের যুগ, আর যার চাক্ষুষ প্রমাণ ভোগক্ষেত্র বিলাসভূমি কলকাতার বুকে জগজ্জননীর নামাঙ্কিত মাতৃমন্দির—শ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম—প্রতিষ্ঠাত্রী শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদারই মানসকন্যা শিখাময়ী গৌরীমা।
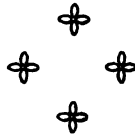
মরুতৃষ্ণা প্লাবিত ক'রে যদি সহসা নেমে আসে শিবস্নিগ্ধ তুষাবছন্দা অলকানন্দা, অমা-স্পন্দিত বুকে যদি সহসা জেগে ওঠে হৈমন্তী পূর্ণিমার উচ্ছ্বাস, আব অনেকদিনের মা-হারা শিশুর ঘুমন্ত আঁখি যদি গভীর রাতে ফিরে পায় মায়ের চুম্বন, তখন জেগে ওঠে যে বিস্ময় যে পুলকের অদিশ উচ্ছলতা তার অনুভূতির রূপ ভাষাহীন।

ঠিক সেই বিস্ময়, সেই শিহরিত পুলক জেগে উঠেছিল পৌষের এক কুহেলীক্লান্ত সন্ধ্যায়। সেদিন ছিল বারোশো ষাট সালের সৌর পৌষের অষ্টম দিবস—বৃহস্পতিবার, অগ্রহায়ণের কৃষ্ণা সপ্তমীর সন্ধ্যা। সেদিন ছিলনা বসন্তপবনে জেগে-ওঠা মুখরিত কুহুর দল, সেদিন জাগেনি চামেলী-পাগল চাঁদ, চৈত্রের মৈত্রীতে আকুল হয়নি হাস্নুহেনার মন। সেদিন শুধু জেগে ছিল এক বিরাট মৌনতা, বিরাট স্তব্ধতা—যা ধরাব বেদনা আর অধরার শান্তির সুস্পষ্ট আভাষে ভরা। আর ছিল দিকৃচক্রের পিঙ্গল পথরেখায় জ'মে-ওঠা কুহেলীর শিশিরসিক্ত অন্ধকার—যেন ধরণীর অশ্রুনদী দেখছে সাগর-সঙ্গমের স্বপ্ন। আর আকাশের বুকে ক'টি সন্ধ্যাতারা মহাকালের মন্দিরে সিদ্ধ বধূর কম্পিত করে জ্বালা মাঙ্গলিক দীপশিখার মতোই উজ্জ্বল। সহসা ঘরে ঘরে বেজে ওঠে পৌষলক্ষ্মীর আবাহন-শঙ্খ—অন্নহীন সম্বলহীন ভারতবাসীর প্রাণের গভীর আকূতির প্রতিধ্বনি। ঠিক এমনি সময়ে ঘন তমসার সেই কুহেলীর জাল দু'হাতে অপসারিত ক'রে আবির্ভূতা হলেন যুগের কল্যাণময়ী শক্তি ··· বিশ্বের আদিভূতা সনাতনী ···। আর পল্লীবাসী আকুল শ্রবণে শুনলো শ্যামাসুন্দরীর স্নেহনীড় থেকে ভেসে-আসা সদ্যোজাত শিশুর অস্ফুট কলকাকলি। সেদিন কেউ কি জানতো যে, সে ক্রন্দন বিশ্বের যত মলিনতা যত আবিলতা ধুইয়ে দেবার অশ্রুর ভাগীরথী।

সেই মৌন সন্ধ্যার দীপশিখা-কম্পিত আলো-ছায়ার লীলাভূমি শ্যামা-গেহ মুখর ক'রে বেজে উঠলো যে মঙ্গলশঙ্খ—সে শঙ্খ শুনেছিল শুধু গ্রামবাসী। কিন্তু ধরিত্রী আজ তারি প্রতীক্ষায় চেয়ে আছে, ঘরে ঘরে কবে মুখরিত হয়ে উঠবে সেই মাঙ্গলিক ধ্বনি। সেদিন গগন-দেউলে আর জননীর মাটীর দেউলে জ্বলেছিল যে মঙ্গল-দীপ, বাংলার মেয়ের চোখে কবে জ্বলে উঠবে তারি কল্যাণময়ী শিখা!
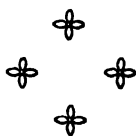
ভাঙা ঘরে চাঁদের আলোর মতো একটুকরো মেয়ে সারদা—জনক-জননীর বড় আদরের নাম। রূপের সঙ্গে নামের হয় অপূর্ব্ব মিলন। কোষ্ঠীর বিচারে রাশ্যাশ্রিত নাম দেখা যায় 'ঠাকুরমণি'। এখানেও নামরূপের অপূর্ব্ব সম্মিলন। বৈষ্ণবশাস্ত্রের মতে ভক্তের জপমালায় যে নাম থাকবে গাঁথা, সে নাম হওয়া চাই অপ্রাকৃত, সে নাম চির-চিরন্তন। জননীর দুটি নামই দেখি সেই অপ্রাকৃত নাম। একদিকে তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞান-দায়িনী জননী সারদা মূর্ত্তিমতী সরস্বতী। আর একদিকে মা আমার হরিবক্ষ-বিলাসিনী কমলা। তাই গুপ্ত-নাম ঠাকুরমণি।

সেই বৈকুণ্ঠবাসিনী আজ নেমে এলেন এই মাটীর মর্ত্তে। ধরার ধুলায় তাই জেগে উঠলো পারিজাতের আনন্দ। অখ্যাতনামা জয়রামবাটী হ'ল মুক্তির স্বর্ণকাশী—জননীর জন্মভূমি, যা স্বর্গের চেয়েও গরীয়সী, স্বর্গের চেয়েও মহীয়সী। যা ছিল ধুলা, তাই হয়ে গেল সোনা। অমর্ত্ত যেন চুম্বন ক'রলো মর্ত্তের তীর্থরেণু। সুরু হ'ল আনন্দলীলা। মানুষের ঘরে দেবতার ঠাকুরালী। স্নেহ-ভক্তি-শ্রদ্ধায় শ্যামাসুন্দরী আর শ্রীরামচন্দ্র গ'ড়ে তোলেন তাঁদের আদরের দুলালীর শৈশব-জীবন। মন্দাকিনীর ঢেউ-লাগা পদ্মমেঘের

মুখখানি, আর নীল আকাশের মতো দুটি চোখ—তাতে টলটল করছে মাতৃশ্রী। এ যেন হিমগিরির স্নেহের স্বপ্ন। মেয়ের মুখের পানে নয়ন রেখেও দেখার আশা যেন মেটেনা। সারা হৃদয়ের আনন্দবন্যা দু'ফোঁটা চোখের জলে মুক্তা হয়ে যায়। দু'দণ্ড আঁখির আড়ালের অবকাশও যেন সয়না। কখনও শ্যামা ছুটে যান প্রতিবেশীদের ঘরে ঘরে,—"হ্যাঁ গা, আমার সারু আছে?"

"হ্যাঁ গো, এই এখুনি ছিল, এইমাত্র তাকে নিয়ে গেল ঐ বাড়ির মেয়েরা।" আবার ছুটে যান জননী। হয়তো দেখেন কোন বাড়ির আঙিনায় আদুল তনু ধুলায় ধূসর ক'রে আনমনে খেলছে তাঁর সোনার দুলালী—যেন ধুলায় ঝরা বনজ্যোৎস্না। অতৃপ্তির তৃষ্ণায় ব্যাকুল দুটি হাত বাড়িয়ে ডাকতেই, মুগ্ধ মরাল-শিশুর টলমল পায়ে ছুটে আসে শ্যামার ঝিয়ারী, রিন্‌ঝিন্‌ ক'রে ওঠে বাঁকমল, রসনার ঘন্টি, আর চন্দ্রললাটে ভীরু জ্যোৎস্নার মতো দুলে ওঠে মায়ের দেওয়া মাণিক-নোটন। স্নেহচুম্বনে কচিমুখ ভরিয়ে তুলে বলেন জননী—"কোথায় ছিলি, মা?" একরাশ ফুল-ঝরানো হাসি হেসে, মেয়ে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে আচলে মুখ লুকিয়ে। এমনি কত দিন! এমনি ক'রেই বুঝি হারিয়ে যায় স্বর্গ আর মাটীর অবকাশ।

ধীরে ধীরে পাড়া-প্রতিবেশীর চিত্তও বুঝি অজ্ঞাতসারে জয় করে এই দিব্য বালিকা। সকলে যেন লক্ষ্য করে বিস্মিত-চোখে তার দিব্য জীবনের গতিভঙ্গী, আচার-ব্যবহার। জনক-জননী ছাড়া বালিকা সারদার আর একটি হৃদয়ে স্নেহের দাবি ছিল বেশী। তিনি ছিলেন সারদার খুল্লতাত—নাম নীলমাধব। সংসারের লোহার শিকল তাঁকে বাঁধতে পারে নাই, চিরকুমার নীলমাধব প'রেছিলেন সোনার শিকলের বন্ধন, বালিকা সারদার স্নেহের বন্ধন। কোলে-পিঠে ক'রে মানুষ করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাসঙ্গিনীকে। কোন আনন্দই তাঁর ছিল না, আনন্দপ্রতিমা সারদা ছাড়া। তাঁর জীবনের শেষদিনে তাই দেখি জননীর স্নেহ দিয়ে তাঁকে পরিপূর্ণ ক'রে রেখেছেন জগজ্জননী।

ইন্দ্রধনুর হাসি হেসে দিন যায় কেটে। সারদার পর আরও ছয়টি পুত্রকন্যার জননী হন শ্যামাসুন্দরী। কন্যা কাদম্বিনী আর পাঁচটি পুত্র—প্রসন্ন, উমেশ, কালী, বরদা ও অভয়। কিন্তু সকলের মাঝে সারদাই যেন সবার আনন্দের ধন, জীবনের জীবন, সে যেন সন্ধ্যাকাশের অম্লান তারা, আঁধার ঘরে আনন্দের মণি-দীপ। গৃহের প্রতিটি কাজই পায় তার শিশুহাতের মধুর স্পর্শ, সমাধা হয় সুচারু-সুন্দর-রূপে। জননী শ্যামার স্বল্পসচ্ছল সংসারের কর্ম্ম-ব্যস্ততাটুকু কন্যার সাহচর্য্যে মনে হয় যেন মধুর হতে মধুর। কোন গ্লানি, কোন দুঃখ যেন আর সেথায় ঠাঁই পায় না। শূন্য-হৃদয়ের তৃষিত পাত্র আনন্দের রসে টলটল ক'রে ওঠে।

স্মৃতির মুকুরে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে সুদূর অতীতের বুক-আলো-করা আর একটি দিব্য সংসারের লীলাচিত্র। শ্রীরামপ্রসাদের সংসার। একদিন যে সংসারের ভাঙা বেড়ার ধারে লীলাচঞ্চলা ক্ষণিকের জন্য এঁকে দিয়েছিলেন তাঁর দুটি কমল-চরণ-চিহ্ন, সেই একক্ষণের পিতৃ-সম্বোধনের কথা, সেই কন্যারূপে লীলার কথা জগৎ শুনলো শুধু সাধক-কবির অমর গানের ভাষায়। এবার পেল তার চাক্ষুষ প্রমাণ। সেই লীলার নিত্য মূর্ত্ত পুনরভিনয়ে আবার দেখলো—সেই উমা-মহেশ্বরী শ্রীরামচন্দ্র-তনয়া-রূপে মাটীর ঘরে জ্বালছেন সন্ধ্যাপ্রদীপ, ছুটে যাচ্ছেন জননী শ্যামার রন্ধন-কার্য্যের সাহায্য করতে, কচি দুটি হাতে যতটুকু কুলায় তাই করছেন দু'হাত ভ'রে। ছোট্ট ছোট্ট ভাইবোনদের নিয়ে আমোদরের বুকে যাচ্ছেন গঙ্গাস্নান করতে—যে গঙ্গাপ্রীতি ছিল তাঁর চিরদিনের 'বাই' বিশেষ।

কোন কোন দিন দেখা যায় চৈত্য-তরুর মূলে জপনিষণ্ণ পার্ব্বতীর মতো বসেছেন শ্রীরামদুহিতা বিল্ববৃক্ষতলে শিবসুন্দরের আরাধনায়। কুমারী গৌরীর সে ধ্যানমগ্ন মুখের পানে চেয়ে যেন থমকে দাঁড়ায় কুসুমবিরাগী ব্রতচারী চৈতালী। বৃন্তচ্যুত দুটি বিল্বপত্র অর্চ্চনা ক'রে যায় দুটি অলক্তক-রঞ্জিত চরণ।

✤
✤ ✤
✤
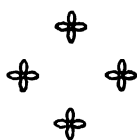
আলোছায়ার মন্দিরা বাজিয়ে মহাকাল চলেন বর্ষ-চংক্রমণে। এদিকে দেখতে দেখতে শিশিরচুম্বনে ফুটে-ওঠা কুসুমের মতো, আর পরিবর্দ্ধমান চন্দ্রকলার মতো পূর্ণরূপিণী জননী চতুর্থ বর্ষ পার হয়ে দাঁড়ান রূপ-পঞ্চমে। শুক্লা পঞ্চমীর চাঁদ যেন পার হয়ে এল চতুর্থীর সন্ধ্যা। সেদিনের বাংলা, যেদিন ঘরে ঘরে ছিল গৌরীদানের প্রথা, পাঁচ থেকে আট বৎসরের মধ্যে বাংলার মেয়ে পেতো জননীর স্নেহ-অঞ্চলের ছায়া। তারপরই তাকে ছু'দিনের স্নেহনীড় ছেড়ে চলে যেতে হ'ত অপর একটি গৃহের গৃহলক্ষ্মী হয়ে। তবু তাদের চোখে জ্বলতো যে সতীত্বের অমিত-তেজ, তবু তারা রেখে গেছে যে ত্যাগ, সংযম, পবিত্রতার দীপ্তিপূর্ণ আদর্শ, বর্ত্তমান সভ্যতার যুগে সে যেন সোনার বাংলার ভুলে-যাওয়া সোনার স্বপ্ন।

নবযুগের হৈমবতী শ্রীরামচন্দ্র-দুহিতা সারদাগৌরীর এল সেই গৌরীদানের শুভলগ্ন। তাই ডাক পড়লো গৌরীনাথের।

কল্পনার রঙীন পাতায় জেগে ওঠে স্বপ্নের-তূলি-দিয়ে আঁকা আর-একটি সোনার ছবি। জানিনা সেদিন ছিল কোন্ তিথি— পূর্ব্বরাগের কোন্ মিলন-মাঙ্গলিকে বাঁধা ছিল সেদিন গগন-ভুবন। শিহড় গ্রামের একটি গানের আসর, আসরে সমাসীন চন্দ্রাদুলাল শ্রীগদাধরসুন্দর, আমাদের মাণিকবনের সোনার কিশোর। রূপে অরূপ, তবু তো গোপন। কিন্তু রূপময়ী ধরিত্রীর সৌন্দর্য্য যে রূপসিন্ধুর একটি বিন্দু, যার একটি হিল্লোলে আঁধার আকাশের বুকে জেগে ওঠে অনন্ত আলোর বিলাস, সেই রূপ যখন পুঞ্জীভূত হয়ে ধরা দেয় ধুলার মেলায়—তখন তাকে যত আবরণেই ঢাকা যাক-না কেন, সে যেন হয়ে ওঠে আরও অপরূপ। সেই কাঞ্চননিন্দিত বরতনু মনে হয় যেন ধুলায়-ঢাকা অম্লান তারা। আসর বসেছে

ভাগিনেয় হৃদয়ের ঘরে। শ্যামাসুন্দরীর পিতৃগৃহ শিহড়ে। তাই তিনিও উপস্থিত হয়েছেন তাঁর আদরের ছুলালী আনন্দনন্দিনীটিকে নিয়ে। সঙ্গীত-মুখরিত হয়ে উঠলো আসর। ভাবসিন্ধু-উথলিত অরুণায়িত ছুটি আঁখি মেলে আবিষ্ট হয়ে বসে আছেন শ্যামগদাধর। স্বেদপুলক-কম্পিত অঙ্গ, মাঝে মাঝে ছু'-একটি আখর দিয়ে রসমেছুর ক'রে তুলছেন সঙ্গীতময় প্রহর। সে রূপের তুলনা দিতে মনে পড়ে বৈষ্ণবপদকর্ত্তার একটি গোরারূপ-কীর্ত্তনের পদ—

"নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে
পুলক মুকুল অবলম্ব
স্বেদ মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত
বিকশিত ভাবকদম্ব।"

সেই নয়ন-মেঘের সিঞ্চনে সেদিন কি জেগে উঠেছিল সমবেতদের অন্তর-কিশলয় ? কিন্তু সেই প্রেম-সিঞ্চনে একটি হৃদয়ের করুণকান্ত কিশলয় যে আখি মেলেছিল, চিনে নিয়েছিল অন্তরের অন্তরতমকে, একটু পরেই তা ধরা পড়লো। আলোর একটি গানেই তো ভাঙে ফুলের লজ্জা।

সঙ্গীত-সমাপনান্তে শ্যামার কোল-জুড়ানো ছোট্ট শিশুকন্যাকে নিয়ে সকলে সুরু ক'রলো আনন্দ-গুঞ্জন—"এইতো এত লোক রয়েছে, বল্ তো মা, এর মধ্যে তুই কাকে বিয়ে করবি ?" চিন্তার কোন প্রয়োজন হয় না। যুগে-যুগের চিরচেনা সে তো সম্মুখেই! নিথর হয়ে ওঠে ছুটি আঁখি। বালা-পরা ছুটি কচি রাঙা হাত তুলে সাগ্রহে শ্যামার ঝিয়ারী দেখায় শ্রীচন্দ্রানন্দনের দিকে। কোথা হতে যেন ভেসে আসে মঙ্গলশঙ্খ। মন বলে, অন্তহীন হোক এই মিলন-গোধূলি। শুধু একটি অঙ্গুলির সঙ্কেতে যে কী গভীর ইঙ্গিত লুকানো ছিল, কেউ তখন বোঝেনি তার প্রকৃত রহস্য। শিশুর খেয়াল-খেলার মতোই হাসির হিল্লোলে ডুবে যায় সেই অপূর্ব্ব চিত্রখানি। তখনকার মতো সে-কথা মুছে যায় সকলের মন থেকে। কিন্তু এর কয়েক বৎসর পরে যখন পঞ্চমবর্ষীয়া বালিকা সারদার

গৌরীদানের শুভ কামনায় শ্রীরামচন্দ্র হয়ে পড়লেন বিশেষ চেষ্টিত—তখনই মিললো এর দিশা।
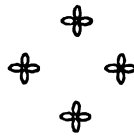
দক্ষিণেশ্বর ··· বাংলার কাশী কাঞ্চী ··· সর্ব্বতীর্থের সমন্বয়-ভূমি। ধুলার বৈকুণ্ঠ সেই দক্ষিণেশ্বর। কলকল্লোলিনী জাহ্নবীর উপকূলে সে যেন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক, ধ্রুবতারকা, পথহারা অনুসন্ধিৎসু পথিকের পথের আলো। তখন সেখানে স্মুরু হয়েছে এক বিরাট তপস্যার লীলা—জ্বলে উঠেছে নিজের-জীবন-আহুতি-দেওয়া সমন্বয়ের হোমশিখা। যে শিখা প্রজ্বলিত করেছেন বিশ্বের প্রাণপুরুষ, যার হোতা যুগদেবতা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং। যে শিখা আজ সব মতের সব পথের বুকে জ্বেলে দিয়েছে আলোক-বর্ত্তিকা। সেই গগনচুম্বী দেবায়তনের দিকে পিপাসিত বিস্মিত দৃষ্টি মেলে চেয়ে আছে সারা বিশ্বের মানব, বিশ্বের উর্দ্ধলোকের তৃষিত আত্মা, দেবলোকের দেববৃন্দ—জগতের ইতিহাসে এক বিরাট মহান্ কল্যাণময় পরিবর্ত্তনের আশায়।

তার সূচনার হয়েছে স্মুরু। সেদিন যুগ-প্রয়োজনে ধর্ম্মরাজ্য-প্রতিষ্ঠার মহাভারত লেখা হয়েছিল অসির মুখে রক্তলেখায়। আর আজ যুগের নবপরিস্থিতিতে রচিত হ'ল শান্তির মহাভারতী—যুগ-সারথির জীবনবেদ। এ যুগের পুরুষোত্তম নর্ম্মলীলায় যে তপস্যা, যে সাধনা করলেন চোখের জলে আর ব্যাকুলতায়, সে তপস্যা-প্রসূত ফল জগৎ বুঝছে—দিনে দিনে আরো বুঝবে।

সন্ধ্যার ঘন আঁধার যখন নেমে আসে ধরণীর বুকে, পাগলের মতো ঠাকুর ওঠেন কেঁদে—"মা, ··· মা ··· মা ··· মা গো, একটা দিন যে চলে গেল, মা, এখনও দেখা দিলিনি!" নিথর নিবিড় রাত্রে

একাকী বসে থাকেন ঝোপের মধ্যে গভীর সমাধিমগ্ন। পঞ্চবটীর ধুলায় বরতনু লুটিয়ে দিয়ে কখন কাঁদেন, মাথা খুঁড়ে ডাকেন জগজ্জননীকে, "মা গো—দেখা দে, মা—দেখা দে ···"। মন্দিরে পূজা করতে করতে ব্যাকুলতা হয় যেন আরও গভীর। চোখের জলে পূজার আয়োজন কোথায় যায় ভেসে। কাঁদতে কাঁদতে নিথর নিস্পন্দ হয়ে যায় সমস্ত দেহ। কখনও আরতি-প্রদীপ হাতে মন্দির আলোকিত ক'রে করছেন মা'র আরতি, অন্য হাতে গুরুভার ঘণ্টা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা যায় কেটে, তবু শেষ হয়না সেই অনন্তের আরতি-লীলা। সম্বিৎ যায় হারিয়ে, আর সেই রক্তিম ঘর্ম্মাক্ত ভাব-তনু হৃদয়ে ধারণ ক'রে বাইরে নিয়ে আসে ভাগিনেয় হৃদয়। লোকে বলে, ছোটঠাকুর হয়েছে পাগল, তা না হলে, মাটির মূর্ত্তিকে কেউ জাগতে বলে!

ওদিকে গদাধরচন্দ্র বিনা আঁধার হয়ে থাকে কামারপুকুর, আঁধার হয়ে থাকে মাণিকরাজার বন—গদাধরের লীলা-নিকেতন। সখা-জন পথ চেয়ে থাকে, পথ চেয়ে থাকে সারা গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা—কবে আসবে তাদের প্রাণের গদাই, হাস্যে লাস্যে আনন্দলীলায় জাগিয়ে তুলবে হারিয়ে-যাওয়া ব্রজের আনন্দ। স্মৃতির কুঞ্জে কেঁদে ফেরে কানু-হারা বৃন্দাবনের বিরহবিধুর দিনগুলি।

শূন্যঘরে পথ চেয়ে ভাবেন জননী চন্দ্রা, আর গদাধরের কুশল কামনা করেন ইষ্টদেবতা রঘুবীরের চরণে।

এমনি সময়ে দক্ষিণেশ্বর থেকে আসে সংবাদ—যে সংবাদ জননীর বুকে হানে গভীর শেলাঘাত। গদাধর হয়েছে নাকি উন্মাদ। বহু রূপে পল্লবিত হয়েই আসে সে-খবর। ব্যাকুল হয়ে ওঠেন জননী। এইতো সেদিন নিজের হাতে সাজিয়ে, জ্যেষ্ঠ রামকুমারের হাতে তুলে দিলেন তাঁর আনন্দনন্দনকে। সেই রামকুমারও চলে গেল চিরদিনের মতো তাঁর স্নেহ-অঞ্চল ছিন্ন ক'রে, আর আজ শেষের সম্বল, নয়নের মণি গদাধর—সে নাকি উন্মাদ হয়ে ফিরছে পথে

পথে··· মন যে আর মানে না। রঘুবীরের চরণে মাথা খুঁড়ে বলেন—"এ কী করলে ঠাকুর! কী অপরাধ করেছি তোমার পায়ে!" অশ্রুধারা হয় যেন বাঁধনহারা। চিরদিনের কান্না কাঁদেন জননী চন্দ্রা—যেমন কেঁদেছিলেন মথুরার রথে তুলে দিতে প্রাণের গোপালকে··· যেমন কেঁদেছিলেন নবদ্বীপের শোভনচন্দ্র যেদিন হয়েছিলেন অস্তমিত ···

ছুটে আসেন রামেশ্বর—ক্ষুদিরামের মধ্যম পুত্র। সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, "তুমি ভেবোনা মা গো, আমি যেমন ক'রে পারি ফিরিয়ে আনব তোমার প্রাণের গদাইকে।" তখনকার মতো শান্ত হয়ে জননী মোছেন অশ্রুবারি। রামেশ্বব যাত্রা করেন দক্ষিণেশ্বরের পথে।

❀ ❀ ❀ ❀
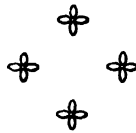
শ্রীরামেশ্বরের সাথে ফিরে আসেন প্রভু গদাধর। মধুবনে ফিরে আসে রূপের তীর্থচারী বসন্ত। নবীন ব্রজের ঘরে ঘরে সে-খবর এনে দেয় মলয়। ছুটে আসে কামারপুকুরবাসী, বহু-দিনের অদর্শন-জনিত বেদনা জুড়াতে। ছাখে—কোথায় পাগল! এ তো সেই আনন্দকিশোর চিরমনোহর, তাদের সোনার গদাই। বলেন ধনী-মা—"আমার এমন সোনার যাছকে লোকে বলে কিনা পাগল!" চন্দ্রা-মা'র মুখেও অশ্রুসজল আকুতি: "আর তোকে যেতে দেবো না, গোপাল!"

অনেকদিনের হারিয়ে-যাওয়া মাণিক ফিরে পেলে যা হয়, সেদিনও তো হয়েছিল এমনি ফিরে আসা, নিত্যানন্দের প্রেমের ছলনায়, ব্রজের পথ ভুলে শান্তিপুরের বিরহ-সঙ্গমে। তবু মনে হয়, ব্রজের বনে এমন মিলনের সাতরঙা রামধনু কোনদিনই জাগেনি। এই প্রেম, এই কৃষ্ণপ্রীতি শুধু সম্ভব নিত্য প্রেমের

বৃন্দাবনে। তাই যুগে যুগে বার বার যখন তিনি এসেছেন, সঙ্গে এসেছে তাঁর লীলার সাথী, আর ধুলার বুকে জেগে উঠেছে প্রেমের ব্রজভূমি নব নব রূপায়ণে—কখনো নদীয়ার রাঙা ধুলায় ··· কখনো কামারপুকুরের হরিৎ-হিরণ-বক্ষে ···

পূর্ব্বের মতোই আনন্দময় হলেও, মাঝে মাঝে গদাধরের মন যেন কোথায় যায় হারিয়ে—ধ্যানগম্ভীর ভাবে বসে থাকেন একাকী। তখন কেউ সাহস করেনা কাছে যেতে। তাই দেখে হিতৈষীরা পরামর্শ দেন পুত্রচিন্তাক্লিষ্টা চন্দ্রাকে। কেউ বলেন—অপদেবতার ভর হয়েছে, রোজা দেখাও; কেউ বা বলেন—বিবাহ দাও, সংসারের মায়ায় মন জড়ালে, ওসব ভাব আপনিই যাবে খ'সে। তাই হ'ল ঠিক, রামেশ্বর সুরু করেন খুঁজতে এই দিব্য কিশোর-কুমার ভাইটির লীলাসঙ্গিনীটিকে।

প্রথমটা কেউই সাহস করেনি গদাধরকে জানাতে, পাছে নীড়বিরাগী মন আরও বিরূপ হয়ে ওঠে, পাছে তাদের সোনার গদাই চলে যায় সংসার ছেড়ে। কিন্তু গোপন কি থাকে? যা কিছু গোপন, যা কিছু অন্তরের কথা, সবই যে আগে জেনে নেন গোপন অন্তরের যিনি দেবতা! আর যাকে সাথে ক'রে নিয়ে এসেছেন বিশ্বের কল্যাণে পূর্ণতা সাধন করতে—তাকে কি গোপন রাখা চলে? তিনি না হলে লীলা যে হবে অপূর্ণ! ব্রহ্ম কি পারে শক্তিহারা হয়ে থাকতে? অগ্নি কি পারে তার দহন-শক্তিকে দূরে রাখতে? সূর্য্য কি সয় দিগ্বধূর বিরহ? তাই বিবাহের সংবাদে চির-আনন্দের ধন চন্দ্রানন্দন কোন আপত্তির কথা না তুলে, বালকের মতো হয়ে উঠলেন আনন্দময়। এদিকে তখন ব্যর্থকাম হতে চলেছেন ভ্রাতা রামেশ্বর। শত সন্ধানেও যখন মিললোনা দেবকুমারের উপযুক্ত একটি দেবকুমারী, তখন মধ্যম অগ্রজের বিষণ্ণমূর্ত্তি দেখে রঙ্গময়ের জেগে ওঠে করুণা। ভাবে আবিষ্ট হয়ে একদিন বলেন, "জয়রামবাটীর রামচন্দ্র মুখুজ্যের মেয়েটি কুটো বেঁধে রাখা আছে দেখ গে যা।" গোপন ঠাকুর, তাঁর

গোপন লীলা-সঙ্গিনী। তাই একেকে চেনাতে প্রয়োজন হয় আর-একজনের। ঠাকুরকে চেনাতে মা—আর মাকে চেনাতে ঠাকুর। যাই হোক, নীড়-উদাসীর নীড়ে ফেরার সাধ দেখে সকলের হৃদয়ে আনন্দ আর ধরে না! বেজে ওঠে মঙ্গলশঙ্খ। আকাশ পাঠায় মাটীকে পারিজাতের আমন্ত্রণী। প'ড়ে যায় উৎসবের সাড়া। রামেশ্বর ছুটে যান জয়রামবাটীতে। জয়রামবাটীর আকাশে বাতাসে তখন প্রজাপতির দূতিয়ালি। দূরাগত আশায় বুক বেঁধে রামেশ্বর দাঁড়ান শ্রীরাম-ভবনের আঙিনায়। প্রথম পরিচয়েই অতিথিবৎসল শ্রীরামচন্দ্র যোগ্য সমাদরে মুগ্ধ ক'রে দেন আনন্দের অতিথিকে। শোনেন তাঁর পুণ্য-অভিলাষ। হাতে যেন পান আকাশের চাঁদ। সানন্দে দেন সম্মতি: "আমার সারুর এমন ভাগ্য কি হবে!"

চৈত্রানিল-গোধূলিতে শেষ হয় মেয়ে-দেখার পালা। ছাখেন রামেশ্বর—পঞ্চমী গৌরী, দেবতার উদ্দেশে তুলে-রাখা অনাঘ্রাত কুন্দকলিই বটে, এক ফোটা ভোরের শিশিরে টলমল করছে। কচি মুখে এক হয়ে গেছে সারা বিশ্বের আনন্দবেদনা। মনে মনে বলেন, উদাসী শিবের নীড় বাঁধতে এমনি একটি উমা-মহেশ্বরীরই প্রয়োজন। উভয়পক্ষের আনন্দ-কোলাকুলির মাঝে উভয়ের সংকল্পই হয়ে যায় স্থির। তারপর সুখ-চঞ্চল বক্ষে ফিরে আসেন রামেশ্বর—পরম শুভ সংবাদ বহন ক'রে। বিবাহের দিন স্থির হয় শেষ-বৈশাখের মুকুল-জাগা দিনে।

কেটে গেল ক'টি বকুলবিবশ বেলা। দেখতে দেখতে দূর দখিনার উজান ঠেলে এসে পড়ে সেই বাঞ্ছিত তিথি। পাতারা আলপনা দেয় বনের পথে ·· কুহুর বুকে ললিত পঞ্চমের মধু মাঙ্গলিক। সহকার-পল্লবে আর মঙ্গলঘটে সেজে ওঠে চন্দ্রাগেহ। মিলন-মন্দিরার সুর প্রতিবেশীদের ঘরে ঘরে। আজ সোনার কিশোরকে বরবেশে সাজিয়ে দিতে ছুটে আসে কামারপুকুরবাসিনীরা। কেউ গাঁথে বরমাল্য ··· দুলিয়ে দেয় অনুরাগরক্তিম বক্ষ সজ্জিত ক'রে, কেউ বা প্রশস্ত চন্দ্রললাটে এঁকে দেয় নয়নলোভন অলকাপাঁতি।

হেমগলিত অঙ্গে শোভা পায় রাঙা চেলি। সেই স্বর্গের সুষমা দিয়ে গড়া, ঠিক্‌রে-পড়া রূপ দেখে চোখ যেন কারো ফেরে না। বুঝি ভাবে, বিধাতার রূপ-তূলিকায় কি এত রূপলেখা ছিল ?

জননী চন্দ্রা, জননীতুল্যা ভ্রাতৃবধূর আনন্দ-অশ্রুর গোধূলিতে যাত্রা করেন গদাধর ; সঙ্গে বরযাত্রী গ্রামের যত দীন নারায়ণ—হাতে লাঠি, কোমরে মাথায় গামছা বাঁধা, কণ্ঠে অফুরান আনন্দ-কলরব। উৎসাহ-উল্লাসে দিক উল্লসিত ক'রে সকলে চলে যেন জয়যাত্রার পথে তাদের একটুকরো গ্রামের অধিষ্ঠাত্রীকে বরণ ক'রে আনতে। মনে পড়ে যায়, উমাকে বরণ করতে চলেছেন ভোলা মহেশ্বর, শিবসুন্দর, ভস্মভূষিত অঙ্গ, ব্যাঘ্রচর্ম্মে ফণিহারে বরবপু সজ্জিত, সঙ্গে প্রধান পার্ষদ নন্দী-ভৃঙ্গী আর ভূত-প্রেত-দানা-দৈত্যের দল, পদভারে ধরণী কম্পিত, কণ্ঠনাদে গগন বিদীর্ণ। অবশেষে সকলেই উপনীত শ্যামার কুটীরে—গৌরীগৃহে আগত গৌরীনাথ ; এ যেন সাগরের আকুল হয়ে আসা নদীর কূল-বন্ধনে। ছুটে আসে পল্লীপুরচারিণীর দল, কেউ বা বারেক দেখে ছুটে যায় সেই গৃহকোণে, যেথায় দেবতা-বরণের প্রতীক্ষায় আকুল, আলোয়-ফোটা কুন্দকলি আমাদের মা সারদা, তাকে জড়িয়ে ধ'রে শোনায় নর্ম্মকথা—"ঠাকুরমণি, তোর প্রাণের ঠাকুর যে এল !" আর অস্ফুট গৌরীর অতল চোখে এক অজানা কৌতুকের শিহর লাগে। সুরু হয় মঙ্গলাচার। কিন্তু শুভলগ্নে ঘটলো এক অভাবনীয় ঘটনা। সাতাশ কাঠির আলোয় যখন গদাধর-সুন্দরকে ঘিরে চলেছে পরিবেষ্টন, বিশ্বেশ্বরের আরতির মতোই হয়েছে সে স্বর্গীয় দৃশ্য, সহসা সেই জ্বলন্ত অগ্নিশিখার সহযোগে ভস্মীভূত হয়ে গেল শ্রীগদাধরের বরদ-হস্তের মাঙ্গলিক সুতা।

শিবশক্তির অনন্ত নিত্যমিলনের কাছে জাগতিক সূত্রের বন্ধন এমনি ক'রেই বুঝি হয় চিরব্যর্থ। তখন সেই লীলার প্রকাশেই মর্ত্তের মুরলীতে বেজে ওঠে অমর্ত্তের আকুল-করা সুর, যা শুনলে মানুষ হয়ে যায় স্তম্ভিত, মনে জেগে ওঠে দিব্য অমৃতময়ী চেতনা।

তাই যখন জয়রামবাটীর সেই দেববাসরে সকলে আনন্দলীলায় মগ্ন —আনন্দের সম্পদ গদাধর ও সারদাকে ঘিরে, সেই আনন্দলীলা-দৃষ্টে ভাবের ঠাকুর গদাধর-সুন্দরের জেগে ওঠে মাতৃপ্রেমের বিলাস। সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রমুখে আধো-আধো-স্বরে ফুটে ওঠে 'মা' 'মা' বুলি, কণ্ঠ-মুরলীতে বেজে ওঠে মাতৃসঙ্গীত। যে সুরস্রষ্টার সুরে সৃষ্টির উষায় জেগে উঠেছিল নব-পুলকের কম্প, সেই চিন্ময় সুরে যখন শ্যামাগেহ হ'ল মুখরিত, তখন সমাগতদের অন্তরচেতনা হ'ল বিকশিত, আর বাহ্যচেতনা হ'ল বিলুপ্তপ্রায়। ঘরে নিমন্ত্রিত অভ্যাগতদের আহার গেল থেমে, রন্ধনরতা সারদাজননী ছুটে এলেন গদাধরের কণ্ঠলীলার মোহময়ী আকর্ষণে, মোহাবিষ্টের মতো চেয়ে রইলেন সেই ভাব-গদগদ আধো-সমাধিগত শ্রীমুখের পানে। আর ধ্যান-তৃপ্ত শিবসুন্দর নিবাত-নিস্পন্দ। বাসরের আনন্দগুঞ্জন গেল থেমে। কৈলাস-শিখরে অকাল বসন্তের চঞ্চলতাকে কার অলখ-প্রহরা যেন নিষেধ হেনেছে—চুপ!
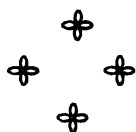
পরের চিত্র কামারপুকুরের চন্দ্রাকুটীর। সে কুটীর আজ আত্মীয়-স্বজন-প্রতিবেশীতে আনন্দ-মুখরিত; চন্দ্রামণির ভাঙা ভিটার আনন্দযজ্ঞে আজ যেন সবার নিমন্ত্রণ। যে আসে লুটে নেয় আনন্দ। আজ যেন মেনকার পাষাণপুরী আঁধার নিথর ক'রে শিবগেহে এসেছেন শিব-গেহিনী, চন্দ্রাদুলালের সাথে চন্দ্রাদুলালী। অশ্রু-উছলিত চোখে ছাখেন চন্দ্রা, স্বস্তি আর শান্তিতে বুক ওঠে ভ'রে। তৃষিত বেদনায় নিবিড় ক'রে জড়িয়ে ধ'রে বলেন—"এসো মা, আমার ঘর আলো করবে এসো!" অতৃপ্ত নয়নে ছাখে পাড়া-প্রতিবেশী, তাদের আনন্দও আর ধরে না! বলে, "আহা ছাখো—যুগল রূপের

শোভা ছাখো, দিদিঠাকরুনের আমাদের সোনার কপাল, এ যে সাক্ষাৎ হরগৌরী!" কেউ জানায় প্রাণভরা আশিস, কেউ বা জানায় প্রণাম। ভক্তি আর স্নেহ এই দুয়ের বন্ধনই যে বিশ্বজননীর গভীর বন্ধন। তবু অভাবের সংসার, দুঃখের সংসার, ভিখারী ভোলার সব-হারানো সংসার। তাই গভীর দুঃখে গদাধরজননী আজকের দিনেও বার বার মোছেন গোপন ব্যথায় ঝ'রে পড়া অশ্রুরাশি। যে সোনার প্রতিমাকে বরণ ক'রে আনলেন তাঁর ঘরে, কোথায় পাবেন তার অঙ্গ-আভরণ—যা দিয়ে তিনি সাজিয়ে রাখবেন মনের মতো ক'রে? আজ তো শুধু কতকগুলি চেয়ে আনা অলঙ্কারে সমাপ্ত দেবীর অঙ্গসজ্জা। কোন্ মুখে তিনি সেগুলি ফিরে চাইবেন, সোনার অঙ্গ শূন্য ক'রে? গভীর স্নেহ এসে আঘাত দেয় ব্যথার দুয়ারে—ভাবেন, এমন কপাল নিয়েও জন্মেছিলাম, এ কপালে সুখ কি সইবেনা গো! অন্তর্যামী দেবসন্তান বোঝেন জননীর অন্তরের গুমরে-ওঠা ব্যথা। তাই করেন উপায়, দেন সান্ত্বনা। দেখতে দেখতে কেটে যায় নিশিগন্ধার সুবাসস্নিগ্ধ ফুল-শয্যার তিথি ·· নববধূর কচি হাতের পরমান্ন-তৃপ্ত বধূ-অন্নের দিন। তারপর এক উৎসব-ক্লান্ত রজনীর শেষপ্রান্তে নিদ্রিতা স্বর্ণপ্রতিমার অঙ্গ হতে খুলে নেন ঠাকুর, পরের-দেওয়া আভরণের বালাই। বালিকা কিছুই পারেন না জানতে, জানতে পারেনা গৃহপরিজন। শুধু জানলো ঐ রাত-জাগা আকাশ, আর অভিমানে ভাসিয়ে দিলো চাঁদের কাঁকন, ভোরের ঝিলে। নিদ্রাভঙ্গে শ্যামার দুলালী অন্বেষণে হন রত—কোথায় গেল তাঁর আভরণ? ব্যথিতা গদাধরজননী আসেন ছুটে, পরম স্নেহে তাঁকে কোলে তুলে নিয়ে অশ্রুসজল চোখে দেন সান্ত্বনা—"মা, গদাই পরে তোমায় এর চেয়ে অনেক ভালো গয়না গড়িয়ে দেবে।" শান্তিময়ী মা আমার তাতেই শান্ত, কিন্তু আভরণ-হীনা সারদাকে দেখে রুষ্ট হন নীলমাধব, বালিকার স্নেহপাগল খুল্লতাত; আর তখনকার মতো দুঃখ-অভিমান-পূর্ণ হৃদয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যান তাঁদের আদরের দুলালীকে। নিরুপায় চন্দ্রার

বুকে এ ব্যথা বাজে গভীরভাবে, কিন্তু সে-ব্যথার অশ্রুও মুছিয়ে দেন রঙ্গভরা হাসির আলোয় তাঁর রঙ্গময় সন্তান, যুগের ব্যথাহারী ঠাকুর—"যাক্-না নিয়ে, বিয়ে তো আর ফিরবেক্নি।"

এব পর প্রায় দীর্ঘ চুটি বৎসর কেটেছিল আনন্দ-সংবেদনে, চুটি বৎসব মায়ের কোল ছেড়ে যাননি মায়ের চুলাল। কিন্তু আমোদরের ওপারের বেলা তখন এপার-চাওয়া। তাই একেবারে উদাসীন থাকতে পারেন না অন্তর্য্যামী দেবতা। মাঝে আর একবার তাঁর চরণ-ধুলায় রাঙা হয়ে উঠলো জয়রামবাটীর পথধূলি। বালিকা সাবদা-গৌরীব শ্রীঅঙ্গের চুই কূলে তখন সপ্তমীর শান্ত জ্যোৎস্না। সেই সপ্তমবর্ষীয়া বালিকা সেদিন 'গুরুচুরুজন'কে স্তব্ধ ক'রে স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে ধুইয়ে দিলেন দেবতাব ধূলিধূসরিত চরণ-চুটি সুস্নিগ্ধ অর্ঘ্যজলে, ঐকান্তিক নিষ্ঠার পদসেবায় তাঁকে করলেন পরিতৃপ্ত। তালবৃন্তের মধুর বীজনে চেয়ে নিলেন তাঁর আনন্দ-প্রসন্নতা। এই সময়ে কিছুদিন শ্যামাগেহ দিব্য আনন্দে পরিপূর্ণ ক'রে ফিরে এলেন ঠাকুর কামারপুকুরে, সঙ্গে নিয়ে এলেন শ্যামার চুলালীকে। এর পরে কামারপুকুরের সেই আনন্দমুখর দিনগুলির কথা ইতিহাসের পাতায় সোনার আঁচড়ে লেখা থাকে না, হেলায় হারিয়ে যাওয়া পরশপাথরের মতো এই দীর্ঘ দিবসের আনন্দচিত্রগুলি বুঝি সহজলভ্য হয়েই হারিয়ে যায় কালের ধুলায়। সুখের শেষে আসে চুখের রাতি, সে যেন আসে জমাট-বাঁধা মেঘের রথে, তাই যেতে যেতে চায়না যেতে। আর সুখ যেন ভেসে-আসা দখিন-হাওয়ার ধন, ক্ষণিকের জন্য চঞ্চল পায়ে এসে ক্ষণিক আনন্দ ছড়িয়ে দিয়ে সে যায় চলে। তাই দেখি কামারপুকুরে গদাধরের সঙ্গসুখের দিনগুলি চঞ্চল স্রোতের মতো ভেসে চলে যায়। গদাধরচন্দ্র ফিরে যান সাধনার সপ্ততীর্থ দক্ষিণেশ্বরে, ডুব দেন মাতৃপ্রেমের অতল তলে। আর এদিকে ফিরে আসেন শ্যামার চুলালী—জননী আর জন্মভূমির ছায়ানিবিড় কোলে। পিছনে পড়ে থাকে বিরহ-ব্যাকুল কামারপুকুর, রাঙা

ধুলায় ফেলে যাওয়া চরণ-চিহ্ন বুকে নিয়ে স্মৃতির তীর্থরূপে, যেন বলে—

"অব দখিনাপুর গদাধর গেল
নয়নক নিধি কো বিধি নেল ॥"
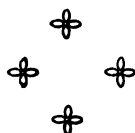
বালিকা সারদা পিত্রালয়ে ফিরে নিত্যদিনের কর্ম্মসাধনায় যান ডুবে। একটানা পল্লীজীবনের অন্যান্য দীন সংসারের মতো এ সংসারেও পূর্ব্বাশার দ্বারে ঊষসীর ডাকে সুরু হয় নূতন দিনের কর্ম্মধারা, দিনান্তের অস্তচ্ছায়ে হয় তার সমাপ্তি। ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতে জননীর সাথে শয্যাত্যাগ করেন বালিকা সারদা। তারপর জননীব গৃহকর্ম্মে হন সঙ্গিনী। অফুট হাতের মার্জ্জনীতে অম্লান হয়ে ওঠে গৃহাঙ্গন ; তুলসীবেদীতে পড়ে স্নিগ্ধ জলের প্রলেপ। শুধু কি তাই, কত ঘুঘু-ডাকা উদাস বেলা কেটে যায় মায়ের সাথে তূলার ক্ষেত হতে তূলা সংগ্রহ করতে। কত নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে আনমনা মনকে টেনে নিপুণ হাতে কাটতে হয় পৈতা। ছোট ভাই-বোনগুলির প্রতিপালনের ভার তো আছেই, সময়-সময় রন্ধনের ভারও পড়ে, জননী অসুস্থ হলে। কোমল অপটু হাতে অন্নভাণ্ড-উত্তোলনে যখন হন অক্ষম, পিতা রামচন্দ্র এসে করেন সাহায্য। দীনের সংসার, নিত্য নূতন অভিযোগ যেন ঘনিয়েই আছে। সেবার এল পঙ্গপালের দল, সোনা-ফলা মাঠে বিসুবিয়াসের অগ্ন্যুদ্গারের মতো দুষ্ট কীটের দল প্রায় সমস্ত শস্য দিল নষ্ট ক'রে ; যেটুকু রইল অবশিষ্ট, ছড়িয়ে পড়লো চারিদিকে। সর্ব্বনাশ, এবার কি না-খেয়ে মরতে হবে ? গ্রামবাসী আসে ছুটে, অবশিষ্ট যা আছে তাই বাঁচিয়ে রাখবার আশায়। তাদের সঙ্গে দেখা যায় এসেছেন শ্যামার

একটুকরো মেয়ে সারদা-লক্ষ্মী, খুঁটে তুলছেন সমস্ত পতিত শস্য, খেলার শেষে মহামায়া যেমন ক'রে রাখেন সৃষ্টির বীজ কুড়িয়ে।

এমনিভাবে কাটে বিশ্বজননীর পল্লীজীবন—দরিদ্র জনক-জননীর অভাবপূর্ণ সংসারটিকে অভয়হস্তে আঁকড়ে ধ'রে, যেন অতি সাধারণ একটি পল্লীবালা। স্মরণে কণ্টকিত হয়ে ওঠে দেহমন, নত হয়ে আসে শির, সতী-সীমন্তিনীর পদরেণু-লাঞ্ছিত দেব-ভারতের পথ-ধুলে। ধুলার মেলায় অলকার আলোর দোলা দেখে নয়ন যায় জুড়িয়ে।

রাজা যখন আসেন ছদ্মবেশে তাঁর আপন রাজ্য পরিদর্শন করতে, তখন কেউ কি চেনে তাঁর স্বরূপ, যদি তিনি না দেন ধরা? তাঁর স্বরূপ শুধু তাঁরই কাছে স্বপ্রকাশ।

তেমনি এই মর্ত্তলোকে যখন নেমে আসেন অমর্ত্তের অধরা, মানব-দুয়ারে প্রেমের ভিখারী বেশে, সেদিনও অতি অল্প কয়েকজনই তাঁকে চেনে। তিনি যে চির-অচিন "অচিনে গাছ দেখেছ! কেউ চেনে না"—শ্রীঠাকুরেরই কথা। তাই যেদিন মানবী-মূর্ত্তিতে স্বর্গের আনন্দপ্রতিমা ধরা দিলেন ধুলার তীর্থে, প্রকৃতির দুলালীর মতো খেলে বেড়ালেন ধরণীর শ্যাম-শয্যা-বিছানো পল্লীর অঞ্চল-ছায়ে, সেদিনও বুঝি চিনেও চেনেনি পল্লীবাসী, খুলেও যেন খোলেনি জননীর আড়ালের অবগুণ্ঠন। সে অবগুণ্ঠন শুধু বুঝি উন্মুক্ত ছিল নিজের কাছে। তাও সময়-সময় যায় হারিয়ে; ধরার ব্যথায় গ'লে, মনে থাকেনা সেই জ্যোতির্লোকের কথা।

সকলে ছাখে বালিকা সারদা শত কাজের মাঝে যেন হয়ে পড়ে আনমনা। একান্ত উদাসীন। আর শ্যামার দুলালী ছাখেন ঠিক তাঁরই অনুরূপ আর একটি রূপময়ী কুমারী হয়েছে তাঁর কর্ম্মের সঙ্গিনী। তার সাহচর্য্যে সকল কাজ সমাপন হয়ে উঠছে, সকলের চেয়ে দ্রুততর ভাবে। হয়তো বালিকা সারদা তৃণসমাচ্ছন্ন দীঘির কালো জলে নেমেছেন দল ঘাস কাটতে, ক্ষুধার্ত্ত গাভীগুলির আহার যোগাতে হবে তো, ছাখেন সঙ্গে আছে সেই অপরূপ

দিব্য কুমারী। দুজনের দিব্যহস্তের স্পর্শে মুহূর্ত্তের ভিতর পূর্ণ হয়ে যায় কাজ। সবার অলক্ষ্যে হাস্যে লাস্যে, দিব্য আলাপে রঙ্গে একই স্বরূপ দুটি রঙ্গময়ীর চলে নিত্য নূতন রঙ্গলীলা। শুধায় সারদা—"কে গা তুমি? রোজই আসো আমার কাজে যোগ দিতে?" কিন্তু হায়—পরিচয় সে দেয় না, দুটি চোখের গভীর অতলে পড়ে দুটি রূপের একই প্রতিচ্ছায়া। তাই বুঝি মা পরবর্ত্তী কালে ভক্ত সন্তানের দলকে বলেছেন—"মেয়েটি যে কে, কিছুই বুঝতে পারিনি।"

চণ্ডীর লীলাতেও দেখি—দেবাসুরের প্রয়োজনে এক উমা-মহেশ্বরীর নানা রূপের বিকাশ একই কালে, একই স্থানে।
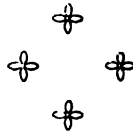
বাঁকুড়ার বক্ষ জুড়ে সেবার হ'ল দুর্ভিক্ষ, সংহার-রূপিণীর সর্ব্বগ্রাসী রূপের ক্ষণ-পরকাশ। কুহুলিত শ্যাম বনাঙ্গনে জ্বলে ওঠে দ্বাদশ সূর্য্যের দাবানল, প্রলয়-বাসরে জেগেছেন বুঝি রুদ্রদেবতা! ১২৭১ সালের সেই মৃত্যুলীলার দিনগুলি জয়রামবাটী ভুলে যাবে না। হাহাকারে ক্রন্দনে ভরা আকাশ-বাতাস, বৃষ্টিহীন গগনের দিকে চেয়ে আকুল হয়ে উঠেছে ক্ষুধিতের আর্ত্তনাদ, তৃণহীন মাঠে শুষ্ক জলার বুকে জেগেছে মরীচিকার হাতছানি। কিন্তু বিশ্ব তো আজ নিঃস্ব নয়, তার আর্ত্তির মাঝে যে আজ জেগেছেন জননী বিশ্বার্ত্তিহারিণী! বিশ্বের সন্তান তাই শুনলো জননীর অভয় চরণের সিঞ্জন। জয়রামবাটীর সেই বুভুক্ষার মৃত্যুলীলার মাঝে অমৃতের ভাণ্ডার খুলে দিলেন একান্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণ—সারদা-জনক শ্রীরামচন্দ্র। ঈশ্বরে একান্ত নির্ভরশীল করুণানিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ফিরে চেয়ে দেখলেন না ভবিষ্যতের আঁধার পথের পানে। আগের বৎসরের সঞ্চিত লক্ষ্মীর

ধন-স্বরূপ ধান্যগুলি এই সময়ে দিলেন ব্যয় ক'রে, পাত্রে পাত্রে পরিপূর্ণ ক'রে রাখলেন ক্ষুধিতের ক্ষুধার সুধা-অন্ন। যে আসে সেই পেট ভ'রে পায় জননীর স্নেহ-পরসাদ; ভিখারী শিবের স্বর্ণ-কাশীর স্বপ্ন বুঝি এমনি ক'রেই সার্থক হ'ল! মনে পড়ে কালিদাসের মর্ম্মোক্তিঃ "আপন্নার্ত্তি প্রশমন-ফলাঃ সম্পদো হ্যুত্তমানাম্॥" (পূর্ব্বমেঘ) [৫৩]। এক এক দিন দেখা যায় ক্ষুধিত এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে অন্নভাণ্ডের ওপর। আকুল হয়ে ওঠে সকলেঃ 'গেল' 'গেল'! কিন্তু কে কার কথা শোনে! সে তখন ফুটন্ত অন্নস্থালীর ওপর প'ড়ে গোগ্রাসে খেতে সুরু করেছে। আর বুঝি কুলিয়ে ওঠা যায় না, কিন্তু অন্নপূর্ণার ভাণ্ড চির-অফুরান; অমৃতকলস কি কখনো রিক্ত হয়! দলে দলে আসে ক্ষুধিত নারায়ণ, দীন নারায়ণ। তপ্ত অন্ন শীতল হবার তরও সয়না। তাই দেখা যায়, ক্ষুধিতের মুখের গ্রাস সদ্যতপ্ত সেই অন্ন—ছোট্ট দুটি রাঙা হাতের কোমল বায়ে জুড়িয়ে দিচ্ছেন ছোট্ট সারদা-লক্ষ্মী, আমাদেরই বাংলা মাটীর সোনার মেয়ে। বিশ্বের বুক-জোড়া রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের জননীরূপে একদিন যিনি শত শত সন্তানের ব্যথা জুড়িয়ে দেবেন, তাদের মুখে তুলে ধরবেন করুণার সুধাপাত্র, তাঁর এ রূপ তো সেই মহান ভবিষ্যতেরই অগ্রসূচী। আজকের এই দাবদগ্ধ ধরণীর শুষ্ক হৃদয় জননীর স্নেহচুম্বন ছাড়া সরস হবে কেমন ক'রে?

দিন যায় কেটে। সাক্ষী শুধু মহাকাল। কোনো দিন জীর্ণ-পাতার মতো যায় ঝ'রে, ধুলায় পড়ে ঢাকা। আর দিব্য মহান দিনগুলি বুঝি ফুলের মতো থাকে গাঁথা তাঁর বরকণ্ঠে। সুখের দুঃখের সংসারে জনক-জননীর স্নেহ-আকুতির মুগ্ধছায়ে, পল্লীর শ্যাম অঙ্গনে আর আমোদরের নর্ম্মলীলায় শ্যামার দুলালীর দিনগুলি যেন ফুলের মতো শতদলে ওঠে ফুটে। আর তারি বুকে চরণ রেখে আনমনা মেয়ে কখন যেন এসে দাঁড়ায় কৈশোরের পূর্ব্বাশায়।

ত্রয়োদশবর্ষীয়া সেই সোনার কিশোরীর ডাক আসে কামারপুকুর চন্দ্রাগেহ হতে। চন্দ্রানন্দন তখন দূর দখিনাপুরে। রাণী রাসমণি

আর মথুরের তখন ধন্য হবার পালা। এদিকে আমের বনে—চন্দ্রাভবনে—বেজেই থাকে বিদায়-পূরবীর সুর। বেদন-গোধূলির ছায়া যেন মিলিয়ে যেয়েও যায় না। তাই বুঝি গদাধরজননী স্নেহ-ব্যাকুল বুকের জ্বালা জুড়াতে, শূন্য অঞ্চলছায়ে নিয়ে এলেন চন্দ্রাদুলালের পরিবর্তে চন্দ্রাদুলালীকে ; বলেন, "গদাই নেই ব'লে কি, এই পোড়া বুকটা জুড়োতে তোকেও আসতে নেই মা ?" বধূর সলজ্জ চোখের কুণ্ঠায় জেগে ওঠে একটি আকুল তৃপ্তি—যেন বলে : "আমি তো তোমারই মা !"

যাঁর লীলার ক্ষণ-ইচ্ছায় সৃষ্টি হয়েছিল বিলসিত, তিনি নিজে যখন ধরা দেন আপনহারা নর্ম্মলীলায়, তখন বুঝি সৃজন-কমলে জেগে ওঠে বাঁধনহারা নিত্য নূতন বিলাসের তরঙ্গ। সেদিন অচেনা ফুলের সুবাস নিয়ে মধ্যদিন উঠেছে জেগে, বনে বনে পাখীর কল-কাকলীর আলোছায়ালী। ঠিক এমনি লগ্নে ঝরা পাতার পথে এসে দাঁড়ালেন আমাদের পল্লীলক্ষ্মী, জননী সারদা—আয়ত চোখে কিশোরী বধূর ভীরু আকৃতি, দুরু-দুরু অন্তর—"তাই তো, কেমন ক'রে যাব একা নাইতে ? একজনও যে নাই সাথে !" এমন সময়ে নূপুর-নিথর পথপ্রান্তে শোনা যায় যেন কাদের চরণধ্বনি। দেখতে দেখতে বনলক্ষ্মীর মতো এগিয়ে আসে আটটি দিব্যকুমারী—যেন রূপ-সাগরে জাগা এক-একটি দখিনার লহর। সহসা একটু থমকিত বিস্ময় : "কে গো তোমরা ! চিনি-চিনি মনে হয়, তবু কেন চিনি না ?" তারপর অচিন চোখের একটু নিমিষে ধরা পড়ার লাজুক হাসি। দেখা যায়, চিরপরিচিতের মতো পরম আদরে শ্যামার দুলালীকে মাঝে নিয়ে মোহনছন্দে এগিয়ে চলেছে সেই রূপময়ীর দল রাঙামাটীর পথ বেয়ে, হালদার-দীঘির অভিমুখে—স্নানতীর্থে। মনে হয় যেন কল্পনা, মনে হয় যেন চিরস্বপ্নের ধন। সেই পল্লীজননীর বক্ষ-নিস্তব্ধ-করা অলস মধ্যাহ্ন, জেগে আছে শুধু কুহুর কূজন আর শঙ্খচিলের পাখায় কাঁপা আকুল আকাশ। সেই শুভক্ষণে পল্লী-পথ-বুকে বেজে উঠেছে দেবলোকের দেবকুমারীদের

নূপুর-সিঞ্জা। সবার অলক্ষ্যে, মর্ত্তের অনবধানে বুঝি চলেছে অমর্ত্তের লীলা, তাই অলস-আচ্ছন্ন পল্লীবাসীব চোখে এই স্নানলীলা পড়েনি ধবা; বুঝি দেখেছিল শুধু বনদেবী, আর ঝ'রে পড়েছিল দুটি ফোঁটা আনন্দাশ্রু। দূরে রাখালের বাঁশীতে মধুবনের মধুবন্তী, হালদার-দীঘির স্বচ্ছ শ্যামল বাবি, লীলায় হয়ে ওঠে চঞ্চল—জননীর সাথে অষ্টসখীব স্নানলীলায়। বাচাল হয়ে ওঠে হংসমিথুন-আঁকা গঙ্গাজলী ঢেউ—তাদের হেমঘট আব কনক-কাঁকনের নিক্কণে। একি ব্রজেশ্বরীব সখী-সঙ্গে স্নানাভিসার, নাকি হিমগিরি-দুহিতাকে ঘিরে অষ্টসখীর সমাবেশ? একদিন নয়, দু'দিন নয়, সেবার কামারপুকুরে নিত্য নিত্য চলেছে মধ্যাহ্নের এই আনন্দলীলা। কিন্তু এখানেও শুনি লীলাময়ীর গোপন-করা বাণী: "অনেকদিন মনে করেছি, মেয়েগুলি কারা? আমাব স্নানের সময়ে রোজই আসে, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারিনি।"

এই সময়ে মাসাধিককাল কামারপুকুরে অবস্থান ক'রে চন্দ্রামণির তপ্ত বুকের জ্বালা শান্ত ক'রে আমাদের সারদালক্ষ্মী ফিরলেন পিত্রালয়ে। কিন্তু চার মাস অতিবাহিত হতে-না-হতে, আবার এল ডাক। তবে এবার আর শূন্য-ঘরে ব্যথায় ভরা আহ্বান নয়, এবার বাজলো আনন্দশঙ্খে জননীর শুভ আবাহনী। গদাধরচন্দ্র ফিরেছেন চন্দ্রামণির আঁধার কোলে। কামারপুকুরে আর চন্দ্রা-গেহে আবার বসেছে আনন্দের হাট। তারি পবিপূর্ণতা-সাধনের জন্য এবার এসেছে শুভ আহ্বান। আনন্দভরা প্রাণে এলেন জননী, বিলিয়ে দিলেন আপনাকে পরম দেবতার চরণতলে··· যুগে যুগে যেমন দিয়েছেন। এখানে দেখি জননীর অপূর্ব্ব আত্মসমর্পণের রূপ। শতদল যেমন উন্মুক্ত ক'রে দেয় আপনাকে, শতধারে ঝ'রে-পড়া অরুণ-আলোর নির্ঝর বুকে ধ'রে নিতে; তেমনি ক'রে কিশোরী জননী তাঁর স্ফুটনোন্মুখ জীবনকোরক মেলে ধরলেন ঠাকুরের দিব্য আলোয়। আর ঠাকুর, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের নবারুণের মতো তাঁকে সাদর সস্নেহ শিক্ষায় দিলেন দীক্ষা। সে দীক্ষায়

নিহিত ছিল ক্ষুদ্র সংসারের খুঁটিনাটি থেকে উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সব-কিছু।

অথচ সব এক। যে মা দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে বিরাজ করছেন দক্ষিণেশ্বরীরূপে, সেই তিনিই তো জননী সারদারূপে অবতীর্ণ, এ তো শ্রীঠাকুরেরই শ্রীমুখের কথা। লীলাময়ী এক রূপে নিচ্ছেন যাঁর আত্মনিবেদন, আর এক রূপে তাঁর কাছে করছেন আত্মসমর্পণ।

✤ ✤

আনন্দ-ছাওয়া দিনের কোলে দিন কাটিয়ে সাতটি মাস পরে ঠাকুর আবার ফিরলেন দখিনাপুরে—১২৭৪ সালের কুহেলী-ভরা অগ্রহায়ণে। লীলার ব্রজে মিলিয়ে গেল ইন্দ্রধনুর সপ্তবর্ণালী। পঞ্চবটীর দেউল হ'ল আলো, আর কামারপুকুরে চন্দ্রামায়ের চাঁদের হাট আবার গেল ভেঙে। ফেলে-যাওয়া পথে প'ড়ে রইলো ক'টি স্মৃতির শিউলি। আলোছায়ায় দোলানো এই তো তাঁর লীলা!

জননী সারদালক্ষ্মীও ফিরলেন জয়রামবাটীর সেই মাটীর দেউলে। ফিরলেন, কিন্তু দেবতার বিচ্ছেদজনিত বেদনা নিয়ে নয়; গদাধরময়ী জননী গদাধরের আনন্দসত্তায় আপনার হৃদয়ঘট কানায় কানায় পূর্ণ ক'রেই, ফিরে এলেন বাল্যের লীলাভূমে। শীতসিন্ন বক্ষের প্রহরই তো লুকিয়ে রাখে ফাগুনের ঝরা মালা—সে যে আবার ফিরে চাইবে।

* * *

"প্রেম আর বিদ্বেষ এই দুটি তত্ত্বেই চলেছে এই বিরাট বিশ্ব-লীলা"—গ্রীক দার্শনিক এমপিডক্লিজের এই বাণী। এই বাণীর মাঝে আছে এক পরম সত্য। তাই বিশ্বের মানব, পশু, প্রতিটি অণু-পরমাণু পর্য্যন্ত পেয়ে থাকে পরস্পরের নিকট হতে অন্তরের এই দুটি

ভাবের স্পর্শ। এমনকি বিশ্বের অন্তরতম দেবতা তাঁর প্রেমঘন সত্তা নিয়ে যখন নেমে আসেন এই বিশ্বেরই ধূলার বুকে, তখন তিনিও পাননা শুধু প্রেমের নিকষিত হেমহার—পান বিদ্বেষের কণ্টক-জ্বালা। এ চিত্র যুগে যুগে বিরল নয়।

দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত যখন লহরিত হয়ে উঠেছে যুগদেবতার সাধনলীলা—নিত্য নব নব রূপায়ণে, 'যত মত তত পথ'-এর বুকে যখন আলো জাগিয়ে তুলতে ছুটে চলেছেন বিশ্বপথের দিশারী, কখনও মাতৃনামে বিভোর গোপাল, কখনও কৃষ্ণপ্রেমে পাগলিনী শ্রীরাধিকা, কখনও করুণকান্ত রামলালার সাথে ঠাকুরের ঠাকুরালি, আবার কখনও বেদান্তের নির্ব্বাণ-পথে অন্তরের অন্তরতম ইষ্টদেবীকে খণ্ডিত ক'রে ছুটে-যাওয়া ব্রহ্মতত্ত্বে। শত-যুগ-বাঞ্ছিত নবযুগের এই অপরূপ অভ্যুদয়ে দক্ষিণেশ্বর তখন আলোয় আলোময়। সেই আলোয় তমসাবৃত আঁধারের পথিকদের অন্ধ নয়ন বুঝি গিয়েছিল ধাঁধিয়ে। তাই ঠাকুরের ঠাকুরালি তাদের চোখে ঠেকে সৃষ্টিছাড়া পাগলামি। আর তাই নিয়ে হ'ল একটি ক্ষুদ্র আলোড়নেরও সৃষ্টি।

আপনভোলা বিশ্বপাগলের পাগলখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে দিকে দিকে। জয়রামবাটীতেও শোনা গেল তারি কানাকানি। স্তম্ভিত হয়ে রইলেন শ্রীরামচন্দ্র। জননী শ্যামার সোনার স্বপ্ন ভেসে গেল চোখের জলে। আর আমাদের বাংলামাটীর মা সারদেশ্বরী? যেন বিরহের ধূপ-চন্দনে আঁকা একখানি বিষাদপ্রতিমা—নির্ব্বাক বেদনায় হয়ে গেছেন মূক, হৃদয়ের আনন্দঘট যেন উথলে ওঠে চোখের জলেঃ "সত্যিই কি তিনি হয়েছেন পাগল?" কিন্তু হায়···

পাড়াপড়শীদের মুখে-মুখেও নানা জল্পনায় কল্পনায় রঞ্জিত হয়ে ওঠে প্রতিবেশীদের গৃহ। অবশেষে সোনার দুলালী সারদাকে তারা অভিহিত করে পাগলের বধূ নামে; মনে ভাবে, একান্ত করুণার পাত্রী এই দেবকিশোরী; মুখেও বলে—"আহা, এমন মেয়ের এমন কপাল! পাগল যার স্বামী, তার আর কিসের সুখ?" পাগল

মহেশের ঘরণী উমা-মহেশ্বরীর কাছে এ নাম নূতন নয়। এ তো তাঁর চিরবাঞ্ছিত নাম যুগে যুগে। তবু দেবদয়িতের নিন্দা সতীলক্ষ্মীর বুকে বাজে তীক্ষ্ণ শেলের মতো। সর্ব্বংসহা জননী যদিও সে-আঘাত সহ্য করেন নীরবে, তবু হৃদয়ের বালির বাঁধ যেন ঠেকিয়ে রাখতে পারেনা কান্নার উজানকে। লোকসঙ্গ হয় অসহ। নিরবচ্ছিন্ন অসঙ্গ জীবন-যাপন হয়ে ওঠে একান্ত কাম্য। আলোছায়ার প্রলাপ-মাখা প্রহরগুলি মনে হয় বিরহের দুরতিক্রম পথরেখা। বাইরের লোকে বোঝেনা দরদ, বোঝেনা কোথায় ব্যথা। মৌখিক সান্ত্বনা দেবার ছলে এসে, আঘাতই ক'রে বসে আর্ত্তনিবিড় বুকে। তাই বাইরের সঙ্গে সকল সম্বন্ধ চুকিয়ে দেন কিশোরী জননী; সম্বল হয় গৃহকোণের নীরস কর্ম্মগুলি। মাঝে মাঝে গৃহকোণ অসহ্য হলে, ছুটে যান দরদী সঙ্গিনী ভানুপিসীর গৃহাঙ্গনে। অঞ্চলে অশ্রুসিক্ত মুখখানি আবৃত ক'রে লুটিয়ে প'ড়ে থাকেন। দিনের আলোকে আড়াল করতে? না, আড়াল করতে বিরহের দাবদাহকে, কে জানে! আবার কখনও অন্তরের দগ্ধ সংবেদনকে দু'হাতে ঠেলে স্মৃতির মন্দিরে আঁকড়ে ধরেন ভুলে-যাওয়া দিনগুলি। কই সেখানে তো দেবতা নয় এমন পাষাণ, এমন বিমুখ! গোমুখী-ভাঙা অশ্রুধারায় আকুল হয়ে ওঠেন জননী। সে অশ্রু-অভিষেকে সিক্ত হয়ে ওঠে দেবতার চরণ। ব্যথার পুষ্প-চন্দনে হয় তাঁর পূজা। মনে পড়ে বৈষ্ণব-কবির অমৃতময় ছন্দ—

আমার বাহির দুয়ারে কপাট পড়েছে
হৃদয়-দুয়ার খোলা।
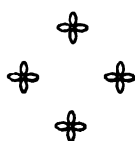
ব্যথায়-ভরা দিনগুলির মাঝেও লুকিয়ে থাকে আশা। তাই বিরহবিধুর বক্ষে থাকে একটি অস্পষ্ট সান্ত্বনার বাণী। একটি একটি ক'রে কেটে যায় মৌন শীতার্ত্ত প্রহর। মধুচক্রের পথ ভুলে যায় ভ্রমর, বেসুর মল্লারে বর্ষার ভাষা যায় হারিয়ে। বিস্মৃতির অদিশে ডুবে যায় আগমনীর আনন্দ। জয়রামবাটীর জীবন-পরিক্রমায় জেগে থাকে একটি অবসন্ন ক্লান্তি। একদিন নয়, দু'দিন নয়, সুদীর্ঘ তিনটি বৎসর। মহাকালের বাধাহীন কালচক্র, কারো অপেক্ষাই সে রাখে না, নিষ্ঠুরতায় নিরপেক্ষ।

যত দিন যায়, জননী শ্যামাতুলালীর ব্যাকুল প্রতীক্ষা যেন হয়ে ওঠে আরও গভীর উৎকণ্ঠায় আকুল। তবে কি হৃদয়ের বালুচরে পড়েছিল যার চলে-যাওয়ার চিহ্ন, তাকে কি মুছে দিল দহনের বৈশাখী ঝড়? না, না, সে তো হতে পারে না। পরম দেবতার সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দিতে অন্তর হয়ে ওঠে উদ্বেলিত, তবু তো আসেনা চিরবাঞ্ছিতের আহ্বান? দখিনাপুরের সেই লীলাময় আর কত লীলা করবেন, কে জানে!··· আবার ফিরে আসে ফাগুন।

কিন্তু এ ফাগুনে যেন কুঁড়ির বুকে সুবাস ফিরে আসতেই ভুলে গেছে। ব্যাকুল ব্যথা হয়ে ওঠে ধৈর্য্যহারা। কিন্তু বুক ফাটে তবু মুখ ফোটে না—বাংলার মেয়ের চিরন্তন-আদর্শ দেখি জননীর মাঝে। অবশেষে একদিন যেন সার্থক হয় মৌন মনের এই বেদন-চঞ্চলতা, অন্তরদেবতা বুঝি শুনেছেন অন্তরের কথা। তাই মুখের ডাক না এলেও, বুকের সাড়া বুঝি ভেসে আসে হৃদয়ের ভাঙা ঘাটে। সত্য-সত্যই একদিন ঘ'টে যায় এক পরম সুযোগ—জননী-সারদার দক্ষিণেশ্বর-যাত্রার।

১২৭৮ সালের ফাল্গুনীপূর্ণিমা—গৌরচন্দ্রের শুভ আবির্ভাবের পুণ্যদিবস। পুণ্যলোভাতুর বাঙালীর গঙ্গাভক্তি আজন্ম। মর্ত্তের মন্দাকিনী, মুক্তির প্রস্রবণী এই মনোহারী গঙ্গাবারি। তার স্নিগ্ধ সলিলে অবগাহন ক'রে, তার ক্ষণিক স্পর্শমাত্রে মানুষ ধুয়ে নিতে চায় তার জন্মজন্মান্তরের সংস্কাররাশি। পুণ্যপ্রভাতের জ্যোতির্গঙ্গায় আপনাকে হারিয়ে সত্যই আঁধারের মানুষ ভুলে যেতে চায় তার সব মলিনতা, সব আবিলতা। তাই এক-একটি শুভলগ্নকে উপলক্ষ্য ক'রে গঙ্গাতটে জ'মে ওঠে ভিড়। ভাগীরথীবক্ষ উদ্বেলিত ক'রে ছুটে আসে সহস্র সহস্র নরনারীর দল। পুণ্যময়ী জননীর বক্ষে সহস্র শিশুর মেলা দেখে নত হয়ে আসে শির। প্রণাম জানাই এই ব্রহ্মবারিকে, আর প্রণাম জানাই এই সরল মনের সনাতনী গতিকে।

এই পুণ্যদিবসে জয়রামবাটীর পল্লীজননীরাও করেছেন মনস্থ গঙ্গাস্নান-যাত্রার। সকলেই উদ্যোগে ব্যস্ত, কলিকাতার ভাগীরথীই হ'ল তাঁদের গম্যস্থল।

এই তো পরম সুযোগ। ভরা চাঁদের দূরাগত জ্যোৎস্নায় যেমন দুলে ওঠে ভরা ঘাটের কূলহারা গঙ্গা, তেমনি বুঝি আকুল হয়ে ওঠে শ্যামার মেয়ের বিরহাতুর অন্তর। এ যেন এক বিরাট 'প্রিহেনসান' (হোয়াইটহেড)। চুপি চুপি জানান অন্তরের অভিলাষ সঙ্গিনীদের—তিনিও যাবেন গঙ্গাস্নানে। সঙ্গিনীদের মুখে শ্রবণ করেন পিতা রামচন্দ্র, বোঝেন কন্যার অন্তরের গোপন ইচ্ছা, তাই তিনি স্থির করেন নিজেই নিয়ে যাবেন তাঁর স্নেহের পুতলীকে।

শুভলগ্নে সুরু হ'ল তীর্থযাত্রা। তখন তীর্থপথ ছিলনা এত সহজ। সে পথ ছিল দুর্গমের হাতছানি। রেলপথের সুবিধা না থাকায়, পদব্রজে অথবা পালকিতেই ছিল চলাচলের ব্যবস্থা। পিতা আর সঙ্গিনীদের সাথে চলেছেন জননী সারদা পদব্রজে। অন্তরের অনিরাকরণীয় আকুলতা মুখর হয়ে ওঠে প্রতি পদক্ষেপে।

দূর পথশ্রমে চরণ-দুটি ক্ষণে ক্ষণে অক্ষম অপটু হয়ে পড়লেও, অন্তরের আশা-আনন্দের কোন ব্যাঘাতই হয় না। সামান্য দৈহিক কষ্ট পারেনা সে দিব্য-চরণের গতি রোধ করতে। তবু বলেন— "আর কত দূর, বাবা ?" অবুঝ সান্ত্বনায় বলেন পিতা—"এই তো আর এসে পড়েছি, মা।"

এমনি ক'রে কোথাও কুসুমভারনতা বনভূমি, কোথাও লতা-কণ্টকে আচ্ছন্ন দীঘির তট, কখনও উন্মুক্ত ঊষর প্রান্তর, কখনও নীপতল-বাহিনী পিঙ্গল পথরেখার বুকে তিনটি দিবস ধ'রে চললো ক্লান্তিহীন পথ-চলা। অফুট চরণ-দুটি যেন আর পারে না, শত আঘাতে হয়ে পড়ে জর্জ্জরিত। কুসুমখিন্ন দেবতনুতে শ্রমভার হয় বুঝি অসহ। তাই কোমলা জননী প্রবল জ্বরে হন আক্রান্ত। আকস্মিক বাধায় সকলের গতি যায় থেমে। যুগে-যুগের যে আপনজন তাকে ব্যথা দেওয়া, এ যেন তাঁর চিরদিনের লীলা! তাই দেখি শ্রীরাধিকার অভিসার-পথে জমে ওঠে শত বাধা,—সমগ্র নদীয়াবাসীর দর্শনের অনুমতির মাঝে জেগে থাকে বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রতি সন্ন্যাসী গৌরচন্দ্রের কঠোর নিষেধবাণী। তাই এ বাধা, এ ব্যথা, জননীর যুগে-যুগের পাওয়া। বাধ্য হয়েই পিতা রামচন্দ্র স্নেহের কন্যাকে নিয়ে নিকটের একটি চটিতে নেন আশ্রয়। অন্য সকলে চলে এগিয়ে।

পান্থশালার একটি ঘরে একটি বস্ত্রে কন্যাকে সযত্নে রক্ষিত ক'রে বলেন—"তুই চুপ ক'রে শুয়ে ঘুমো, মা, আমি এই কাছেই আছি।" তারপর চিন্তামগ্ন রামচন্দ্র একাকী যাপন করেন নিঃসঙ্গ দুশ্চিন্তার রাত্রি পান্থশালার দুয়ারে।

আঁধার পদবিক্ষেপে নীরব নিশীথিনী চুপিসাড়ে এসে দাঁড়ায় ধরণীর দুয়ারে—স্বপ্নের মোহজাল ছড়িয়ে দিয়ে, স্নিগ্ধ শান্তকর হেনে ধরণীর শিশুর চোখে আনে নিদালির ছায়া। জানিনা কোন্ দিনান্তের অবসানে এসেছিল এই রাত্রি, একটি দিব্যলীলা প্রকাশের পরম লগ্ন হয়ে, ধন্য করতে দীন পান্থশালার ধূলিকণাকে।

দেহ জ্বরে আচ্ছন্ন, মন অবসাদ-খিন্ন; অর্দ্ধ-অচেতন অবস্থায় ধুলায় ঝরা তারার মতো জননীর কোমল দেহখানি লুটিয়ে রয় পান্থশালার একটি নিরালা আঁধার কোণে। শুধু অভিমানের সাগর ঠেলে দু'ফোঁটা অশ্রু পড়ে ঝ'রে: "হায় দেবতা, এত পাষাণ তুমি!" প্রহরের পর প্রহর যায় কেটে··· সহসা কার এ শুচি-স্নিগ্ধ স্পর্শ! চমকিত হয়ে ওঠেন জননী সারদালক্ষ্মী। সেই মধুর স্পর্শে তনুতীরে ব'য়ে যায় শান্তির সুরধুনী, দেহের সাথে মনের জ্বালার হয় যেন উপশম। স্বপ্ন-নীল চোখ-দুটি মেলে চেয়ে দেখেন জননী—অমারাতির সাগর-সেঁচা এক অপরূপ রূপময়ী—শ্রীঅঙ্গে বুলিয়ে দিচ্ছেন সব-জুড়ানো হাত দু'খানি, যেন বৈদিক মন্ত্রের রাত্রিদেবী।

পরিচয় নেওয়ার ছলে শুধান জননী—"তুমি কোথা থেকে আসছ গা?" চিরচেনার ভঙ্গীতে রূপময়ী দেন তার উত্তর—"আমি দক্ষিণেশ্বর থেকে আসছি।" বিস্ময়বিমুগ্ধ উদ্বেলিত কণ্ঠে আবার জাগে প্রশ্ন—"দক্ষিণেশ্বর থেকে? আমি মনে করেছিলাম দক্ষিণেশ্বর যাব, তাঁকে দেখব, তাঁর সেবা ক'রব, কিন্তু পথে জ্বর হওয়ায় ঐসব আর হ'ল না।" দরদভরা সান্ত্বনার সুরে বলেন শান্তিময়ী—"সে কি, তুমি দক্ষিণেশ্বরে যাবে বইকি। ভালো হয়ে সেখানে যাবে, তাঁকে দেখবে। তোমার জন্যই তো তাঁকে সেখানে আট্‌কে রেখেছি।" কার বুকে জাগলো এত দরদ, কী তার পরিচয়? আবার জননী করেন প্রশ্ন—"বটে, তুমি আমাদের কে হও গা?" বিজলী-হাসি হেসে কালো মেয়ে দেয় তার উত্তর—"আমি তোমার বোন হই।" পরিচয়ের বাকী থাকেনা কিছুই।

সাধ ক'রে মায়ার কাজল চোখে এঁকে খেলতে এলেন মহামায়া, এই তো তাঁর কাজ। নইলে তো নানা রঙ্গে, নানা ভাব-তরঙ্গে, নানা হাসি-কান্নার হীরে-পান্নার দোলায় 'লীলা পোষ্টাই' হয় না। তাই আপনাকে চিনেও থাকেন আপনহারা, চেনা জনও হয় যেন কত অচেনা। তা না হলে, লীলাময়ীর বুঝতে কি বাকী ছিল, সহসা

রাত্রির আঁধারে যাঁর প্রকাশ, তিনি আর কেউ নন, তিনি তাঁরি অঙ্গসম্ভূতা স্বয়ং দেবী কৌশিকী !

মঙ্গলময়ী ঊষসী চুপি চুপি এসে দাঁড়ায় গগন-অঙ্গনে। পাখীর বৈতালিক স্বাগত জানায় নবপ্রভাতকে। চিন্তাক্লিষ্ট রামচন্দ্রের চিন্তা হয় দূর ; দেখেন কন্যার জ্বর হয়েছে উপশম। রাত্রির অন্ধকারে দীন পান্থশালাখানি যে এক মুহূর্তের জন্যও হয়েছিল মহাদেবীর লীলা-নিকেতন, সে কথা রামচন্দ্র যেন আভাসেও জানতে পারেন না। সে কথা ঢাকা রইল আলোছায়ার ঝরা পাতায়, অনাগত ইতিহাসের স্বপ্ন হয়ে।

দেবজনকের সাথে দেবকন্যার আবার সুরু হ'ল যাত্রা। পথে সঙ্গীদের মেলে সাক্ষাৎ। সেদিনও আসে পথখিন্নতা, কিন্তু কল্যাণী জননী সেদিন কাউকে দেননা জানতে। তবু কন্যার রোগখিন্ন কোমল দেহখানির পানে তাকিয়ে রামচন্দ্রের বুঝতে বাকী থাকেনা তার অসুস্থতার কথা, তাই ঠিক করেন একটি পালকি। দুর্গম তীর্থ-যাত্রার পথে আরামে যাওয়ার এইটুকু তো ছিল সম্বল। পালকির ভেতর কন্যাকে সযত্নে রক্ষা ক'রে, নিজে পদব্রজে চলেন পিছনে পিছনে। লক্ষ্য—দূর দখিনাপুর।
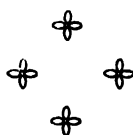
দূর গগনের বুক ভেঙে যখন সুরু হয় স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার অমৃত-সিঞ্চন আর চুম্বন করে ধরণীর শ্যাম অধর, তখন সেই দুকূল-প্লাবী আলোকবন্যার বুকে বুঝি খুঁজে পাই চন্দ্রের সত্যকার মাধুর্য্য। জ্যোৎস্না—সে যেন চন্দ্রের লীলাময়ী রূপ। চন্দ্র আর জ্যোৎস্না—অগ্নি আর তার দাহনী শক্তি—পুষ্প আর তার সৌরভ, এ যেন নিত্য মিলনের ক্ষণ-পরকাশ।

আর এই নিত্য মিলনের নিত্য বিকাশ—অবতার আর তাঁর লীলা-সঙ্গিনী। তাই যখন স্মরণের ব্রজকুঞ্জে বেজে ওঠে শ্যামলের মধুর মুরলী-নিঃস্বন, তখনই শুনি কজ্জল-ধৌত যমুনার তীরে অভিসারিকা শ্রীরাধার নূপুর-সিঞ্জন। আবার যখনই দেখি—মহানগরী অযোধ্যার স্বর্ণ-সিংহাসন গৌরবোজ্জ্বল ক'রে বিরাজমান প্রজানুরঞ্জনকারী শ্রীরঘুপতি-রাঘব রামচন্দ্র, তার সঙ্গে নয়ন-সম্মুখে ভেসে ওঠে বাল্মীকির তপোবনচ্ছায়ে অশ্রুজলাভিষিক্তা রাম-বিরহ-ব্যাকুলা সীতা-মূর্ত্তি, কলবাহিনী সরযূ আজও বহন ক'রে ফিরছে যাঁর করুণ বিরহ-গাথা। আবার নদীয়ার বুকে দ্বারে দ্বারে যখন চলেছে গৌরচন্দ্রের কৃষ্ণপ্রেমভিক্ষা, অশ্রুজলের রাগিণীতে বেজে উঠেছে কৃষ্ণবিরহের গভীর মূর্চ্ছনা, তখন তারও অণুতে অণুতে বুঝি জড়িত ছিল বিষ্ণুপ্রিয়ার গৌরপ্রীতি, তাঁর বেদনমথিত অন্তরের গভীর দীর্ঘশ্বাস!

যুগপ্রয়োজনে চলেছে যুগলীলা। তাই এবার যখন পঞ্চবটীর গহনকানন মুখরিত ক'রে সমন্বয়ের পাঞ্চজন্য হাতে এসে দাঁড়ালেন যুগনারায়ণ শ্রীগদাধরসুন্দর, তখন তাঁর পাশে তাঁরি লীলার অনুবর্ত্তিনী রূপে আবির্ভূতা হলেন যুগের বরাভয়দাত্রী জননী সারদা, যুগ-নারায়ণের যুগলক্ষ্মী। তাঁদের যুগল চরণচিহ্ন চুম্বন ক'রে ফুটে উঠল দ্বাদশটি স্বর্ণকমল··· আর জাগরণোন্মুখ হয়ে উঠল ভারত—তথা সারা বিশ্বের স্তিমিত চেতনা···

উছলিত সুরধুনীর কূলে সেদিন নেমে এসেছে জ্যোৎস্নাবিলাসী সন্ধ্যা—আসন্ন দোলপূর্ণিমার মিলন-হিন্দোলে মুখর নহবতের সুর-সপ্তক। বসন্ত-পবন-মর্ম্মরিত কুহু-মুখরিত পঞ্চবটী, আলোকস্নাতা স্রোতস্বিনীর বুকে অজানার আবেগ। ও-কূলের ঢেউ পরিয়ে দিচ্ছে মিলন-মালা এ-কূলের ঢেউয়ে। সহসা দেখা যায়—সুরধুনীর আকুল স্রোতে ভেসে আসছে একখানি ক্ষুদ্র তরণী। ধীরে, অতি ধীরে সে তরী এসে ভিড়লো বকুলঝরা শ্যামল তটে, আর সঙ্গে সঙ্গে কূল থেকে শোনা যায় ঠাকুরের মধুর দরদী কণ্ঠ—"ও হৃদু, বারবেলা নাই তো?

প্রথমবার আসছে।” তরণী থেকে লজ্জামেদুর চরণে নেমে এলেন শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাসঙ্গিনী জননী সারদা, সঙ্গে দেবজনক শ্রীরামচন্দ্র। সেদিন জননীর বরণশঙ্খ বেজে ওঠে নাই দখিনাপুরীর দেউলে দেউলে, পুরনারী আনেনি বেদনা-সিক্ত অর্ঘ্যের ডালা। শুধু নীরব বটের বীণা ধরেছিল জননীর শুভ আবাহনী, আকাশের তারায় তারায় বেজে উঠেছিল মিলনের জয়জয়ন্তী। আর জননী! বহুদিন-বঞ্চিত দরশ-ধন্য আঁখি-দুটি মেলে দেখেন সেই চির-দরদী মরমী দেবতা, মুখে ঠিক তেমনটি প্রসাদ-প্রসন্ন হাসি। ঐ একটি হাসিই তো পারে সারা জীবনের কান্নার ঋণ শোধ ক'রতে। কে বলে পাষাণ-দেবতা? জননীর চোখে শুধু ফোটে একটি সাগর-গাহন তৃপ্তি; মিটে যায় সকল দ্বন্দ্ব, সকল অবুঝ ব্যথা অভিমান, ভ'রে ওঠে আনন্দের পূর্ণ ঘট, বৈষ্ণব কবির ভাষায় “দূরহি দূর দূরভান”।

শিশু ভোলানাথ ঠাকুর বলেন, “এতদিনে এলে, আর কি আমার সেজবাবু আছে, যে যত্ন করবে?” যত্নের কিন্তু ত্রুটি হয় না। আর, কোথায় থাকবেন দখিনাপুরীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী, সে ব্যবস্থাও হয় অতি শীঘ্রই, শিবসুন্দর শ্রীঠাকুরের শয়ন-মন্দিরেই। তারপর সমানছন্দে চলে অপরূপ সাধনলীলা। ঝিল্লীমুখর গভীর রাত্রে কখনও বা দেখা যায় ব্যাকুলা জননী সারদা জেগে ব'সে আছেন সমাধিলগ্ন নিথর দেবমূর্ত্তির পানে চেয়ে, নিথর আকাশের পানে চেয়ে-থাকা তারার মতো, বিহ্বল আঁখি অজানা ভয়ে ভরা। কখনও বা ছুটে আসেন বাইরে অশ্রুসজল চোখে। ভীতব্যাকুল কণ্ঠে ডাকেন, “হৃদয়, ও হৃদয়!” ত্রস্ত কণ্ঠের আকুল ডাকে ছুটে আসে হৃদয়ঃ “কী হ'ল গো মামী?” বালিকার মতো সন্ত্রস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করেন মা—সমাধি-অচল দেবতাকে কেমন ক'রে যায় জাগানো; বলেন, “কি হবে, কথা কইছেন না যে!” হাসে হৃদয়ঃ “এতে ভয় পাবার কি আছে?” তারপর বহুবার সমাধি-দর্শনে অভ্যস্ত হৃদয়, ছোট্ট মামীটিকে শেখান কোন্ সমাধিতে কী নাম শোনাতে হবে। তবু বালিকার মতো প্রায়ই গভীর আশঙ্কায় কাটে জননীর বিনিদ্র

রজনী। অন্তর্য্যামী দেবতা পারেন জানতে এই শঙ্কিত নিশি-জাগরণ। তাই নহবতে স্বীয় জননী চন্দ্রার নিকট করেন প্রেরণ কিশোরী জননীকে। জননী চন্দ্রাও নিবিড় আদরে বক্ষে টেনে নেন তাঁর আদরের বধূটিকে।

দখিনাপুরের মঙ্গললীলায় তখন দিগন্ত-উৎপূর্ণ আনন্দের মালবশ্রী গুঞ্জন ক'রে ফিরছে পঞ্চবটীর বনে বনে। কখনও দেখা যায় জননী সারদা সাজিয়ে দিচ্ছেন শ্রীঠাকুরকে অপরূপ রমণী-বেশে। শ্রীঅঙ্গে পরিয়ে দিচ্ছেন নানা অলঙ্কার, বহুমূল্য বাস। সে তনুর কানায় কানায় রূপজ্যোৎস্না দুকূলহারা। সে রূপের পানে চেয়ে জননীর চোখেও ফুটে ওঠে একটি সুগভীর তন্ময়তা। ভাবময় ঠাকুরের ভাবে ভাবিতা তদ্গতচিত্তা মাও যে তখন ঠাকুরেরই মতন জগজ্জননীর একান্ত সেবিকা, দাসী, ঠাকুরের সখী, ঠাকুরের কথায় "দুজনেই মা'র সখী"। এমনি চলে কত শত নিত্য নূতন দিব্যভাবের লীলা, যা ভারত তথা সারা বিশ্বের ইতিহাসে চিরনূতন।

আবার একদিনের কথা—শ্রীঠাকুরের দেহছন্দে নেমেছে সেদিন অলকার ভাবগঙ্গা। ছোট খাটটিতে ব'সে আছেন, কালো মায়ের আলোর ছেলে, আর পল্লীর একটি গৃহকর্ম্মরতা বধূর মতোই মার্জ্জনা করছেন বিশ্বেশ্বরী—ঠাকুরের শ্রীমন্দির। সহসা সেই ভাবমন্থর দেবতাকে মা করেন প্রশ্ন—"আমি তোমার কে ?" দিব্যশিশুর অধরে জাগে মেঘভাঙা হাসি ; বলেন—"তুমি আমার মা আনন্দময়ী।" প্রসাদ-প্রসন্নতায় ভ'রে ওঠে জননীর শ্রীমুখ। এই সময়ে আরও একদিন শয়ননিষণ্ণ ঠাকুরের শ্রীচরণ-দুটি সেবা করতে করতে আবার মা করেন প্রশ্ন—"আমাকে তোমার কী ব'লে বোধ হয় ?" এ যেন উমামহেশ্বরীর শিবকে পরীক্ষা। মাতৃবক্ষবিলাসী ঠাকুরের কণ্ঠে কিন্তু বেজে থাকে সেই একই উত্তর—"যে মা মন্দিরে আছেন, তিনিই এই শরীরের জন্ম দিয়েছেন, আর সম্প্রতি নহবতে বাস করছেন। সেই তিনিই এখন আমার পদসেবা করছেন। সাক্ষাৎ আনন্দময়ীর রূপ ব'লে তোমাকে সর্ব্বদা সত্য-সত্যই দেখতে পাই।" এই বাণী ঠাকুরের

শ্রীমুখ হতে একবার নয়—দুইবার নয়—পাওয়া যায় বহুবার, বহুরূপে। ধুলার ঘরে এমন নন্দনের পূজার মন্ত্র জগৎ আর কখনও শুনেছে কি ?

সেবক ভাগিনেয় হৃদয়রাম শ্রীঠাকুরকে প্রাণঢালা সেবায় পরিতৃপ্ত করলেও, কিছু রুক্ষস্বভাবের জন্য ভৎর্সনা-তিরস্কারও লাভ করেছেন মাঝে মাঝে। "খাদ না থাকলে তো গড়ন হয় না"—শ্রীঠাকুরেরই কথা। তাই কখনও কখনও দুর্ব্বিনীত ব্যবহারের জন্য ভক্ত হৃদয়রামকে ঠাকুরের তিরস্কার বা মিষ্ট কথায় সাবধান ক'রে দিতে হয়েছে। একবার তার উমামহেশ্বরী ছোট মামীটির প্রতি হৃদয় দুর্ব্বিনীত আচরণ ক'রে বসে। সাবধান ক'রে দেন ঠাকুর, সেবকের অমঙ্গল-আশঙ্কায়, "ওরে, সাবধানে কাজ কর্। উনি যদি রুষ্ট হন, তা হলে আর রক্ষা নাই।" অনির্ব্বচনীয় যে শক্তি—তাঁকে ধরা-ছোঁওয়ার মাঝে আনতে, তাঁকে চিনতে, তাঁকে উপযুক্ত মর্য্যাদা দিতে পারে এমন সাধ্য আছে কার ? একমাত্র ব্রহ্ম সে অনির্ব্বচনীয় শক্তিকে ধারণ এবং ধারণা করতে পারেন। তাই ব্রহ্মস্বরূপ ঠাকুরই একমাত্র মাকে দিয়েছেন পূর্ণ মর্য্যাদা, চিনতে পেরেছেন তাঁর গুপ্ত প্রচ্ছন্ন স্বরূপ : "ও সারদা সরস্বতী, জ্ঞান দিতে এসেছে"—মনে পড়ে শ্রীঠাকুরের গোলাপ-মা'র প্রতি এই গভীর উক্তি। এ শুধু মুখের কথা নয়, যুগ-দেবতা নিজের দিব্য জীবনের প্রতি পদক্ষেপে দিয়ে গেছেন তার শত প্রমাণ।

নিবিড় গভীর অমানিশা। ১২৮০ সাল, ১৩ই জ্যৈষ্ঠের এক রহস্যময়ী রজনী নেমে এসেছে দক্ষিণেশ্বরে, তথা সারা বিশ্বের প্রাণতটে —অভূতপূর্ব্ব, অনাস্বাদিত অনুভূতির শিহরন নিয়ে, লক্ষ তারার বিস্মিত আঁখি মেলে চেয়ে আছে আকাশ আর এক অচেনা দিগন্তের পানে—কী যেন এক মহান্ দিব্য দৃশ্যের অবতারণা ঘটে যাবে, যা পৃথিবীর ইতিহাসের পাতায় চিরনূতন।

স্তব্ধ হয়ে কান পেতে আছে বনের বাতাস, কার বেদ-নিষিক্ত কণ্ঠে শুনবে নবদেব্যাস্তুতি ? আর দক্ষিণেশ্বর! তার রূপ

সেদিন অতুলনীয়। ধ্যান-গম্ভীর পঞ্চবটী, শান্ত-মেত্তর সুরধুনী, যেন একটি অচঞ্চল আবেগে ধরা পড়েছে সারা বিশ্বের চঞ্চলতা। ধূপ-সৌরভে, পুষ্পমাল্য-পূজাসম্ভারে পরিপূর্ণ মাতৃদেউল। আকাশ-আকুল অনিন্দ্য ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছেন বিশ্বার্ত্তিহারিণী, দেবীর শ্রীঅধরে চিররুচির হাসি। সেদিন ফলহারিণী কালিকাপূজা। কী যেন এক গভীর ভাবে থমথম করছে শ্রীঠাকুরের শয়ন-মন্দির, সেখানে আজ যেন সব আলোক-উচ্ছলতার প্রবেশ নিষেধ। ভাবে আবিষ্ট হয়ে ব'সে আছেন আপনহারা মহাকাল আমাদের শ্রীঠাকুর, একায় একান্ত, মাতৃপ্রেমে গরগর দেব-তনু, আধো-সমাধিলীন-নেত্র স্ব-ভাবমগ্ন মহেশ্বর। কেবলমাত্র ভক্ত দীনু আজকের এই মহানিশার গোপন পূজার আয়োজন করতে, পেয়েছে প্রবেশাধিকার। কিছুক্ষণ পরে সেও যায় চ'লে, আরো ঘনায়িত হয়ে আসে তমোময়ী রাত্রি, আর সেই রহস্যমর্ম্মরিত অন্ধকারের বুক ভেঙে ধীরে ধীরে মন্দিরদ্বারে এসে দাঁড়ান বিশ্বের অশুভফলহারিণী জাগ্রত প্রতিমা জননী সারদেশ্বরী। বারেকের তরে যেন মহাকাশে ধ্বনিত হয় সপ্তর্ষির স্বাগতধ্বনি—'আয়াহি বরদে দেবি'। শ্রীঠাকুরের একটি ধ্যানপূর্ণ ইঙ্গিতে দেবী উপবিষ্টা হন দক্ষিণ পার্শ্বের শুভ্র আলিম্পনমণ্ডিত আসনে। আলুলায়িত-কুন্তলা নিরাভরণা ষোড়শী। সে রূপে লুটিয়ে পড়েছে অচন্দ্রিক রজনীর স্তব্ধতা। সুরু হয় অপূর্ব্ব পূজা। পূজারী শ্রীঠাকুর, পূজ্যা শ্রীশ্রীমা। তটপ্রহত গঙ্গাবক্ষে ওঠে অভিষেক-সূক্ত। অভিষেকান্তে ধীরে ধীরে গম্ভীর কণ্ঠে ধ্বনিত হ'ল আবাহন-মন্ত্র ঃ "হে বালে, হে সর্ব্বশক্তির অধিশ্বরী মাতঃ ত্রিপুরাসুন্দরী, সিদ্ধিদ্বার উন্মুক্ত করো, ইহার শরীর-মনকে পবিত্র ক'রে এঁতে আবির্ভূত হয়ে সর্ব্বকল্যাণ সাধন করো।" মাতৃপ্রণবে দিগন্ত উৎপূর্ণ ক'রে পুষ্প-চন্দনে ভ'রে ওঠে জননীর শ্রীচরণ-প্রান্ত। সিন্দূর-চন্দনে পূজা-তৃপ্ত হয় ললাটদেশ, নিবেদিত হয় ভোগ। আধো ভাব-অতলে জননী উমামহেশ্বরী গ্রহণ করেন শিশু মহেশের পূজা-অর্ঘ্য, ধীরে ধীরে উভয়ে ডুবে যান গভীর সমাধির সপ্তসায়রে, সারা দক্ষিণেশ্বর যেন থমথম

করে। চমক জাগে লক্ষ তারার দীপে। তিমির-দুয়ার উন্মুক্ত ক'রে নেমে আসে রাত্রির তৃতীয় প্রহর, নেমে আসে দুটি সমাধিস্নপ্ত মন ধরণীর নর্ম্মলোকে—ধ্যানমন্তর সপ্তলোক হতে। আত্মনিবেদনে হয় পূজার সমাপ্তি। সাধনায় ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় যা-কিছু—জপের মালা, পূজার বস্ত্র, আভরণ, আর তার সঙ্গে বিল্বপত্রে অঙ্কিত নিজ নাম—সব কিছু হ'ল নিবেদিত দেবীর শ্রীচরণ-নিকষে। লক্ষ তারার দেয়ালী সাক্ষীতে সমাপ্ত হ'ল রহস্যময়ী ষোড়শীপূজা, সারা বিশ্বেব অনবধানে। শুধু আনন্দ-ভৈরবীর ঊষায় বিস্মিত পূজার্থীরা দেখলো—শ্রীঠাকুরের মন্দির হতে চলেছেন নহবতের পানে প্রভাত-গায়ত্রীব মতো এক দেবীমূর্ত্তি, অরুণার্চ্চিত চরণে মুছে দিয়ে অনাগত ভবিষ্যতের অন্ধকার। সুরু এসে মিলিত হ'ল সমাপ্তিতে। সর্ব্ব-সাধনার পথরেখা এসে মিলিত হ'ল চরম পরম পথতটে। সর্ব্বসিদ্ধি মিলিত হ'ল এক মহতো মহীয়ান্ দিব্যাতিদিব্য চরম সিদ্ধিতে। প্রতিষ্ঠিত হ'ল সাধনার শেষ কথা মহামাতৃভাব—যুগলীলার সাধ্য।
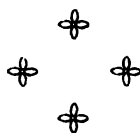
মৃত্যুর কাছে জীবনের চিরপরাজয়। তাই কবির কাব্যে মরণ পেয়েছে মহামরণের রূপ। তবে দেব-মানবদের দৃষ্টিতে মরণ—অনন্ত, বৃহত্তর জীবনের প্রতীক। সে তো মৃত্যু নয়, সে যে মরণমোহন শ্যাম। তাই সেই পুণ্যাত্মাদের, আবির্ভাবের মতো তিরোধান-দিবসও ধরণীর ধুলায় হয়ে থাকে স্মরণ-মহোৎসবের লগ্ন। কোন কোন মহাপুরুষের জীবনে দেখা যায়, হয়তো বিশেষ কোন দিব্য উৎসবের আনন্দ-মুখরিত দিনে ঘটেছে তাঁদের দিব্য জীবনের অবসান। ১২৮০ সালের রামনবমী তিথি—শ্যামার দীন সংসারে সে এক দুর্য্যোগ-দুঃসহ দিন। সেদিন পুত্র কালীকুমারের উপনয়নের চতুর্থ

দিবস, আর সেইদিনই আজ্যাহুতির গন্ধসিক্ত উৎসব-সমাপ্তিতে আজন্ম রঘুবীর-সেবক শ্রীরামচন্দ্র ইষ্টচরণান্তিকে নিলেন চির-আশ্রয়। অন্ধকারের প্রচ্ছন্ন পাথারে ডুবে গেল সব আনন্দকলরব, বিদায় নিলেন রামচন্দ্র। জ্যোতির সায়রে উজ্জ্বল দীপশিখার মতো মিলিয়ে গেল সে জীবন-দ্যুতি, আর নিষ্ঠুর নিয়তির নির্ম্মম পরিহাসের মতো পিছনে পড়ে রইল শত অভাবতাড়িত ক্ষুদ্র সংসার, শ্যামার দীন আকৃতি আর সংসার-অনভিজ্ঞ কয়েকটি নাবালক বালকের তৃষিত হাহাকার। শুধু সেই ঝড়ের আঁধারের বুকে জেগে রইল একটি আশার ধ্রুবতারা। আমাদের মা জননী-সারদেশ্বরী, শ্রীরামচন্দ্র যেন তাঁরই স্নেহচ্ছায়ে সমর্পণ ক'রে গেলেন আপনার যথাসর্ব্বস্ব। জননীও দেখি আজীবন আপন আশ্রয়েই রেখেছিলেন এই ক্ষুদ্র সংসারটিকে। তবে মানবীরূপে লীলা করতে এসে, তার সবটুকু ছলই করতে হয়। তাই আদরিণী দুলালীর মতোই জনকের দেহাবসানে মা হয়ে পড়লেন একান্ত শোকাকুলা। অশ্রুজলে অঞ্চল ভিজিয়ে করলেন দেবজনকের স্মৃতিতর্পণ।

শ্রীঠাকুরের কথা: "থিয়েটারে যে রাজা সেজেছে, সে রাজার মতোই ব্যবহার করবে।" আরো বলেছেন, "দেখছ না, রাম সীতার জন্য মায়ায় কাঁদছেন।" এ যুগের লীলা যে এত গোপন তার কারণ এই আপনার কাছেও আপনাকে গোপন-করা ভাব। তবু এই আকুল আঁধার-ঢালা দিনেও অধিকদিন পিত্রালয়-বাস সম্ভব তো হয় না! এই মন-উদাস-করা বেলায় বুঝি আরো বেশী ক'রে মনে পড়ে আরো উদাস দুটি আঁখি, সুরধুনীর কূল, আর ভাবমন্থর একটি মুখ—কে দেখবে তাঁকে? তাই দু'চার দিনের মধ্যেই জননী শ্যামা ও ছোট্ট ভাই-বোনদের সান্ত্বনায় সন্তর্পণ ক'রে জননী সারদা পিত্রালয় হতে চলে আসেন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ-জননীর সান্নিধ্যে, নহবতের সেই ছোট্ট ঘরখানিতে। অত্যধিক ছোট্ট ঘরখানিতে দুজনের বাস অসম্ভব চিন্তা ক'রে, চিহ্নিত ভক্ত রসদ্দার শ্রীশম্ভু মল্লিক ক্রয় করলেন কিছু জমি, ভবতারিণীর পুরীর নিকটেই,

আর শ্রীঠাকুরের অপর একটি ভক্ত বিশ্বনাথ উপাধ্যায়—শ্রীঠাকুর স্নেহভরে যাঁকে ডাকতেন কাপ্তেন—তিনি দিলেন কিছু শালকাঠ, তাই দিয়ে নির্ম্মিত হ'ল একটি চালাঘর। আর তাতেই শম্ভু মল্লিক নিয়ে এলেন শ্রীবামকৃষ্ণ-জননীকে, আর তার সাথে নিয়ে এলেন জননী সারদাকে। নিযুক্ত হ'ল পরিচারিকা, জননীর সারাদিনের কর্ম্মসূচীতে সহযোগিতা কবতে। শ্রীঠাকুবের প্রথম লীলা-প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে যে কয়েকটি ভক্ত রসদ্দার যোগ দিযেছিলেন গোপন-লীলার বৃন্দাবনে, তাঁদের মধ্যে শ্রীশম্ভু মল্লিকের আছে যেন একটি বিশেষ স্থান, বিশেষ ক'রে ভক্তি-বিশ্বাসেব দিক দিয়ে। তাই দেখি প্রতি মঙ্গলবার ভবতাবিণীব পূজাব প্রশস্ত দিবসটিতে চিন্ময় দেহে অবস্থিতা জননী সারদাকে আকুল আহ্বানে আনয়ন করেন স্বগৃহে, আর তিনি এবং তাঁর সাধ্বী পত্নী উভয়ে ভক্তি-অর্ঘ্যে যোড়শোপচারে পূজা করেন জননীর শ্রীচরণপঙ্কজ। "ভবে সেই সে পরমানন্দ যে জন পরমানন্দময়ীরে জানে"। আঁধারের আড়াল ঠেলে, ভুলো ছেলের মাকে চেনা তো সহজ নয়। কথামৃতের স্থানে স্থানে তাই বুঝি ঠাকুর নিজমুখে দিয়ে গেছেন ভক্তের ভক্তিবিশ্বাসের বহু পরিচয়।

তাঁরি নির্ম্মিত এই ছোট্ট চালাঘরখানি হয়ে ওঠে যেন নারায়ণের ভোগমন্দির। নিত্য নানা উপচারে ভোগ রন্ধন করেন স্বয়ং লক্ষ্মীরূপিণী জননী। রন্ধনান্তে স্বহস্তে ভোগ সজ্জিত ক'রে নিয়ে যান শ্রীঠাকুরের মন্দিরে, নিজে বসে ভোগ নিবেদন ক'রে আসেন জাগ্রত নারায়ণকে।

এমনি ভাবে কেটে যায় একটি বৎসর দেবসেবায়। এরপর শারীরিক অসুস্থতায় মাকে ফিরে আসতে হয় আপন পিত্রালয়ে। তখন ১২৮২ সালের আশ্বিন মাস।
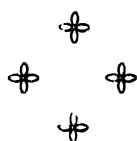
সারা যুগের আকুল হাতছানিতে যাঁদের আবির্ভাব, তাঁদের তো চলেনা একটি কি দুটি কর্ম্মের বন্ধনে বাঁধা থাকা। সারা যুগের ছোট-বড় সব চাওয়াই যে তাঁদের ডাকছে। মুখর আর্ত্তির সে ডাক যে উঠছে কূল ছাপিয়ে। সকল ডাকেই যে জেগে ওঠে তাঁদের সাড়া। তাই তাঁদের দেবজীবনের প্রতিটি খুঁটিনাটির ভিতরেও নিহিত থাকে এক-একটি মহান্ উদ্দেশ্য।

জয়রামবাটীর গ্রাম্যদেবী সিংহবাহিনী দেহস্থিতা চিন্ময়ী দেবীর লীলা-নিকেতনের দেবীমূর্ত্তি। তখন তিনি পাষাণ-বুকে বন্দিনী মা। তখনও পাশের গ্রামের অধিবাসীদেরও অনেকে জানেন না তাঁর দিব্য প্রতিষ্ঠার কথা। তাই নিত্য নূতন দূরাগত ভক্তের পূজা-উপচারে ভ'রেও ওঠেনা মন্দির-প্রাঙ্গণ। রাতের জোনাকি আর দিনের বনফুলের পুষ্পপ্রদীপেই একরকমে সায় হ'ত দেবীর নিত্যপূজা। এবার বুঝি তাঁকে জাগ্রত করতে—জননী আপন দেহে নিলেন কঠিন রোগ। পিত্রালয়ে ফিরে মা'র দেহ রোগের পুনরাক্রমণে হয়ে পড়লো শয্যালীন। সেই শীর্ণ দেবতনিমার পানে তাকিয়ে জননী শ্যামার অন্তরের স্বস্তি যায় হারিয়ে। এদিকে লক্ষ্মীর সংসারে তখন সাধ ক'রে লক্ষ্মী হয়েছেন বিমুখ। তবু গ্রাম্য চিকিৎসার হয়না ত্রুটি। ওদিকে দখিনাপুরের সতী-বিরহ-বিধুর উদাসীর ধ্যানেও বুঝি জাগে বেদন-অথিরতা। শ্রীমুখে যেন জাগে চিন্তার দুটি রেখা: "তাই তো, কত কাজ পড়ে আছে, আর এখনি চলে যাবে? দায় কি শুধু আমার একার!" কিন্তু হায়—দিন যায়, তবু রোগ-শান্তির কোন লক্ষণই যায়না দেখা। সহসা কী যেন মনে পড়ে জননীর, মেঘপাণ্ডুর শ্রীমুখে যেন জাগে একটুকরো জ্যোৎস্না। বলেন, মানুষের চিকিৎসার তো শেষ হ'ল, এবার ছেড়ে দে ভগবানের

হাতে। তারপর এক হেমন্তের শিশিরার্ত্ত প্রভাতে দেখা যায়—সিংহবাহিনীর পূজামণ্ডপে লুটিয়ে প'ড়ে আছে সারা বিশ্বের বেদন-কালিমায় গড়া ক্ষীণ-প্রতিমা জননী সারদা। বেশীক্ষণ নয়, মাত্র কয়েকটি মুহূর্ত্ত। মৃন্ময়ী সিংহবাহিনী জাগ্রতা হয়ে ওঠেন, আকুল হয়ে বলেন—"তুমি কেন প'ড়ে আছ গো?" তারপর রোগের ঔষধরূপে নির্দ্দেশ দেন নিজ মন্দিরের ওলতলার মৃত্তিকা। মা যে—"নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্"। ধীরে ধীরে গ্রামে গ্রামান্তরে গিয়ে পৌঁছোয় সেই বার্ত্তা। ছুটে আসে আর্ত্তভক্তের দল। পূজা-উপচারে, ভক্তসংখ্যায় মন্দিরপ্রাঙ্গণ নিত্য হয়ে থাকে পরিপূর্ণ। এমনি ক'রেই তো যুগে যুগে হয় শত শত দেববিগ্রহের, শত শত তীর্থের প্রতিষ্ঠা। তাইতো আজও ভারত দেবতার লীলা-পীঠ।

অভাবগ্রস্ত দুঃখদারিদ্র্যপূর্ণ সংসার—এ যেন বাংলা-মায়ের একটি বিশেষ রূপ। তবু তারি মাঝে থাকে সাধ, থাকে আশা, থাকে কল্পনার জাল-বোনা। এই নিয়েই মানুষ মরেও থাকে বেঁচে।

শ্রীরামচন্দ্রের দেহান্তে অন্যান্য দরিদ্র সংসারের মতোই হ'ল জননী সারদার পিতৃগৃহের অবস্থা। অপ্রাপ্তবয়স্ক কয়েকটি নাবালক, কোন উপার্জ্জনও নাই, যাজনলব্ধ আয়ের পথও রুদ্ধ, জমিতে লোকাভাবে হয়না প্রচুর ধান্য উৎপন্ন। যেদিকে দৃষ্টি পড়ে, শুধু অভাবের করাল মূর্ত্তি। দেবকন্যা আর দেবমাতা নিজেরাই ধরেন হাল। গাঁয়ের অবস্থাপন্ন ব্যক্তি বাঁড়ুজ্যে, মা শ্যামাসুন্দরী তাঁদের এক আড়া ক'রে ধান দেন ভেনে। লাভ হয় চার কুড়ি ধান, তাইতেই হয় দিনাতিপাত। দুঃখের মাঝে কাটে দিন। চরম পরিণতিই তো সমাপ্তির শেষ লগ্ন! সুখের বুঝি আর দেরি নাই।

সেবার নব মুখুজ্যে নামে গ্রামের জনৈক অবস্থাপন্ন ব্যক্তি শ্যামাসুন্দরীর দেওয়া চালগুলি ক'রলোনা গ্রহণ, কালিপূজার সময়ে দেবীর পূজার কাজে লাগাতে। শ্যামা-মা'র প্রাণে লাগে ব্যথা। নিবেদিত অর্ঘ্য তাহলে দেবী গ্রহণ করলেন না! অশ্রুধারায় অঞ্চল

যায় ভিজে। হৃদয়ে ওঠে হাহাকার। বলেন, "কালীর জন্যে চাল করেছি, এ চাল আমার কে খাবে?" সারাটি রাত ঝরে বাঁধনহারা অশ্রুধারা। অবশেষে সে অশ্রু মানে বাঁধ, যখন শ্রান্তি-ক্লান্তি-হরা আপনি এসে দাঁড়ান আধো তন্দ্রালোকে। দুঃস্বপ্নের সাগর পার হয়ে আসে যেন একটি জ্যোৎস্নামগ্ন প্রহর। শ্যামাসুন্দরী দেখেন নিথর বিস্ময়ে—রক্তবর্ণা দেবীমূর্ত্তি, যাঁর চরণের অফুট আলোয় বিশ্বকমল চোখ মেলে চায়, সেই দেবী জগদ্ধাত্রী—স্নেহস্নিগ্ধ করাঘাতে তাঁকে উঠিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে বলছেন—"তুমি কাঁদছ কেন? কালীর চাল আমি খাব। তোমার ভাবনা কি?"

বিস্ময়ে বিহ্বলতায় শ্যামা-মা করেন প্রশ্ন—"কে তুমি?" এক-টুকরো রাঙা চাঁদের হাসি—তারপর বাজে অলকার আনন্দ-বীণ—"এই যে গো, এর পরেই যার পূজো।" নিশা হয় অবসান আর তার সঙ্গে জীবনের পূর্ব্বাশায় বুঝি দেখা যায় দুখ-নিশির শুকতারার চোখে উষার আনন্দ-ভৈরবী। শয্যাত্যাগ ক'রে শ্যামা-মা কন্যা সারদাকে করেন প্রশ্ন—"লাল রঙ, পায়ের ওপর পা, ও কী ঠাকুর? জগদ্ধাত্রী? আমি জগদ্ধাত্রী পূজো ক'রবো।"

মা'র মুখের কথা তাঁর জননীর প্রসঙ্গেঃ "জগদ্ধাত্রী পূজো ক'রবো—জগদ্ধাত্রী পূজো ক'রবো—একটা বাই হয়ে গেল।" যাই হোক, শত দুঃখ-বাধার ভিতর দিয়ে হয় পূজার আয়োজন। সীমা-অসীমার মিলন-মাধুরীতে গড়া এই জগৎ। পিথাগোরাসের এ কথার যাথার্থ্য বুঝি তখন, যখন দেখি এই নিত্যদিনের চেনার মাঝে এমন ঘটনাও এসে পড়েছে অচেনার রহস্যলোক হতে ছায়াপথহারা তারার মতো। দেখতে দেখতে কখন একসময় শরৎ-শেষের কুন্দতীর্থে এসে দাঁড়ায় স্বর্ণ-সীমন্তিনী হেমন্তিকা। কিন্তু "হায় হেমন্তলক্ষ্মী, তোমার নয়ন কেন ঢাকা"। দীন আয়োজনে আকুল শ্যামাসুন্দরী, রিক্ত আঁখি তুলে দেখেন হেমন্তের মেঘমগ্ন আকাশের পানে—তাইতো কী হবে? বিশ্বাসদের কাছ থেকে দু'আড়া ধান হয়েছে আনা, কিন্তু ধান শুকোবে কেমন ক'রে? চারিদিকে যে

ঘোর ঘনঘটা, প্রবল বৃষ্টিপাত। নিরুপায় জননী শ্যামা, যেন আরো হয়ে পড়েন উপায়হীন। কিন্তু জগদ্ধাত্রী যেখানে কন্যারূপে হয়েছেন আবির্ভূত, সেখানে যে কাঁটার মাঝে উন্মুখ হয়ে আছে কমল-ফোটার কথা। তাই জননী শ্যামা অশ্রুভরা চোখে দেখেন চারিদিকে প্রবল বৃষ্টিধারা, কিন্তু তাঁর ভাঙা কুঁড়ের ধানের চাটাইতে এসে পড়েছে একটুকরো হেমন্তের হিঙুল-ফোটা রোদ। তারি নরম স্পর্শে শুক্‌নো হযে ওঠে ভিজে ধানের রাশ। আবার দেবীপ্রতিমার ব্যবস্থাও হয় দিব্য প্রেরণায়। শিওড় গ্রামের কুঞ্জ মিস্ত্রী, সেই গড়ে যত দেবদেবীর মূর্ত্তি। সহসা সেদিন তার দুয়ারে এসে দাঁড়ায় নাম-না-জানা এক পল্লীকিশোরী—রূপে তার বনজ্যোৎস্নার আবেশ। 'একি মানুষ!'—কুঞ্জব চোখে একটা অনামা প্রশ্ন ঝিলিক দিয়ে উঠেছিল। সেই মেয়েই তো এসে ক'রলো তাকে আদেশ, "জয়রামবাটীর প্রসন্ন মুখুজ্যের ঘরে হবে দেবীপূজা, সেই দেবীমূর্ত্তি গড়তে তোকেই যেতে হবে।" ছুটে আসে কুঞ্জ। এদিকে বিন্দুমাত্রও কিছু জানেন না শ্যামাসুন্দরী। তিনি তখন বিদুরের খুদকুঁড়োয় রিক্তডালা সাজাতেই রত, চিন্তা—কেমন ক'রে জগজ্জননীকে এই রিক্ততার মাঝে প্রাণের সেবায় করা যায় পরিতৃপ্ত। আবেগে করেন প্রশ্ন—"কে গেছলো তোমায় বলতে?" উত্তরে কুঞ্জ বলে—"আপনারা যে একটি মেয়েকে পাঠিয়েছিলেন।" চোখ হতে রহস্যের যবনিকা কি যায় খ'সে? না, হয়ে ওঠে আরো গহিন? এ কি সেই মেয়ে? স্বপ্নের-সাগর-ধোয়া স্বপ্নময়ী?

সকলেই বুঝতে পারে দেবী জগজ্জননী নিজেই গিয়েছিলেন তাঁর প্রতিমা-নির্ম্মাণের আদেশ দিতে। স্থূলভাবে যে সংসারটির সুখে-দুঃখে নিজেকে রেখেছেন জড়িয়ে, সূক্ষ্মেও সেই সংসারটির ভার যে তাঁকেই নিতে হবে, সে তো কিছু আশ্চর্য্য নয়। যাই হোক, সেই বাদল-উছল দিনেই মূর্ত্তি হ'ল নির্ম্মিত, আর দেবীর অঙ্গরাগ হ'ল কাঠের আগুনে সেঁকে। দূর দখিনাপুরেও সে-খবর পৌঁছায়,

আগমনীর আমন্ত্রণী বহন ক'রে আনেন প্রসন্নমামা। শ্যামা-মা'র যে বড় সাধ—প্রথমবার পূজা, আর জামাই আসবেনি! তাই আনতে পাঠিয়েছেন শ্রীঠাকুরকে। শ্রীঠাকুর হয়তো তখন আনন্দ-আতুল ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছেন সুরধুনীর কূল আকুল ক'রে। প্রসন্নমামা পূজার কথা জানাতেই, স্নিগ্ধ প্রসন্নতায় বলেন, "মা আসবেন?—মা আসবেন? বেশ, বেশ। তোদের বড় অবস্থা খারাপ ছিল যে বে?" দ্বিধায় সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেন প্রসন্নমামা। তারপর সসঙ্কোচে বলেন, "কিন্তু আপনি না গেলে পূজা অসম্পূর্ণ হয়ে যাবে। আপনি যাবেন। আপনাকে নিতে এলুম।" সস্নেহে বলেন ঠাকুর—"এই আমার যাওয়া হ'ল। যা, বেশ, পূজা কর্‌গে। বেশ, বেশ। তোদের ভালো হবে।" শ্রীমুখচ্যুত করুণাশিস হয়েছিল সার্থক সুন্দর।

* * *

সমারোহের সঙ্গে সমাপন হ'ল মাতৃপূজা। দেশের লোক আনন্দ-কোলাহলের সঙ্গে গ্রহণ ক'রলো প্রসাদ—পূর্ণতৃপ্তিতে। আশ্চর্য্যের বিষয়, ঐ চালেই অন্নপূর্ণার অন্নস্থালী যেন ভ'রে উঠেছিল। বেজে ওঠে বিসর্জ্জনের বাজনা—ভক্তের অন্তরে নামে বিষাদের বন্যা। অশ্রু-উছলিত চোখে জননী শ্যামা, জগদ্ধাত্রীর কানে কানে বলেন অতি সংগোপনে, "মা জগাই, আবার আর-বছর এসো, আমি সমস্ত বছর ধ'রে তোমার জন্যে সমস্ত যোগাড় ক'রে রাখবো।" নিরাজনের অশ্রুজলেই বুঝি ভরা হয় আগমনীর সপ্তকলস। এমনি বুক-নিঙড়ানো আকুলতা, এমনি আঁকড়ে-ধরা বিশ্বাস না হলে, স্বয়ং জগদ্ধাত্রী কন্যা-রূপে আসবেন কেন, রিক্ত দেবায়তনকে ধন্য করতে?

পরের বছরে জননীর কী লীলা জানি না। হয়তো পরীক্ষা, না-হয় সংসারের অসচ্ছলতার কথা ভেবে বলেন—"একবার পূজো হ'ল, আবার কেন?" দিনান্তের অবকাশে রাত্রির তিমির-তীর্থে জননী নিজেই দেখেন স্বপ্ন—দেবী জগদ্ধাত্রী জয়া-বিজয়ার সাথে বিদায়-মন্থর চরণে গমনোদ্যত; বলছেন, "আমরা তবে যাই?" তিনবার

এই কথা বলার পরেই গললগ্নীকৃতবাসে জননী সারদা ধূলি-লুণ্ঠিত হয়ে বলেন—"না না, তোমরা কোথা যাবে? তোমরা থাকো। তোমাদের যেতে বলি নাই।" একই শক্তির নানা রূপের বিলাস, এই দেবলীলা। সাধারণ বুদ্ধি এখানে অবিশ্বাসে মূক। একে বুঝতে হলে, চাই প্রজ্ঞার পাথেয়; শুধু একেরই লীলা ছাড়া কোন কথাই চলে না। শ্রীচণ্ডীমুখে 'একৈবাহং' মন্ত্রের এই কি জ্বলন্ত প্রমাণ? মনে পড়ে, আর এক হেমন্তের সোনালী-সারঙ-লগ্ন—দেবী জগদ্ধাত্রীর পূজাপীঠের সম্মুখে সমাসীনা জননী সারদা—ধ্যান-সমাহিতা দেব-তনিমা, সম্মুখস্থিত প্রতিমার মতোই পাষাণ-মন্থর। ঠিক এমনি সময়ে এসে উপস্থিত—গ্রামের জনৈক প্রাচীন ভক্ত, প্রতিমা দর্শন ক'রতে। শুরু হয় দেবলীলা। নিবেদন-ধন্য একটি দীর্ঘ প্রণতির শেষে বৃদ্ধ দাঁড়ায় উঠে · সহসা নয়নে লাগে ধাঁধা · অথৈ আলোয় বারেক ভাঙে নেভা দীপের ঘুম। আঁখির দুর্ব্বলতাকে সবলে মুছে সে চায় জননী সারদার শ্রীমুখ আর মৃন্ময়ী প্রতিমার পানে ·· দেখতে দেখতে চিন্ময়ী-মৃন্ময়ীর ভেদ যায় হারিয়ে ·· দিব্য চেতনায় অন্তরের মোহ-আবরণ যায় খ'সে। ভীত, বিস্মিত, সন্ত্রস্ত হয়ে তবু সে বার বার চেয়ে ভাখে, একই স্বরূপ দুটি দেবীপ্রতিমার দিকে। একটা আশ্চর্য্য আবেশ, একটা অব্যক্ত আনন্দ তাকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে। অবশেষে অসহ্য হয়ে ওঠে এই দিব্য অনুভূতি। অসহ ভয়ে আর্ত্তনাদ ক'রে বৃদ্ধ ভীতব্যাকুল হয়ে সেখান হতে পালায় ছুটে। মরুর বুকে সুধার সাড়া কি এমনি ক'রেই হয় বিফল? ··· প্রতিবছর জগদ্ধাত্রীপূজার সময়ে শ্যামার ঝিয়ারীকে আসতে হ'ত—মা'র পূজার বাসন মাজতে। অবশেষে মায়ের কথা: "ছেলে যোগীন সব কাঠের বাসন ক'রে দিয়ে বললে, "মা, তোমাকে আর বাসন মাজতে হবে না। জগদ্ধাত্রী-পূজোর জমিও ক'রে দিলে।" এই থেকে চলতে লাগলো মা'র পূজা, বৎসরের পর বৎসর। এমনকি পরবর্ত্তী কালে জনৈক ভক্তের প্রতি মায়ের নির্দ্দেশ পাওয়া যায়: "দেবীপ্রতিমার বিসর্জ্জনের পূর্ব্বে তাঁর কর্ণ-আভরণ একটি যেন খুলে রাখা হয়—জননী জগদ্ধাত্রী

তাহলে সেইটি মনে ক'রে আবার আসবেন।" মায়ের দেওয়া সেই প্রথাই তখন থেকে এখন পর্য্যন্ত প্রচলিত প্রথাস্বরূপে দাঁড়িয়ে গেছে। অন্তরের সহজ বিশ্বাসে ঘরের মাকে ঘরে ফিরিয়ে আনবার এই তো সহজ উপায়। এই দুর্দ্দিন-ভরা যুগে মায়ের জগৎপালিনী জগদ্ধাত্রী রূপ যে ছেলেদের একান্ত প্রয়োজন—কি চিন্ময় দেহে, কি চিন্ময় বিগ্রহে, সব রকমে।
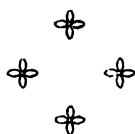
আলোছায়ার নীল মিতালিতে যখন ফুটে ওঠে সপ্তবর্ণ ধনু, তার সব-ক'টি রঙেই তো ফুটে ওঠে সূর্য্যের সার্থকতা। ছোট-বড়র প্রশ্ন সেখানে নীরব।

খুব সম্ভব তখন ১২৮৩ সালের হিম-লগ্ন; দেবজননী চন্দ্রা তখন নরদেহের অবসানে অমৃতলোকবাসিনী। জননী সারদা এসেছেন দক্ষিণেশ্বরে সেই ভক্তনির্ম্মিত পর্ণকুটীরে। কিন্তু এখানে অধিকদিন হয়না থাকা, দেবতার সেবায় যে অসুবিধা হচ্ছে। শ্রীঠাকুরের দেব-দেহে তখন আশ্রয় নিয়েছে কঠিন অতিসার রোগ। লীলায় মন রাখবার এ এক অদ্ভুত পন্থা। ঠিক এই সময়েই কোথা হতে দক্ষিণেশ্বরে এসে উপস্থিত হন মঙ্গল-সন্ধ্যার মতো এক প্রাচীনা তপস্বিনী; পরিচয় জিজ্ঞাসার উত্তরে মৃদু হেসে বলেন—"আমি কাশীবাসিনী।" মমতার অসি-বরুণা যেন নেমে এল জাহ্নবীর চরণপ্রান্তে; এসেই কারো আপত্তি-অনুমতির অপেক্ষা না রেখেই স্ব-ইচ্ছায় তুলে নিলেন শ্রীঠাকুরের দেবতনুর সেবাভার, যেন শ্রীঠাকুরের সাথে তাঁর পৌর্ব্বিক পরিচয়। আর সেইসঙ্গে বহু চেষ্টায় নহবতের ছোট্ট অচলায়তনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন জননী সারদাকে। আনন্দের স্বর্ণকাশীতে বাজলো বোধন-বৈজয়ন্তী,

লীলার সংশতীতে সুরু হ'ল এক নূতন পর্ব্ব। শোনা যায়, শ্রীশ্রীমা তখনও শ্রীঠাকুরের সম্মুখে অবগুণ্ঠনময়ী লাজুক বধূটি। তাঁর সেবার সমস্ত কাজেব মাঝে নিজেকে জড়িয়ে রেখেও যেন সরিয়ে রেখেছেন আড়ালের আঁধারে। যেখানে যত আপন, সেখানে তত গোপন; যেথায় যত নিবিড়, সেথায় তত গভীর। দিব্য তাপসীর প্রাণে কিন্তু সয়না হরগৌবীব এই বিবহ-বৈচিত্র্য, একটি অটল প্রতিজ্ঞায় বহস্যময় হয়ে ওঠে তাঁব মুখ। তাই সেদিন ধরার নীলাভ ধূসর চোখে ঘনিয়ে এল যখন একটি মিলনোন্মুখ হিমরাত্রি, মৌনের বিশ্রম্ভালাপে নিথব পঞ্চবটী, তারার আলোয় আধো-আঁধারে আকাশেব বুকে আর ধরণীব বুকে বচনা করলো দীর্ঘ ছায়াপথ। ঠিক এমনি মহানিশার লগ্নে শিবদূতীর মতো ভক্তিমতী কাশীবাসিনী নিয়ে এলেন জননীকে আহ্বান ক'রে শ্রীঠাকুরের শ্রীমন্দিরে, আর উন্মোচন ক'বে দিলেন তাঁর শ্রীমুখের অবগুণ্ঠন ; হয়তো বা হেসে বললেন, শিব আপন-ভোলা ব'লে কি তাকেও ফাঁকি দিবি মা? পূর্ব্বরাগের প্রদীপ হাতে দাঁড়িয়ে থাকে আকাশ—একটি মুহূর্ত্তের নির্নিমেষ ভঙ্গীতে হয় যেন শিব-শক্তির নূতন পরিচয়। "মা, মা—ব্রহ্মময়ী—ব্রহ্মময়ী গো—" —শ্রীঠাকুরেব কণ্ঠে আকুল হয়ে ওঠে এ-যুগের কান্না। বুঝতে বাকী থাকেনা শিবতীর্থচারিণীর, এ যে চিরদিনের দিব্য শিশু—আর চিরদিনের আদিভূতা সনাতনী ; এই সম্বন্ধ-সূত্রেই এ-যুগের লীলার মঙ্গলাচরণ। হয়তো ভাবেন—দীর্ঘদিন গেছে চ'লে—সেদিন দাঁড়িয়ে ছিলেন অন্নপূর্ণার দ্বারে ভিখারী ভোলানাথ, আর আজ অন্নপূর্ণা এসে দাঁড়ালেন শিবের দ্বারে, চক্ষে কুণ্ঠাজড়িত মৌন মিনতি। দেবলীলার মাঝেও আছে বৈচিত্র্য, আছে অভিমানের প্রতিদান। ম্লান হয়ে আসে দীপের আলো, আরো ছায়া নামে মন্দির-বুকে। দিব্য দিঠির নিরীক্ষা আরো গভীর ক'রে তুলে দেখেন কাশীবাসিনী—জননীর আঁখি হতে বিলীনপ্রায় কুণ্ঠার কুহেলী, সেখানে জেগে উঠেছে গভীর প্রজ্ঞার আলো, আনন্দের দীপাধারে অনির্ব্বাণ। আর ঠাকুর [illegible] [illegible]

আলাপে হয়ে উঠেছেন মুখর, এ যেন "দুঁহুভাব হেরি দুঁহু ভেল ভোর"। ত্রস্ত পদক্ষেপে কেটে চলে রাত্রি, একটি সুনিশ্চিত প্রভাতের পরিণতিতে; ধ্যানসমাহিত শ্রীমন্দিরে তার কোন ছায়াপাতই যেন হয় না, সেখানে সেই একই ভাবে চলে দিব্য আলাপন। তিনজনেই থমকহারা পায়ে আছেন দাঁড়িয়ে, ভাবসাগরে ডুবু-ডুবু। কখন যে রাত্রি হয়েছে প্রভাত, কখন খুলে গেছে দেবালয়ের দ্বার, কখন যে এসেছে পুষ্পলাবী পল্লীবালার দল—সে খেয়াল নেই কারোরই। মর্ত্তের কালের নিরিখ হারিয়ে যায় কালাতীতের কালে। তাই কি শুনি পুরাণমুখে—আমাদের যুগ কেটে গেলেও, ব্রহ্মার এক মুহূর্ত্ত হয়না পুরো। এমনিভাবে সেদিন কেটেছিল সারাটি রাত। ভোরের আলোয় হুঁশ ফিরে এলে, ফিরে এসেছিলেন মা আপন কর্ম্মমন্দিরে—নহবতে। তারপর কোন এক অনামা মুহূর্ত্তে অন্তর্হিতা হয়েছিলেন সেই কাশীবাসিনী। শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলা-কাব্য সমৃদ্ধ হয়েছে এমনি শত শত প্রক্ষিপ্ত চরিত্রের চকিত আবির্ভাব ও বিসর্জ্জনে। চরিত্র-সৃষ্টিই যে মহাকাব্যের স্বধর্ম্ম।

* * *

জীবনে জীবনে হাসি-কান্নার আলোছায়ায় কেটে যায় সুদীর্ঘ কয়েকটি বৎসর। কিছুদিন পিতৃভবনে অতিবাহিত ক'রে ফিরে এলেন মা সারদা, দয়িততীর্থ দক্ষিণেশ্বরে; সঙ্গে জননী শ্যামাসুন্দরী। সেদিন বকুল-ঝরানো ভোরের বাতাসে লঘু-চঞ্চল সাড়া তুলে সুরধুনী-তীরে এসে লাগলো একটি ছোট্ট তরী—কোথায় ছিল ভাগনে হৃদয়রাম, এল ছুটে—স্বভাবরুষ্ট সেবক। কি জানি মহামায়ার কী অচিন্ত্য মায়া, সহসা চিরসেবক হৃদয় যেন হয়ে গেল অজ্ঞানে আচ্ছন্ন, ক্রোধে অন্ধ, দিগ্‌বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য, তার তীব্র অপমান-ভরা বাক্যবাণ বর্ষিত হতে লাগলো শ্যামাসুন্দরীর উপর: "কেন এলে তোমরা? কিসের জন্য এসেছ? এখনি ফিরে যাও।"

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়ালেন শ্যামাসুন্দরী। দু'চোখে জ্বলে ওঠে অপমানের তীব্র জ্বালা। পরক্ষণেই আহত

অভিমানে যেন খানখান হয়ে যায় তাঁর হৃদয়—হায়, এই কি আমার গৌরীর শিবের সংসার? বলেন, "এখানে কার কাছে মেয়ে রেখে যাব?" মেয়ের হাত ধ'রে কেঁদে ওঠেন, "চল্ মা, আমরা ফিরে যাই।" আর আমাদের উমা-মহেশ্বরী—জননী সারদা? তাঁর অবস্থা? যেন বেগপ্রতিহত তরঙ্গিণী, উপরে নিবিড় আকুলতায় নিথর একটি চরণ, নীচে কূলচুম্বিত জলতট স্পর্শ ক'রে মূক স্তম্ভিত আর এক চরণ; কবির ভাষায়ঃ

মার্গাচল-ব্যতিকরাকুলিতেব সিন্ধুঃ
শৈলাধিরাজতনয়া ন যযৌ ন তস্থৌ ··

শুধু দুই কূলের হাতছানিতে দ্বিধামন্থর চোখে চেয়ে দেখেন, সম্মুখের উপকূলে দেবদয়িত শ্রীগদাধব—সমাধি-গঠিত সদাশিব, সাক্ষী-স্বরূপ আছেন দাঁড়িয়ে—দৃষ্টি সমাহিত, যেন ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান ত্রিকালের ছায়া পড়েছে দ্রষ্টার সে-দৃষ্টিতে; বুঝি, বুঝেছিলেন হৃদয়ের জীবনের অন্য পরিচ্ছেদ সুরু হবার এই হ'ল সূচনা!

একরাশ অশ্রু আর বুক-চাপা অভিমান আছড়ে পড়ে অন্তরের দুই কূলে। তবু মাথা পেতে নিলেন জননী, হৃদয়ের অপমানের সঙ্গে দেবদয়িতের এই নিষ্করণ নির্ম্মমতাঃ "তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক, হে দেবতা!" কালিদাসের কাব্যে হয়েছে মিলন-সমাপ্তি, এখানে হ'ল বিচ্ছেদ-বিধুর ব্যথায়। অপমানে লাঞ্ছিতা জননী ফিরে গেলেন জয়রামবাটীর অভিমুখে, একটি অনর্পিত অর্ঘ্যের মতো বুক-ভরা ব্যথা নিয়ে। শুধু ভবতারিণীর চরণ-কমলে রেখে গেলেন একটু সজল মিনতিঃ "মা, আবার যদি আনাও তবেই আসবো।" ফিরে গেলেন জননী, কিন্তু কিছুদিন পরেই এল খবর—হৃদয় কোন এক লঘু অপরাধে দক্ষিণেশ্বর হতে হয়েছে বিতাড়িত। সূক্ষ্ম হতেও সূক্ষ্ম, অতি গহনগতি মহামায়ার দুরতিক্রমণীয় এই মায়াঃ "ব্রহ্মা বিষ্ণু অচৈতন্য জীবে কি করিতে পারে"। তা না হলে, চিরদিনের সেবক, সেবার মূর্ত্তপ্রতীক হৃদয় কেন আজীবন এমন একটি স্বভাবের বশীভূত

হবে, যা তাকে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত ক'রে টেনে নিয়ে গেল ভগবানের সেবার রাজ্য থেকে।

হৃদয়ের পরে সেবার ভার পড়লো রামলালের উপর, কিন্তু ভ্রাতুষ্পুত্র রামলালেরও ঘটলো পরাজয়—সেবার পদে পদে ঘটে ব্যাঘাত। ভাবে বিভোর গোরারায় কখন হন বাহ্যজ্ঞানশূন্য, কোথাও বা ধুলায় গড়াগড়ি। আহ্বান এল জয়রামবাটীতে, শ্যামার মন্দিরে—সারদাকে যেতে হবে দক্ষিণেশ্বরে; উছলে ওঠে হারিয়ে-যাওয়া অশ্রু: "তিনি ডেকেছেন!" সত্যিই তিনি ডেকেছেন—যে ডাক আসেনি শত চাওয়ায়, সে ডাক এল অ-চাওয়া অভিমানে! আপনহারা দেবতা—তবে কি তুমি মুখ তুলে চাইলে? শোনেন শ্যামাসুন্দরী, তাই আনন্দে গর্ব্বে সুরু করেন মেয়ের দয়িতগেহে যাত্রার আয়োজন। অশ্রুর নৈবেদ্যে এমনি ক'রেই বুঝি সার্থক হয়ে ওঠে সারা জীবনের বেদনা।
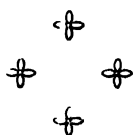
শব্দহীন সুবিস্তীর্ণ প্রান্তর লুটিয়ে পড়েছে দূরচক্রবালের কোলে—কত সুদূর-পিয়াসীর পায়ের চিহ্নকে সার্থক ক'রে জেগে আছে এই পথ, কত যুগ কে জানে!

সেদিনও সূর্য্যস্নিগ্ধ এই পথক্রান্তি অতিক্রম ক'রে দক্ষিণেশ্বরের পথে চলেছেন তীর্থচারিণী কয়েকটি প্রাচীনা পল্লী-পুরলক্ষ্মী, অন্তরে গঙ্গাস্নানের পুণ্য-অভিলাষ, আর তাঁদের সঙ্গ নিয়েছেন আমাদের বাংলা-মাটীর মা জননী সারদেশ্বরী। তিনি চলেছেন তাঁর জীবনের সপ্ততীর্থে, দেবদয়িতের চরণাশ্রয়ে—সঙ্গে শ্রীঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্রী লক্ষ্মী আর ভ্রাতুষ্পুত্র শিবরাম। আনন্দ-চঞ্চল পায়ে চার ক্রোশ পথ অতিক্রম ক'রে আরামবাগে এসে উপস্থিত তীর্থযাত্রীদল। এইখানেই

রাত্রিবাসের কথা, কিন্তু তখনও দিনের আলো বনের চূড়ে এলিয়ে পড়েনি। তাই সুদূর যাত্রীর চঞ্চল দল পথের দূরকে আনতে চায় আরো কাছে। তারা চলে এগিয়ে, আরো এগিয়ে। অন্তরতমের ব্যবধান যে নিকট হলেও দূর, তাই এইখানেই পথ-চলার বিরাম না দিয়ে, আবার যাত্রা হ'ল সুরু। কোথাও দূরে অরণ্যাশ্রয়ী ক্ষীণ পথরেখা গেছে মিলিয়ে, কোথাও উধাও-করা আকাশ-ছোঁওয়া প্রান্তর, কোথাও বন্ধ্যা মাঠের বুকে এসেছে ফসল-ফোটার লগ্ন। সব পথকে পথেই ফেলে দৃঢ়-চঞ্চল পদবিক্ষেপে এগিয়ে চলে পথিকার দল। শুধু ক্লান্ত হয়ে পড়ে দুটি অস্ফুট চরণ। একটু থেমে সকলে ফিরে চেয়ে ছাখে আদরিণী শ্যামার দুলালী পড়েছে পিছিয়ে, বার বার সে হয়ে পড়েছে ক্লান্ত। হেসে বলে তারা—"কি গো, এখন থেকেই পিছিয়ে পড়ছিস্? পারবি তো যেতে?" সারদার ক্লান্ত হাসিতে জাগে শুধু অক্ষম লজ্জার মিনতি। প্রখর দিনের তাপে ফুল্লকুসুম হয়ে যায় শুষ্ক ম্লান বিধুর। তারো চেয়ে কোমল যে চরণ, যে চরণের ব্যথা দূর করতে দেবাদিদেব পেতে দেন আপন বিশাল বক্ষ, সে চরণ ধরণীর ধুলায় থেকেও বুঝি চায়না থাকতে, ব্যথা বাজে পদে পদে। অবুঝ সঙ্গিনীদল বার বার জননীকে করে মিনতি দ্রুত চরণক্ষেপের জন্য। সাবধান ক'রে দেয়—এ পথে সন্ধ্যার অন্ধকারে আছে বিশেষ ভয়ের সম্ভাবনা। কিন্তু উপায় কি? সকলকে এগিয়ে যেতে ব'লে জননী নিজে ধীরে ধীরে শান্ত পদক্ষেপে ভয়সঙ্কুল পথের পানে চলেন এগিয়ে। সকলকে চলার পথে এগিয়ে দেওয়াই ছিল মা'র স্বভাব, কারো কোনরূপ অসুবিধার কারণ হওয়া ছিল স্বভাব-বিরুদ্ধ।

জীবনপথের যিনি দিশারী, তাঁকে পিছনে ফেলে এগিয়ে চলে সঙ্গিনীর দল। মা'র সঙ্গে রইল কেবল আরো দুটি অক্ষমা। কিন্তু লীলাময়ীর এমনি লীলা—পরবর্ত্তী কালে দর্শনধন্য ভক্তের মুখে এরূপ কথাও শোনা যায় যে, কোয়ালপাড়া হতে জয়রামবাটী চলেছেন তাঁরা মায়ের সঙ্গে সঙ্গে; বলিষ্ঠ দেহ নিয়মিত শরীরচর্চ্চায় বেশ

পুষ্ট। আর আমাদের বাংলার সজল মাটীর মেয়ে আমাদের মা—নবনীতকান্ত করুণ তনুশ্রী, চিরকোমল মাতৃমূর্ত্তি, কিন্তু আশ্চর্য্য, সেই জননীর সঙ্গে পথ চলতে হয়ে পড়েছেন বিব্রত তাঁর বীর বলিষ্ঠ সন্তান-দল; বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাঁরা দেখছেন, মা যেন চকিত চপলার তীব্র গতিতে চলেছেন এগিয়ে, আর তাঁরা প'ড়ে আছেন বহুদূরে, কোনমতেই ধরতে পারছেন না জননীর সঙ্গ। শুধু ছলনাময়ী করুণাবশে যেন স্বেচ্ছায় মাঝে মাঝে মন্থর করছেন চরণবেগ, আর আহ্বান করছেন পিছে-প'ড়ে-থাকা সন্তান-দলকে। কিন্তু তাঁরা নিকটস্থ হতে-না-হতেই আবার সেই বিদ্যুদ্‌গতি জেগে উঠেছে চরণভঙ্গে। জননী চলে যাচ্ছেন তাঁদের ধরাছোঁয়ার বাইরে। অবশেষে সকলে মিলে যখন এসে উপনীত জয়রামবাটীর মাতৃমন্দিরে, তখন বলিষ্ঠ শরীরগুলি অত্যধিক শ্রমে হয়ে পড়েছে একান্ত অচল। আব জননী অফুরান শক্তি ধারণ ক'রে সন্তানের সেবায় করেছেন আত্মনিয়োগ, ক্ষণমাত্রও বিশ্রামের অবকাশটকু না গ্রহণ ক'রে—দশপ্রহরণধারিণী মা!

রিরাট মাতৃশক্তির কাছে বার বার পৌরুষের অহঙ্কার এমনি ক'রেই হয়েছে পরাজিত, আর জননীর এই নানা ভাবের রঙ্গ দেখে মনে পড়ে শুধু ভক্তকবি রামপ্রসাদের কথা: "মায়ের ভাব কি ভেবে পরাণ গেল"।

বিদায় নিল সন্ধ্যাসবিতা, আঁধারের পায়ে পায়ে এগিয়ে এল সেই দুঃসহ দুর্গম প্রান্তর, তমিস্রায় নীরব। একটি ঝিল্লির ঝঙ্কারও যেন শোনা যায় না, দেখাও যায়না একটি জোনাকির পাখা। এই দুর্গমের পায়েই বুঝি বাজে মরণ-নূপুর, তাই সন্ধ্যার শান্ত ছায়ালী এখানে মনে হয় ভীষণ হতেও ভীষণ। তারি মাঝে শান্ত অভয় চরণে অভয়া চলেন এগিয়ে। সহসা আঁধারের বুক চিরে জেগে ওঠে, ও কার কঠিন পদধ্বনি! জাগলো কি ভয়? বক্ষ কি হ'ল হিমমন্থর? না, ধ্রুবতারার মতো দুটি চোখে জাগলো একটি স্তব্ধ নিরীক্ষা? থমকে চেয়ে দেখেন জননী সারদা—দীর্ঘ বলিষ্ঠাকৃতি এক পুরুষ।

কালো কষ্টিপাথর কুঁদে গড়া দেহ, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, হাতে বালা আর লাঠি। এগিয়ে আসছে তাঁর দিকে যেন দুরন্ত কালপুরুষ। বুঝতে আর বাকী থাকে না, এ সেই বিখ্যাত তেলোভোলার মাঠের ডাকাত ছাড়া আর কেউ নয়। একটু ভ্রুকুটি-কুটীল দৃষ্টি, তারপর ধ্বনিত হয় অসুর-কণ্ঠ : "কে তুমি?" কেঁপে ওঠে প্রান্তর—একান্ত ভয়ে স্তব্ধ, ব্যাকুল আঁধারে মুখ ডুবিয়ে বার বার ওঠে শিউরে! আর জননী? সন্ধ্যায়ত দুটি শান্ত চোখে স্থির হয়ে দাঁড়ান। সহসা একি ভাবান্তর! আঁধারের পটভূমিতে দৃশ্যের একি রূপান্তর? সারদা—না কালী! ছায়ার বুকে শ্যামমেদুর সে মুখখানির পানে চেয়ে কেন ভয়াতুর হয়ে ওঠে অসুরের হিংস্র কঠোর দৃষ্টি! ক্ষণ-বিলম্বেই অলকানন্দার অনিন্দ্য ঝঙ্কারে পাষাণ-হৃদয়ে উপল-দুয়ার যায় খুলে—তৃষিত শ্রবণে শোনে আকুল-করা ডাকে বলছেন জননী —"বাবা, আমি পথ হারিয়েছি, সঙ্গীরা আমাকে ফেলে গিয়েছে; তোমার জামাই দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির কালীবাড়িতে থাকেন, আমি তাঁর কাছে যাচ্ছি।" একটা স্তম্ভিত বিমূঢ় মুহূর্ত্ত। তারি মাঝে এসে পড়ে আর-একটি রমণী; জননীর বুঝতে বাকী থাকে না—আগন্তুকা ডাকাতেরই সহধর্ম্মিণী। ক্ষণ-বিলম্বের প্রয়োজন হয় না, সঙ্গে সঙ্গে পরশে-কনক-করা হাত দুটি দিয়ে তার হাতখানি ধরেন জড়িয়ে; স্নেহস্নিগ্ধ কণ্ঠে বলেন, "মা, আমি তোমার মেয়ে সারদা—কী বিপদেই পড়েছিলুম, যদি বাবা ও তুমি না এসে পড়তে!"

মুহূর্ত্তের মধ্যে একটা চকিত প্রলয়ে মহিষাসুর যেন লুটিয়ে পড়ে বিশ্বজননীর চরণপ্রান্তে—সে যে পেয়েছে অমৃততীর্থের সন্ধান! আকুল হয়ে ওঠে তেলোভোলার বাগদী ডাকাত-দম্পতী। তারা জানে না—কী যাদু, কী মায়া ওই কণ্ঠে! কী মোহিনী শক্তি ওই ডাকে—যে ডাকে মরুর বুকে ছুটে এল মমতার অলকানন্দা! বাৎসল্যের প্রাবল্যে তারা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হ'ল তাদের হীন-জাতির কথা, বিস্মৃত হ'ল তামসিকতায় ভরা হীন-প্রবৃত্তির স্মৃতি।

যে মহামায়ার ত্রিনয়নের আলোয় ব্রহ্মা-বিষ্ণু অচৈতন্য, তাঁর কাছে তেলোভোলার ডাকাত তো নগণ্য।

কন্যা-স্নেহমুগ্ধ জনক-জননীর মতো তারা সান্ত্বনা আর অভয়দানে তুষ্ট করে মা সারদাকে—"ভয় কি, মা, আমরা আছি, তোকে ঠিক পৌঁছে দেবো জামাইয়ের কাছে।" আর মা! তখন ছোট্ট আনন্দময়ী বালিকা—সানন্দে ডাকাত-মায়ের হাতটি ধ'রে পার হয়ে এলেন সেই আধার-ঢালা প্রান্তর।

অবস্থা অনুযায়ী সেবার হয়না ত্রুটি। তেলোভোলা গ্রামের একটি ছোট্ট দোকানে হ'ল রাত্রিবাসের ব্যবস্থা। সামান্য কিছু আহার্য্যে দেবকন্যাকে পরিতৃপ্ত ক'রে, ডাকাত-মা তার জীর্ণ বস্ত্রাঞ্চলের শয্যায় ছোট্ট শিশুকন্যার মতো ঘুম পাড়ালো সারা-যুগের ঈশ্বরীকে, আর বাগদী ডাকাত-বাবা, তার চোখ থেকে বুঝি ঘুম আজ ছুটি নিয়েছে তার সব প্রবৃত্তির সাথে। সারাটি রাত লাঠি হাতে কুটির-দ্বারে থাকে প্রহরারত, বিশ্বেশ্বরীর সে আজ প্রহরী, দেব রক্ষ যক্ষ কাউকে সে আজ দেবেনা তার কন্যার বিশ্রামের ব্যাঘাত করতে—চিরদিনের স্নেহরস-বঞ্চিত বুভুক্ষিত হৃদয়, একটি রাত্রির স্নেহের পরসাদে যেন পরিপূর্ণ ক'রে নেয় সারাজীবনের শূন্য পাত্রখানি—বুঝি বুঝতে পারে, এ অমৃত হতে বঞ্চিত থেকে তারা কতখানি ব্যর্থতা অর্জন করেছে জীবন-ভোর।

ভোরের আলোয় আকাশ রাঙা হয়ে উঠতেই আবার সুরু হয় পথ-চলা। এখন মা আমার একা নয়। সঙ্গে একটি রাত্রির পাতানো বাপ-মা—ডাকাত-মা আর ডাকাত-বাবা। সকলে চলেন তারকেশ্বরের পথে—উপরে আলো-ঝলমল নীল নভতল, নীচে শ্যামশষ্পে আচ্ছাদিত বাংলার পল্লীপ্রান্তর।

চলেছেন জননী যেন ছোট্ট লীলাচঞ্চলা বালিকা—অঙ্গে ঝ'রে পড়ছে নবীন ঊষার অরুণিমা, চরণ-চন্দ্রে পল্লীর শ্যামছন্দ।

চলেছেন ডাকাত-মা'র কোল ঘেঁষে—কালো মেঘে জড়ানো যেন একটুকরো চাঁদ!

ডাকাত-মা তুলে দিচ্ছে ক্ষেত থেকে কড়াইশুঁটি রাঙা হাত-তুদি ভ'রে, আর পরমানন্দে খেতে খেতে চলেছেন মা সারদা। দ্বিধা নেই সঙ্কোচ নেই, আনন্দময়ী মা আমার! অনেক বেলায় দেবকন্যাকে সঙ্গে নিয়ে ডাকাত-মা আর ডাকাত-বাবা এসে উপনীত হ'ল তাবকেশ্বর শিবালযে। মেয়ের শুক্‌নো মুখখানির পানে চেয়ে আকুল হয়ে ওঠে তাদের প্রাণ; ব্যস্ত হয়ে ডাকাত-মা ডাকাত-বাবাকে পাঠায় শ্রীতারকনাথের পূজা দিয়ে আসতে আর বাজার ক'বে আনতে। মায়ের দরদ যে চিরদিনই অফুরান!

দেখতে দেখতে অন্যান্য সঙ্গিনী-দলও এসে জুটলো মা'র পাশে। সকলে মিলে আনন্দ-কলরবের সঙ্গে সমাপন করলো রন্ধন। দিনমণি যখন মধ্যগগনে, জননী এবং তাঁর পার্ষদদের প্রসাদ-পর্ব্ব হ'ল তখন সমাধা। তারপর আসে বিদায়ের পালা। পাষাণ যখন গলে, ঢল হয়েই সে নামে। আকুল হয়ে কাঁদে ডাকাত-মা আর ডাকাত-বাবা। যে চোখে এতদিন শুধু জ্বলেছিল পশুত্বের নীল বিষ—দেব-দুহিতার ক্ষণিক স্পর্শে, অনুতাপ-বেদনায় স্নেহে সেথায় নেমে আসে সান্ত্বনা-হীন অশ্রুধারা। উধাও দিগন্তে কেঁদে ওঠে এক নাম-না-জানা বুনো পাখী। পল্লীর পথে আবার যাত্রা হয় সুরু, চোখের জলে বুক ভাসিয়ে। অনেক দূর পর্য্যন্ত এগিয়ে দেয় ডাকাত-মা আর ডাকাত-বাবা তাদের পথে কুড়িয়ে-পাওয়া সোনার পুতলীটিকে। ডাকাত-মা ক্ষেত থেকে কড়াইশুঁটি তুলে কন্যার অঞ্চলে দেয় বেঁধে; চোখের জল মুছে বলে—"মা সারদা, রাত্রে এগুলো খাস মুড়ি দিয়ে।" আমূল পরিবর্ত্তনে হারিয়ে গেছে তার কঠোর পাশব মূর্ত্তি, একটি রাত্রে সে যেন আর-এক মানুষ। আর ডাকাত-বাবা? কেঁদে বলে—"মা, যদি পায়ের-বোঝা স্ত্রী সঙ্গে না থাকতো, তোমাকে বাবার কাছে নিয়ে যেতুম।" অতি সহজ স্নেহের আকৃতি। তাদের আকৃতিতে ছোট্ট বালিকার মতো কাঁদেন জননী সারদা। বাংলার চিরন্তন একটি গৃহচিত্র উঠলো ফুটে ধূলিধূসরিত একটি মেঠো পথে। বার বার মা অনুরোধ জানান, দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে তাদের দর্শন-অভিলাষ পূর্ণ

ক'রে আসতে। যেন শতযুগের বাঁধন ছিঁড়ে বিদায়ের পালা হয় শেষ!

জননীর প্রাণে চির-জাগরূক হয়েই ছিল এই পথ-হারানো পথের দিনটি: "ডান দিকের রাস্তায় বাবা চ'লে গেল, আর আমি বাঁয়ের রাস্তা দিয়ে সোজা চললুম। যতদূর দেখা যায়, ফিরে ফিরে তাকায় আর কাঁদে ”

মর্ম্মচক্ষে ভেসে ওঠে একদিকে জগৎ-জননীর স্নেহ-রস-সিক্ত কান্ত-করুণ কন্যারূপ, অপরদিকে স্নেহের অমোঘ শক্তিতে দ্রবীভূত, পরাভূত পশুশক্তি। দেবশক্তির চিরবিজয় নবচণ্ডীর অভ্যুদয়ে। মাতৃকণ্ঠেই শুনি সেই কথা: "আমি তাদের বললুম, 'তোমরা আমাকে এত স্নেহ করো কেন গো?' তারা উত্তর দিলে, 'তুমি তো সাধারণ মানুষ নও, আমরা যে তোমাকে কালী-রূপে দেখলুম।' আমি বললুম, 'সেকি গো, সেকি গো, তোমরা এটা কী দেখলে?' তারা বললে, 'না মা, আমরা সত্যিই দেখলুম, আমরা পাপী ব'লে তুমি রূপ গোপন ক'রচো।' আমি বললুম, 'কি জানি, আমি তো কিছু জানি না।' "

পরে একদিন সত্যই দেখা যায়, তাদের সমস্ত হীন প্রবৃত্তি গেছে চুকে, তারা এসেছে দক্ষিণেশ্বরে, হাতে নিয়ে এসেছে মিষ্টান্ন। আর তাদের দেবকন্যা দেবজামাতা—ঠাকুর আর মা—তাদের সুমধুর যত্নে করছেন আপ্যায়িত, করছেন পরিতৃপ্ত। তাদের সমস্ত পরিচয়ের মাঝে আজ একটি নূতন পরিচয় জেগে উঠেছে রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে, জননী সারদার পাতানো ডাকাত-মা আর ডাকাত-বাবা।

ভক্তের আকুলতায় ভগবানের আসন ওঠে ট'লে, এ কথা কি শুধু পুরাণ-বুকে হারিয়ে-যাওয়া কল্পকথা—না, ভক্তপ্রাণের অটুট বিশ্বাসের কষ্টিপাথরে আজও সে নিখাদ-সোনা?

কামারপুকুর থেকে দক্ষিণেশ্বরের মাঝে মাঝে বাঁকা পথরেখার কোলে জেগে উঠেছে ছোট ছোট ছায়াচ্ছন্ন গ্রাম, সেই গ্রামের বুকে কতবার চ'লে গেছেন যুগের ঠাকুর আর জননী সারদা, তাঁদের রাঙা

পায়ের স্পর্শে রোমাঞ্চ জেগেছে সেই ছোট গ্রামগুলির বুকে—তারা হয়ে গেছে ধন্য, তাদেরও তো আছে প্রাণ! সেবার যখন কলিকাতা হতে ঘাটাল পর্য্যন্ত সুরু হলো স্টীমার-চলাচল, তখন একবার ঠাকুর আর মা পদব্রজে কামাবপুকুব-যাত্রা স্থগিত বেখে শুভাগমন করলেন স্টীমারে—জলপথে। তখন খুব সম্ভব শ্রাবণ-স্বনিত দিন। গগনে গগনে মেঘের ইসাবায গঙ্গার গৈবিক জলোচ্ছ্বাসের বুকে গা ভাসিয়ে দিয়ে ছুটে চলেছে যন্ত্রতবী দেওযানগঞ্জের অভিমুখে। বালি-দেওযানগঞ্জ, গঙ্গাব শ্যামল কূলে জাগা ছোট একটি গ্রাম—যেন সবুজের একটি ব্যাকুল মূর্চ্ছনা। সেখানকাব বাসিন্দা জনৈক ভক্ত মোদক; সাধুসন্ত, দেব-দ্বিজে তাব অগাধ বিশ্বাস আর ভক্তিতে হৃদয়খানি ভরা। সেবাব তার নবনির্ম্মিত বাসভবনখানিতে শুভ প্রবেশের আগে তার প্রাণে জাগে এক গোপন দিব্য ইচ্ছা—কোন দিব্যপুরুষ, কি কোন সাধুসন্ত এসে যদি ত্রিরাত্রি করেন বাস তার নূতন গৃহমন্দিরে, পূত চবণ-ধুলিতে ধূসরিত ক'রে তোলেন গৃহের প্রতিটি অণু-পরমাণু, তা হলে সে হবে ধন্য; সে গৃহ হবে তার নিত্যদিনের সেবাকুঞ্জ,—কিন্তু তা কি হবে? চিন্তায় কাটে মোদকের দিন। কাটে প্রতীক্ষায় ক্লান্ত শত-সহস্র প্রহর। সহসা পরম লগ্ন এসে দেখা দেয় তার ভাগ্যাকাশে। সে চেয়েছিল কোন সাধু ভক্তের সাহচর্য্য, কিন্তু এসে দেখা দেন ভক্তার্ত্তিহারী নাবায়ণ স্বয়ং, এ যেন বতনের পরিবর্ত্তে মিললো পরশরতন।

সহসা সেদিন স্তনিত মেঘমল্লারে সুরু হ'ল প্রবল ধারা-সম্পাত। ঝোড়ো হাওয়ার অস্পষ্ট ঝাপটায় দুলে ওঠে ওপারের বনরেখা। ঠিক এমনি বর্ষণ-লগ্নে দেওয়ানগঞ্জের ঘাটে এসে লাগে স্টীমার। দেবমাতুল ও মাতুলানীকে নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়ে সেবক হৃদয়রাম—তাইতো, মামা এই বৃষ্টিবাদলে এখান থেকে এতখানি পথ হেঁটে যাবেন কি ক'রে? মামাও যেন কত নিরুপায় বিষণ্ণ শিশুর অসহায় দৃষ্টিতে আকাশের পানে চেয়ে ভাবেন—সেখান থেকে পদব্রজে কেমন ক'রে যাবেন কামারপুকুর, প্রবল বৃষ্টিধারায় পথ যে হয়েছে

কর্দ্দমাবিল পিচ্ছিল। ভক্তের অশ্রু-আর্ত্তিতে, হে নারায়ণ, এমনি ক'রেই বুঝি বাধা পায় তোমার রথচক্রের গতি! কিন্তু এমন ক'রে দাঁড়িয়ে থাকা তো যায় না। আশ্রয়-সন্ধানে আকুল হয়ে ওঠে হৃদয়। অবশেষে অলকার পথিক সাথী এসে দাঁড়াল সেই ভক্ত মোদকের নবনির্ম্মিত বাসভবনের দুয়ারে। পরমানন্দে মোদক হয়ে পড়ে আত্মহারা, সাদরে বরণ ক'রে নেয় আলোর অতিথিদের। যুগের ঠাকুর আর যুগের জননী—প্রসন্নমুখে এসে দাঁড়ান তার গৃহাঙ্গনে। আনন্দের আতিশয্যে ভক্ত বুঝি পাগল হয়ে যাবে। হয়তো ভাবে, হ্যাঁ গো, এ যে কাঁচ চাইতে কাঞ্চন! ব্যস্তও হয়ে পড়ে খুব—কেমন ক'রে জানানো যায় অভ্যর্থনা। কোন্ সেবায় তুষ্ট করা যায় দেবতাকে, শত সাধের সংসারটিকে মনে হয় দীন হতেও দীন, তাঁদের সেবার অযোগ্য; তাই বুকভাঙা পরিশ্রমে সে অকুণ্ঠিত যথাসাধ্য আয়োজন করতে রাখেনা ত্রুটি।

এদিকে সমানভাবে চলে অবিরাম বৃষ্টি। তারি মাঝে হয় কীর্ত্তনের আয়োজন। দেবতা এসেছেন মন্দিরে—আনন্দ-উৎসব বিনা তাঁদের বরণ-মাঙ্গলিক পূর্ণ হবে কেমন ক'রে? সারাটি গ্রাম যেন মুখর হয়ে ওঠে।

প্রবল বৃষ্টি, তার সঙ্গে চলে অবিরাম লোক-সংঘট্ট; শ্রীমুখচ্যুত মধুক্ষরা কথামৃত পান করার নেশায় গ্রামখানি যেন ভ'রে ওঠে। আর মোদক যেন মধুমুগ্ধ মধুকর। তার আর কোন চিন্তা নেই, শুধু সেবা—দেবতাকে পরিতৃপ্ত করবার দুর্ব্বার আকাঙ্ক্ষা। একটি দিন কেটে গেল, বিনিদ্র রজনী হয় যাপন—পরদিনের সেবার পরিকল্পনায়। সে দিনটিও নিষ্ঠাভরা সেবায় কেটে গেলে, আবার নিদ্রাবিহীন চোখে জাগে শুধু সেবার স্বপ্ন। এমনি ভাবে তিন দিন ধ'রে মেঘধারা দেয় বাধা ঠাকুরের চ'লে-যাওয়ার পথে। ঠিক তিন দিন পরে সে-বৃষ্টির হয় বিরাম, ভক্তপ্রাণের যে ক'টি দিনের আশা ছিল, ঠিক সেই ক'টি দিন পরেই। বাদলধারা নীরব হ'ল, তবু খুশীর রামধনু আর রাঙলো না। বৃষ্টির বিরাম হওয়ায়, সেবক

হৃদয় ঠাকুরকে জানায়—এইবার যে যেতে হবে ফিরে। কৃপাশিসে ধন্য ক'রে ঠাকুর বিদায় চাইলেন ভক্তের কাছে। তখন মোদকের যেন চমক ভাঙে, সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে সুখস্বপ্নের রজনী হয়েছে অবসান, এসেছে বিদায়-লগ্ন। একটা মৃদু হাহাকার তনু-মনকে আচ্ছন্ন ক'রে তোলে। তবু অশ্রুজলে দিতে হয় বিদায়--তাই হোক প্রভু, সুখস্মৃতিই হোক সম্বল। বিদায়-রাঙা পথে চ'লে গেলেন ঠাকুর কামারপুকুরের দিকে; পিছনে প'ড়ে রইল তিনটি দিনের অশ্রুভরা আকৃতি। মাত্র তিনটি দিনের দেবপ্রতিষ্ঠায় যে গ্রাম তীর্থ-স্বরূপ হয়ে গেল, সে গ্রাম আজ গঙ্গার গহিন গর্ভে বিলীন, যেমনি ক'রে বিলীন হয়ে গেছে প্রেমের নদীয়া ও আরো আরো অনেক তীর্থ, মানুষের একান্ত অবহেলায় অযোগ্যতায়।

শ্রীঠাকুর ও শ্রীমা'র এই যুগল রূপের পূজায় আর-একবার ধন্য হয়েছিল এক অখ্যাতনামা ভৈরবী। ইতিহাসের দিনলিপিতে তার স্বাক্ষর না থাকলেও, ভক্তপ্রাণের শ্রুতিলিপিতে আজো তা বাস্তবের দাবি রাখে।

কোনো এক মাধবী মধ্যাহ্নে ঝরাপাতার পথ মর্ম্মরিত ক'রে ঠাকুর চলেছেন জয়রামবাটী অভিমুখে—সঙ্গে সেবক, কামার-পুকুরেরই কোন ভক্ত গ্রামবাসী। মিঠে আলোর বান ডেকেছে আকাশে, মাটীর বুকে তারি জলছবি, বেণুবীথিকা মুখর ক'রে তুলেছে বুলবুলি আর পিউপাপিয়ার দল। ঠাকুর চলেছেন একান্ত আনমনা, আলথাল বেশ—কবির ভাষায় "বসন আধ আধ নাহি শান"; বগলে কিন্তু একটি কাগজে জড়ানো বেনারসী জোড়—শ্বশুরালয়ে যাবার যোগ্য সাজই বটে। দেখতে দেখতে গাঁয়ের সীমানায় এসে দাঁড়ালেন দুজনে কোন এক তালতমালের ছায়া-আঁকা কাজলদীঘির ধারে। ভক্ত সেবকের কী মনে হ'ল—আস্তে আস্তে ঠাকুরের কাছ থেকে সেই বেনারসী জোড়টি চেয়ে নিয়ে কোনরকমে আলগোছে জড়িয়ে দিলেন দেবতার সোনার তনু আলো ক'রে। মরি মরি, কী শোভা! রূপসাগরে যে হাজার আলোর ঝিনিক ফুটলো গো!

ভক্তের চোখে-মুখে মুগ্ধ আকুলতা। মনে মনে ভাবলো—হায় ঠাকুর, এমনি সময়ে যদি পেতাম একটি ফুলের মালা আর একটুখানি শ্বেতচন্দন, তা হলে যে প্রাণ ভ'রে তোমায় সাজিয়ে নিতাম! ঠাকুরের অরুণ-অধরে চকিতে জাগে একটুকরো হাসি। সেবকটি প্রণাম জানিয়ে, ছুটে খবর দিতে যায় শ্যামার গেহে; তাঁরা এসে যোগ্য সমাদরে নিয়ে যাবেন যে তাঁদের দেবজামাতাকে। ঠিক এমনি একটি একলা-মুহূর্ত্তে কোথা হ'তে এল এক ভৈরবী সন্ন্যাসিনী, হাতে তার একগাছি যত্নে-গাঁথা বকুলমালা। আর? আর এক হাতের মুঠোয় লুকোনো ছোট্ট বাটিতে একটু শ্বেতচন্দন। বারেক থমকে দাঁড়ালো মেয়েটি, তারপর উচ্ছল কলকণ্ঠে ব'লে উঠলো—"ওগো, এই রূপই তো আমি খুঁজে মরছিলুম, আর এমনি ক'রে হেথায় লুকিয়ে ব'সে আছ!" তারপর হাসিতে চোখের জল মিশিয়ে, দুলিয়ে দিলো সেই ভ্রমর-লোভন বকুলমালা সোনার কণ্ঠ বেড়ে, আর চন্দ্রললাটে এঁকে দিলো অলকাতিলক। আহা, রূপ তো নয়—অপরূপ; সারা বিশ্বের মণিমন্দিরে যেন এ ছবি লুকিয়ে রাখার ঠাঁই মেলে না। কিন্তু চোখ ভ'রে দেখতে দেখতে হঠাৎ মাথা নেড়ে পাগলী ব'লে ওঠে—"নাঃ, এখনো হ'ল না, এখনো হ'ল না,—হ্যাঁ গা, যুগল রূপ কই? আমি যে যুগল রূপের ভিখারিনী—সে কোথায়?" বুঝতে বাকী থাকেনা ঠাকুরের; হেসে বলেন, "চ' না গো, মা, চ'—সেথায় গিয়ে দেখবি।" এদিকে ভক্ত সেবকের সঙ্গে এসে পড়েছে শ্যামার গেহের পরিজন ঠাকুরকে নিতে। সবার চোখে পুলকিত বিস্ময়—আহা, এমন নটবর বেশ দেখলে কার না মন ভোলে! সকলে মিলে আদর ক'রে নিয়ে এল দেবতাকে শ্যামার গেহে। সেথায় এসে পাগলী বলে—"কই, ব'সো দুজনে একত্তরে! আমি যে যুগল রূপ দেখবো ব'লে এসেছি।" ভক্ত মেয়ের প্রাণের ডাকে লাজুক পায়ের নিথরতা ভুলে, শ্যামার দুলালী এসে দাঁড়ায় ঠাকুরের পাশে। কিন্তু একি! ভৈরবী তো অচেনা নয়, সে যে চির-চেনা। মা যে তাকে দেখেই ব'লে ওঠেন, "একি সরমা, তুমি?

তুমি এখানে ?" পরিজনেরা অবাক ; ঠাকুরের মুখে শুধু সব-জানার অস্ফুট হাসিটি ঝিকমিক ক'রে ওঠে। ওদিকে পাগলিনীও হেসে উত্তর দেয়, "হ্যাঁ মা, আমি এবারেও এসেছি। মা গো—সে-যুগে, ত্রেতায় তো যুগল-রূপ দেখাওনি, তাই কাঙাল মন নিয়ে এবারেও ছুটে এলাম সেই রূপ দেখতে। এখন আশ মিটলো, মা,—সরমা এবার ধন্য হ'ল।" তারপর চোখ-ভরা জল আর মুখ-ভরা হাসি নিয়ে সে লুটিয়ে পড়ে যুগল-চরণে ; সে চরণে ফুল হয়ে ফুটে ওঠে তার জন্মজন্মান্তরের হৃদয়-নিঙড়ানো একমুঠো প্রণামের অঞ্জলি। স্তম্ভিত গৃহবাসী—আব, দূরে কোথায় যেন বেজে ওঠে আনন্দের রাশনচৌকি, কারা যেন ধরেছে মিলনের গৌড়সারঙ।
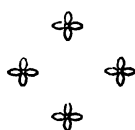
আকুল ধারায় ব'য়ে চলে দখিনাপুবের আনন্দ-মঙ্গল-লীলা, রাত্রির তাম্রলিপিতে হারানো তারার ইতিহাসের মতো দিনগুলি যেন হারিয়ে যেয়েও যায় না।

স্বামী পূর্ণানন্দ নামে কোন ভাগ্যবান সন্ন্যাসীর নিকটে পূর্ব্বেই মা গ্রহণ করেছিলেন শক্তিমন্ত্র, এবারে যুগগুরু দিলেন আপন লীলাসঙ্গিনীকে জিহ্বাগ্রে সাম্ভবী দীক্ষা। এ দীক্ষা ? না, শিবশক্তির মহাযোগতন্ত্র ? গোপন ঠাকুরের গোপন লীলাসঙ্গিনী, তাই সব-কিছুই তাঁর আরো গোপন। কত সাধনা, কত সেবা, কত বুক-ভাঙা আকুলতায় ভরা সেই ছোট্ট নহবতখানাটি হ'ল যেন এ-যুগের মাতৃসাধনার শক্তিপীঠ। লজ্জাপটে আবৃতা দেবীর স্বরূপ যেথায় রইল চির-গোপন, সবার জানার আড়ালে। মাঝে মাঝে শুধু হয় তার ক্ষণপ্রকাশ কোন কোন মরমী ভক্তের দৃষ্টিতে।

কত ছায়া-উধাও জ্যেৎস্না-রাতে দেখা যায় জননীর ধ্যানমস্থিত

যোগিনী-মূর্ত্তি—আলুলায়িত-কুন্তলা শিব-সমাহিতা শিবানী। কোন বকুল-মূরছিত নিশীথে হয় পট-পরিবর্ত্তন। অদূর অজানা হতে ভেসে-আসা মুরলীধ্বনিতে জেগে ওঠে জননীর আর-এক ভাববিলাস —বুঝি মনে পড়ে বৃন্দারণ্যের রূপাভিসার—শ্যামগুঞ্জনরতা প্রণয়-সহচরীর সাথে; তাই লীলাচঞ্চলা হেসে ওঠেন থেকে থেকে—জ্যোছনা-অনুলিপ্তা ব্রজকিশোরীর ভাবে। কখনও ঝিকিমিকি চাঁদ-ঝরা সুরধুনীর ঢেউয়ের পানে চেয়ে চেয়ে আকুল প্রার্থনায় কাটে সারাটি রাত। নিজেই বলেছেন—"রাত্রে যখন চাঁদ উঠতো, গঙ্গার ভিতর স্থির জলে তার প্রতিবিম্ব দেখে ভগবানের কাছে কেঁদে প্রার্থনা করতুম—চাঁদেও কলঙ্ক আছে, আমার মনে যেন কোন দাগ না থাকে।" তবু গোপন লীলাটুকু তো চাই, তাই কখনও হয়তো ভক্ত মেয়েকে দিয়ে শ্রীঠাকুরের চরণান্তিকে জানানো হয়েছে আকুল প্রার্থনা, ভাবের উছল প্রকাশের জন্য; যেমন হয়েছে আর-আর ভক্তদের। "যাও না, আমার হয়ে তাঁকে গিয়ে একটু বলো।" অবুঝ ভক্তকন্যা ছুটে এসেছে শ্রীঠাকুরের কাছে; বলেছে, মা বললেন, তাঁর কি কিছু হবে না!—তাঁকে একটু কৃপা করুন। শ্রবণমাত্র ঠাকুর যেন হয়ে ওঠেন ভাবনিথর, নিরুত্তর গভীর গম্ভীর ··· দেবতায় দেবতায় লীলা—রহস্যে অতলান্ত। চকিত হয়ে ওঠে ভক্ত—শ্রীঠাকুরের এই নিরুত্তর নির্ম্মমতায়; মৌন শঙ্কায় ফিরে আসে নহবতে। কিন্তু এ কী বিস্ময়! এসে ভাখে, দিব্যভাবে টলমল করছে জননীর শ্রীঅঙ্গ। কখনও আকুল হয়ে কাঁদছেন ভুবন-গলানো কান্না, কখনও দিব্য শিশুর মতো হাসছেন পরমানন্দের হাসি, সহসা দিলেন ডুব সমাধির অতল সায়রে! আনন্দ-স্তম্ভিত ভক্তকন্যা যেন আবেগে মুখর হয়ে ওঠে: "তবে যে বলো মা, আমার কিছু হয় না!"

শুধু কি নহবতের আঁধার কোণটিতেই হয়েছিল জননীর দিব্য সাধনার পরিসমাপ্তি? তা নয়, বিশ্বকল্যাণ-ব্রতে আঁধার রাতের এই সাধনা জননীর চলেছিল আজীবন। পরবর্ত্তী কালে গভীর রাতে কোন ভক্ত হয়তো সহসা নিদ্রাভঙ্গে দেখেন জননী শয্যায় শায়িতা,

কিন্তু নয়ন-দুটিতে অক্লান্ত জাগৃতি ; প্রশ্ন করেন ভক্ত—মা, আপনার কি রাত্রে ভালো ঘুম হয় না ? শান্তস্নেহে জননী দেন উত্তর, "বাবা, ঘুমোব কখন, ছেলেগুলি এসে পড়েছে ; নিজেরা তো কিছু পারে না, তাদের কাজ ক'ত্তেই সময় যায়।" অনন্ত আকাশের বুকে কখনও জেগে ওঠে ঝড়ের অবিলম্বিত তাণ্ডব, কখনও জ্যোৎস্নাপাথার ছুটে আসে তার কূলে কূলে, কত গভীর রহস্য লুকিয়ে থাকে তার মাঝে, কিন্তু আকাশ—সে তো চির-নিশ্চল। তারও চেয়ে অনন্ত-ভাবময়ী জননীর অন্তরলোকেও কত ভাবতরঙ্গ কত শক্তির খেলা, কিন্তু মূর্ত্তিমতী প্রশান্তির মতোই মা'র সমস্ত শক্তি, সমস্ত ভাব ছিল সাগরশান্ত। ভাবতরঙ্গ উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে, হতে চেয়েছে প্রকাশোন্মুখ, কিন্তু একটুখানি প্রকাশ হতে-না-হতেই জননী তাকে করেছেন প্রশমিত, করেছেন সংহত। সহজভাবে ধরা দিতে গিয়ে যেন হয়েছেন চির-অজানিতা, চির-অচিনা, চির-অনির্ব্বচনীয়া।—কখনও হয়তো দেখা গেছে চোখ চেয়েই শূন্যদৃষ্টিতে আছেন ব'সে, কোন ভক্ত হয়তো এসে দাঁড়িয়েই আছে, কিন্তু জননীর উন্মনা নয়নে দৃষ্টি পড়লে, মনে হচ্ছেনা সে-দৃষ্টিতে আছে বাইরের কোন ছায়া ; কিন্তু ক'টি অলস মুহূর্ত্ত, তারপরই সে-ভাব হয় সংবৃত। সামনে সন্তানকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, মৃদু হেসে সঙ্কোচ-ভরে উঠে দাঁড়ান। আবার সেই বাংলা-মাটীর মা! আবার কখনও কথা কইতে কইতে হয়ে পড়েছেন গভীর ভাবমগ্না। শ্রীচরণের অতি নিকটে প্রণাম ক'রেও ভক্ত আপন উপস্থিতি পারে নাই জানাতে, উন্মুখ অপলক দুটি নয়নতারা কোন বিশ্রব্ধ অসীমে উধাও কে জানে! নিশ্চল স্বর্ণপ্রতিমার মতো সে মূর্ত্তি, ভক্ত প্রাণ ভ'রে দেখেছে আর চিরদিনের মতো মুদ্রিত ক'রে রেখেছে ধ্যানের আনন্দলোকে। জননীর এই উধাও হয়ে হারিয়ে-যাওয়ার ইতিবৃত্তটি জানতেন শুধু শ্রীঠাকুর।

মনে পড়ে, কামারপুকুরের দেবভবনে একবার হয়েছে শ্রীঠাকুরের শুভ আগমন। আবার সেই মৌ-উচ্ছল বেলা। টুকরো রোদের

শিউলি-কুঁড়ি ছড়িয়ে পড়েছে ঘাসে ঘাসে, ঘুম-ঘুম মিঠে প্রহরে নিঝুম ঘুঘুর ডাকে একটা উদাস উন্মাদনা। ছুটে এসেছে পল্লীজননীর দল। সেই মধ্যদিনের আনমনা অবসরে আনন্দের হাট বসেছে চন্দ্রাতুলালকে ঘিরে। প্রেমস্মিত তুটি আঁখি মেলে ব'সে আছেন ভাববিদগ্ধ গদাধরসুন্দর। শ্রীমুখে ঝরে পড়ছে কথার অমৃত। চেয়ে আছে পল্লীজননীর দল—কারো বা চোখে অবুঝ ঔৎসুক্য, কারো মুখে তন্ময় আকূতি। বালিকা জননীও সেখানে উপস্থিত। সহসা দেখা যায়, সেই আনন্দ-মৃতুল আবেশে ছোট্ট শ্যামার তুলালী কখন হয়ে পড়েছেন নিদ্রাতুর, একটি পাশে শিউলিফুলী আঁচলখানি বিছিয়ে ; ক্লান্ত কচিমুখে অলকার স্বপ্ন। সঙ্গিনীদের অন্তরে জাগে সমবেদনার পরশ—আহা! এমন কথাগুলো শুনতে পাবে না। ঠেলে তুলে দেবার চেষ্টা ক'রে বলে—ও মা সারদা, এমন কথাগুলো তুই শুনলিনি, ঘুমিয়ে পড়লি? নিদালি-ঝরা মুখখানির পানে একটু চেয়ে হেসে ওঠেন ঠাকুর। চুপি চুপি বলেন—"না গো, ওকে তুলোনি, ও কি সাধে ঘুমিয়েছে, এসব শুনলে, ও কি এখানে থাকবে? চোঁ-চোঁ দৌড় মারবে।" নিরস্ত হয় সঙ্গিনীর দল, হেসে ওঠে নিভৃত পল্লীবিতানের সেই আনন্দ-মধ্যাহ্ন। বিশ্বের উর্দ্ধলোকে যিনি মহান্ পুরুষ—পিতৃশক্তি, তাঁর হয়তো চলে সাক্ষী-স্বরূপ হয়ে থাকা; কিন্তু যিনি মাতৃরূপিণী, তাঁর তো চলেনা সৃষ্টিকে ভুলে থাকা। তাইতো বিশ্বজননীকে মাটীর বুকে ধ'রে রাখতে বিশ্বনাথের অবাধ আকূতি।

✤

✤ ✤

✤
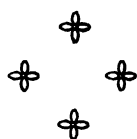
জননীর এই গোপন সাধনাকে জড়িয়ে ছিল একটি মূল সাধনা, যার মন্ত্রগুপ্তি হ'ল সেবা। নীরবে নির্ব্বিচারে নহবতের মাতৃমন্দিরে এই সাধনা অনুষ্ঠিত হয়েছিল—শ্রীঠাকুর আর তাঁর ভক্তদলের সেবা। এ সেবায় ছিলনা জীবনেব দেনা-পাওনার হিসাব, ছিলনা স্বার্থের সংঘাত। এ অকুণ্ঠ আত্মাহুতিতে ছিল শুধু অকারণে আপনাকে বিলিয়ে দেওয়ার নিবিড় আনন্দ-উন্মুখতা। নিজমুখে বলেছেন শ্রীঠাকুরের কথায়ঃ "ঠাকুরই সব। তিনিই গুরু, তিনিই ইষ্ট, তিনিই পুরুষ, তিনিই প্রকৃতি—তিনি সর্ব্বদেবময়, তিনি সর্ব্বজীবময়।"

এ তো শুধু কথার কথা ছিল না। তাই বুঝি জননীর সেবা, জননীর ব্যথা, জননীর দরদ ছিলনা সীমার বন্ধনে বাঁধা। সে সেবা, সে ব্যথা, সে দরদ ছিল অসীম—সর্ব্বভূতের জন্য সর্ব্বকালে—সর্ব্বদেশে। সর্ব্বজীবময়, সর্ব্বদেবময় ঠাকুরের জন্যে।

রাত্রির শেষ প্রহরে হ'ত মা'র নিদ্রাভঙ্গ। শুকতারার চোখে তখন ভোরের তৃষ্ণা; শয্যায় থাকা তো আর চলে না, সারা দিনের কাজ যে তখন হাতছানি দিয়ে ডাকছে। তারপর মা যে আবার চন্দ্রার গৃহলক্ষ্মী, সলজ্জ বধূর মতো আড়ালের অবগুণ্ঠনে লোকচক্ষুর অন্তরালে সাধন করতে হয় সব কাজ। তাইতো তিমির-সিক্ত রজনীর শেষ যামে সায় হয় স্নানপর্ব্ব, ছায়াসুপ্ত বকুলতলার ঘাটে। একদিন তো ঘটলো এক অঘটন। সেদিন রাত্রির অন্ধকারে একটা প্রকাণ্ড কুমীর শুয়ে ছিল বকুলতলার সিঁড়ির ওপরেই। সিঁড়ি বেয়ে নামতে গিয়ে জননীর চরণ বুঝি স্পর্শ করে ঐ কুমীরের পিঠে—ভয় পেয়ে কুমীর লাফিয়ে গিয়ে পড়লো একেবারে গঙ্গাবক্ষে; ডুব দিয়ে চলে গেল অতল তলে। অভয়ার চরণস্পর্শ করতে মকরবাহিনীর

বাহনই কি এসেছিল? না হলে, কুমীরের হিংসাবৃত্তি নিরুদ্ধ হ'ল কেমন ক'রে?

আর একদিনের কথা। সেদিনও ছায়াপ্রচ্ছন্ন শেষ নিশীথে ভেঙে গেছে মা'র ঘুম, ব্যস্ত চরণে নহবতের দুয়ার খুলে আসেন বেরিয়ে, কিন্তু আঁধার ঘাটে পা দিতেই অন্তরে কেমন যেন জেগে ওঠে একটা অজানা আতঙ্কঃ "ডাকবো নাকি কাউকে? কি জানি যদি কোন বিপদ ঘটে?" স্তব্ধ চরণে ভাবেন একটি মুহূর্ত। সহসা একি! কোথা হতে যেন এসে পড়লো বিচ্ছুরিত জ্যোতিধারা—গঙ্গার ঘাট হয়ে উঠলো আলোয় আলোময়। কোথা হতে এল এই আলো! পিছন ফিরে চেয়ে জননী দেখেন, আপন ছোট্ট শ্রীমন্দির নহবত থেকেই ভেসে আসছে ঐ আলোর তরঙ্গমালা—জ্যোতির নির্ঝরিণীর মতো। নির্ভয় স্বস্তিতে স্নান সেরে ফিরে আসেন মা সারদা। একদিন নয়, দু'দিন নয়, সেদিন থেকে প্রতিদিনই এসে পড়ে এই আলোকধারা ঠিক জননীর স্নানের সময়টিতেই। একাকী থাকতে ব্রহ্মের যে একদিন ভয় জেগেছিল, যার ফলে সৃষ্টির বিলাস, জ্ঞানের বিলাস—ভয়হারিণীর এ-ও কি সেই ভয়? যার ফলে চিৎজ্যোতির আবির্ভাব!

যাই হোক, প্রাতঃস্নান-সমাপনের সঙ্গেই সুরু হয় শ্রীঠাকুরের সেবার ব্যবস্থা, কত ভাবে কত রূপে! রান্না করা, পান সাজা, শ্রীঠাকুরের শ্রীমন্দিরখানি নিজের হাতে পরিষ্কার করা, শয্যা তৈরি-করা, শ্রীঠাকুরকে তেল-মাখানো, মাঝে মাঝে নাওয়ানো, তাঁর শ্রীচরণ-দুটির সেবা করা,—চিরদিনের ভাবে-ভোলা বালকস্বভাব ঠাকুরকে ছোট্ট ছেলেটির মতো ভুলিয়ে খাওয়ানো, আবার গরমের সময়ে বেলফুল দিয়ে খাবার জলটি রাখা হয় ঠাণ্ডা ক'রে; এমনি আরো কত ভাবে, তা কি ব'লে শেষ করা যায়? সেবায় আত্মহারা মায়ের একটিমাত্র চিন্তাই যেন অন্তরে থাকে চিরজাগ্রত—কেমন ক'রে অধরাকে রাখা যায় ধ'রে? আত্মনিবেদনে সমাহিতা মা! ব্রহ্মানন্দ কেশব যেমন বলতেন—"শ্রীঠাকুরের দেবদেহ রাখা উচিত গ্লাস-কেসে; তা না হলে, এ দেহ রাখা মুশকিল।"

❖
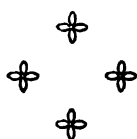
দখিনাপুরীর বাতায়নে দ্বিতীয়ার চাঁদের আসরে তখন ফুটে উঠছে এক-একটি তারা—

আসেন গৃহীভক্তের দল—রাম দত্ত, মণি মল্লিক, সুরেশ মিত্তির, সুরেন্দ্র, বলরাম। আসেন নরেন, কালী, রাখাল, শরৎ, যোগীন, লাটু—বালক যোগীর দল—সর্ব্বত্যাগী অন্তরঙ্গের দল। আসেন গোলাপ-মা, যোগীন-মা, দক্ষিণেশ্বরের উমামহেশ্বরীর দুই সখী—জয়া-বিজয়া—ঈশাবতারের মার্থা আব মেবী। আসেন হারিয়ে-যাওয়া মানসকন্যা গৌরীমা। ভক্ত-সংমিলনের এই প্রথম ক্ষণে, একটি গোপন-লীলার কথা এখনও হয়ে আছে অপ্রকাশিত। বালবিধবা নন্দিনী, যদু মল্লিকের কন্যা সেদিন সর্ব্বরিক্তা তটিনীর মতো এসে দাঁড়ালো দখিনাপুরীর দুয়ারে, লুটিয়ে দিল নিজেকে শ্রীঠাকুরের চরণে—যেন একটি তৃষ্ণার কান্না আছড়ে পড়লো অমৃত-সঙ্গমের তীরে।

শ্রীঠাকুরের দুটি চোখে উথলে ওঠে করুণার সাগর: "কে মা তুমি?" তারপর সস্নেহ উপদেশে দিব্য জীবনযাপনের নির্দ্দেশ দিয়ে বলেন, "শ্রীকৃষ্ণই জগতের স্বামী, চির-অবিনাশী। তাঁরই চরণে সমর্পণ করো মা তোমার সব কিছু, তিনিই তোমার সর্ব্বস্ব; ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকো, তোমার সব দুঃখ দূরে যাবে।"

নন্দিনী যেন পায় নূতন পথের দিশা। আনন্দের শ্বেতগঙ্গায় অবগাহন ক'রে মুছে ফেলে বিগত জীবনের বেদন-রিক্ততা—সুরু হয় তার নূতন দিনলিপি। কৃষ্ণসেবায় কৃষ্ণভজন-পূজনে ভ'রে ওঠে তার দিন, দক্ষিণেশ্বরে আসা-যাওয়াও যায় বেড়ে। জননী সারদা আর শ্রীঠাকুরের সঙ্গ দিনে দিনে তার লাগে মধুর হতে মধুরতর। শুধু তাই নয়, সাধনালব্ধ অন্তর্দৃষ্টিতে সে একদিন জানতেও পারে

শ্রীঠাকুর আর মা'র লুকিয়ে-রাখা গোপন-স্বরূপ। দুটি অচিন ফুলের সুরভি তাকে যেন পাগল ক'রে তোলে। তাই নন্দিনীর মনে এক এক দিন জাগে সাধ—লীলার মধুবনে আবার ফিরিয়ে আনতে সেদিনের মৌ-মিতালি। মধুব্রতের ঘুমন্ত মনটি তার মনে যেন গুনগুন ক'রে ওঠে।

মণি মল্লিক সে-যুগের বেশ নাম-করা ধনী ব্যক্তি। বরাহনগরে পুলকিত গঙ্গাতীরে রম্য বিশাল বাগানবাড়ি, হাজার ফুলের বর্ণালী আর প্রজাপতির পাখার নীলে যেন ইন্দ্রধনুর আলপনা এঁকেছে সারা কুঞ্জভবনটিতে। দিনের বোঝা ব'য়ে বেলা এসে দাঁড়িয়েছে দূর গগনের মাঝামাঝি, একটা অক্লান্ত নীলে চোখ রেখে মুছে নিতে চাইছে পথের ক্লান্তি। ঠিক এমনি এক আবেশ-মন্থর লগ্নে সেদিন সবার অলক্ষ্যে নন্দিনী নিয়ে আসে শ্যামার দুলালীকে তার সাধের নিকুঞ্জে। কুঞ্জভবনের দুয়ার হ'ল রুদ্ধ। তারপর সে এক অপূর্ব্ব লীলা অভিরাম—মর্ম্মপটে যেন হয়ে থাকে চির-অম্লান। নন্দিনী সাজায় যমুনাতীরের ফুল-হিন্দোল কদম-কেয়া-মল্লী-মালতীর মঞ্জরী দিয়ে—আজ যে তাদের ঝুলন-লীলা! কোথায় যেন ঘনিয়ে আসে একটুকরো শ্রাবণের মেঘ—নন্দিনীর কালো চোখে তারি আবেশ। লাজরক্তিম শ্যামার দুলালীকে আদরে-সোহাগে আকুল ক'রে সে সাজায় বৃষভানুনন্দিনী রাধা—কনক-গলা অঙ্গে নীলাম্বরীর নীল ঝলক, ফুলের গাঁথনিতে গাঁথা দীর্ঘবেণী, তনুতে তনুতে কুসুমসজ্জার রোমাঞ্চ, ললাটে কপোলে চন্দন-অনুলেখ—রূপ যেন আর ধরে না! আর নন্দিনী, সে তখন চতুরা গোপিনীর মতো সখীভাবে বিভোর, —সুশ্রী কালো মেয়ে সে। পীতবাসে চন্দনে ফুলে সে আপনি সাজে ব্রজের কিশোর। সে তখন দুঃখিনী নন্দিনী নয়, বৃন্দাবনের লীলা-আনন্দে চির-আনন্দিনী। তারপর সুরু হয় ঝুলন-খেলা। বাইরের দুয়ার বন্ধ, তাই বাইরের লোক পারেনা জানতে; ভিতরে চলে ঝুলন-লীলা। ছোট্ট ছোট্ট কন্যাকুমারীর দল, তারা সাজে কৃষ্ণরাধার সখী। তাদের নূপুরসিঞ্জিত চরণের নৃত্যছন্দে দিবসের

মধ্যলগ্নেই নেমে আসে ঝুলনের চন্দ্রিম রজনীর তন্দ্রা। ভাবে বিভোরা নন্দিনী, ভাবে বিভোরা জননী সারদা; বুঝি মনে পড়ে পুরাতন লীলার দিনগুলি—মৌন মুরলীর তানে বিস্মৃতির দিগন্ত ওঠে ভ'রে। এমনিভাবে নৃত্য-গীতে ঝুলন-দোলায় বৃন্দাবন-বিলাসে কাটে সারাটি মধ্যাহ্ন। কোথা দিয়ে যে পার হয়ে যায় সুর-শিহরিত ক'টি মুহূর্ত্ত, কেউ পারেনা জানতে। দিনলক্ষ্মীর এলিয়ে-পড়া হাসির মতো লুটিয়ে পড়ে শেষ বেলা। চমক ভাঙে নন্দিনীর, আনন্দলীলার হয় পটক্ষেপ—জননী ফিরে আসেন দখিনাপুরে।

এমনি কত গোপন লীলাই যে রয়ে গেছে কালের আড়ালে চিরপ্রচ্ছন্ন, কে জানে! ভক্তও নিত্য, ভক্তের লীলাও নিত্য। আর চিরনিত্য তার লীলার বৃন্দাবন।

* * *

আঁধারের আড়ালে চাঁদ আর চাঁদের আড়ালে আঁধার, এমনি আলোছায়ায় দিন যায় কেটে। শত তীর্থপথিকের চরণচিহ্নে পঞ্চবটীর পথ হয়ে ওঠে পত্রধূসর। দিনে দিনে ভক্তসমাগমে দেবাঙ্গন ওঠে ভ'রে। সাধন-লীলার অবসান, সুরু হয়েছে এখন ভক্তলীলা। দিক্‌দিশায় শুধু দিব্য-আনন্দের স্রোত। কখনও পঞ্চবটীর ছায়ামূলে, সুরধুনীর কূলে বিহার ক'রে ফিরছেন গদাধরসুন্দর, সঙ্গে ভক্তবৃন্দ। কখনও চিরপরিচিত খাটটিতে বসে কথামৃতের অমৃত করছেন বর্ষণ, হাসির হিল্লোলে বাঁকা চোখের নীলকমলে যেন ফেনিয়ে উঠেছে রসের সায়র, আর ভক্ত-অলি বিভোর। কখনও ভাবে গরগর, রূপে ঢরঢর—দক্ষিণেশ্বরের গোরারায় ভক্তসঙ্গে নৃত্য করছেন সংকীর্ত্তন-আনন্দে, ডুব ডুব ক'রে রূপসাগরে দিচ্ছেন ডুব। ডুব দেওয়া তো নয়, এ যেন ডুবিয়ে-দেওয়ার ছল! আবার মুহুর্মুহুঃ সমাধি। উচ্চ কীর্ত্তনরোলে আকাশ-বাতাস মুখরিত, গঙ্গাবক্ষ সুরতরঙ্গিত। তরণীবক্ষে যাত্রীর দল সবিস্ময়ে থম্‌কে ছ্যাখে, পথে যেতে পথিকের হয় পথ-ভুল। ভাবে—কে এল এই নবীন বাউল? কিন্তু 'অচিনে গাছ' দেয়না চেনা।

এদিকে চলে কীর্ত্তন-আনন্দ ঃ "চিদাকাশে হ'ল পূর্ণ প্রেমচন্দোদয় হে—।" অতনুর মোহ-মন্থর রূপে নাচেন শ্রীঠাকুর। ওদিকে নহবতের ঝাঁপের আড়ালে জেগে থাকে একটি রাঙা সন্ধ্যা—আয়ত চোখে করুণ তারার তৃষ্ণা। শত যুগের বেদনা-নিঙড়ানো, দেবতার দর্শন-পিপাসিত একটি ভীরু হৃদয়, শুধু ভাবছে—আহা, আমি যদি অমনি ভক্ত হতুম, তাহলে পারতুম ঐ লীলার সায়রে ডুব দিতে! সব কাজের ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে এমনি ক'রে দাঁড়িয়ে দেবদয়িতের কীর্ত্তন-লীলা, আনন্দলীলা দর্শন—জননীর ছিল নিত্য-কর্ম্মের মতোই। সময়ে-সময়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা হয় অতিবাহিত, কোন হুঁশ নাই—অপলক দর্শন-বিভোল দৃষ্টি মেলে দেখছেন জননী, আর তৃষ্ণার পাথার ঠেলে আনন্দপরিপূরিত হচ্ছে হৃদয়-ঘট। স্বল্পে সন্তুষ্টা চির-আনন্দময়ী মা আমার!

এদিকে নিত্য নূতন ভক্তের আগমনে জননীর কর্ম্মসমারোহ গেছে বেড়ে; কিন্তু কর্ম্মের আয়তন বাড়লেও, ঘরের আয়তন বাড়লো না। ওই ছোট্ট নহবতটির ভেতরেই চলে সারাটি দিন ভক্ত-ভগবানের সেবার বিরাট আয়োজন, শীত গ্রীষ্ম বর্ষা সর্ব্বকালে সমভাবে। এখন তো শুধু ঠাকুর নয়, প্রত্যেকটি ভক্তের রুচি-মতো আহাব যোগানো, এখন কোলের কাছে ভিড়ে এসেছে বিশ্বের ছেলে আর তাদের যার যা পেটে সয়—সে হিসাব তো মাকেই রাখতে হয়। আবার আছে—যার যেমন আবদার। তাই অন্নপূর্ণার দুই হাতে বুঝি আর কুলায় না—আলাদা আলাদা ক'রে পান-সাজা, আরো কত কি! কোনদিন দেখা যায়—ঝলমল মুখে ছুটে এসেছেন দেবতা ঃ "ওগো, আমার নরেন এসেছে, তুমি নরেনকে দেখেছ?" শুচিস্মিত দুটি আঁখি তুলে মৃদু হেসে জননী বলেন, "দেখেছি। আহা, কী চোখ!—যেন আরসি; দেখলে চোখ জুড়োয়।" তার আগেই আর একদিন শ্রীঠাকুর বলেছিলেন, "নরেনকে ত্মাখোনি! আহা, এমন চোখ তুমি আর কখনও ত্মাখোনি। মূর্ত্তিমান্ জ্ঞান, ও যে সপ্তর্ষিমণ্ডল থেকে এসেছে!" তারপর একদিন কাজের ছল

ক'রে শ্রীঠাকুর পাঠিয়ে দেন তাঁর আদরের ছেলেকে নহবতে। নহবতের দুয়ার হতে কী যেন চেয়ে নিয়ে যায় নরেন। আর বিশ্বজননীও আড়ালের আঁধার হতে চিনে নেন তাঁর চিহ্নিত সন্তানকে। সেই নরেনের জন্য তৈরি হয় ডাল-রুটি। কত মমতায়, কত স্নেহে মা আদর ক'রে পাঠিয়ে দেন ঠাকুরের ঘরে। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করেন, "কি রে, রান্না খেলি—কেমন ?" দুরন্ত ছেলে চতুর হাসি হেসে বলে, "হয়েছে ভালোই। যেন রুগীর পথ্য।" ব্যস্ত হয়ে ঠাকুর জানান জননীকে, "কেমন ডাল-রুটি দিয়েছ ? আমার নরেনের যে পছন্দ হয়নি।" মায়ের বুক ওঠে দুলে। নরেনের জন্য সেদিন হয় বিশেষ ব্যবস্থা, মোটা-মোটা রুটি আর পুরু ডাল। নরেনেরও সুতৃপ্ত মুখে ফুটে ওঠে মা'র আদরের একটু হাসি।... এসেছেন ভক্ত রাম দত্ত। গাড়ি থেকে নেমেই, আর কোন কথা নাই, ব'লে ওঠেন—"আজ ছোলার ডাল আর রুটি খাব।" ঝাঁপের ওপার হতে সে ক্ষুধা-আর্ত্তিরও যোগ্য উত্তর আসে—থালা-ভরা মায়ের হাতের প্রসাদ-মমতা। এরপর আছে মানসপুত্র রাখাল। তার তো সোহাগ-কাড়া আবদারের ইতি নাই। তার প্রিয় আহার খিচুড়ি। ছেলের আবদারে মা'র বুকের গরব যেন উথল খেয়ে ওঠে ; মিষ্টি হেসে চড়িয়ে দেন খিচুড়ি, আর আদুরে রাখালরাজা ঠাকুরের কোলের কাছে ব'সে যথাসময়ে করেন তার সদ্ব্যবহার।

এরপরও আছে। ছায়া-নামা শেষ বেলার ক্ষণিক অবসরে হয়তো একটু আনমনে বসেছেন জননী—সিক্ত কেশের মালা বিস্রস্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে পিঠে, ভাঙা রোদের রাঙা টুকরো সেথায় খেলছে ছায়া-ছোঁয়া খেলা। এসে দাঁড়ালেন দেবদয়িত, হাতে একরাশ পাট ; বলেন, "আমার ছেলেদের খাবার রাখব—বিঁড়ে পাকিয়ে শিকে ক'রে দাও।" তবু মুখে নাই ক্লান্তির ছায়া, অনলস আনন্দে মা তুলে নিলেন সেই পাটের রাশ নীরব মৌন মুখে। শ্রীঠাকুরের ক্ষণিক সঙ্গও যে তাঁর কাছে পরম দান, তাতেই তো পরম আনন্দ! শুধু কি রন্ধনগৃহ, জননীর শয়ন-মন্দিরও যে ঐ নহবতটিই। তার

ওপর কোন ভক্তমেয়ের যদি রাত্রিবাস ঘ'টে যায় কোন কারণে, তাহলে তো কথাই নাই; ঐ নহবতেই তারও শয়নের ব্যবস্থা করতে হয় মাকেই।

মনে পড়ে প্রথমদিকে শ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব—

ফাগুন এসে হানা দিয়েছে মাধবীর দুয়ারে, অলির চোখেও লেগেছে মধু-মরীচিকা। ওপারে বনের মাথায় কৃষ্ণচূড়ার আগুন, আর এপারে সুরধুনীর ঢেউয়ে রাঙামেঘের জলছবি। দখিনাপুরীতে যেন আজ 'আনন্দের ধুলট'। তরুণ ভক্তদের দল এসেছে, আর এসেছেন যাঁরা প্রাচীন। শ্রীঠাকুরকে পীতবাসে আর চন্দনের মালায় সাজিয়ে দেন ভক্তেরা। সে নওল নটবররূপে সারা জীবনের পথ-চাওয়া হয় শেষ। ভক্তদের আনন্দের সীমা থাকে না, বুঝি মনেই পড়েনা এই অন্তরতম বিনা, অন্তর আর কোথাও বাঁধা পড়েছে কিনা। সুরু হয় কীর্ত্তন। চৌদ্দমাদল হয়তো বাজে না, ভক্ত প্রাণের হাজার করতালে তবু সে-কীর্ত্তন হয় অনুপম, সুরসুন্দরকে ঘিরে সুরের আরতি। আর জননী সারদা? শ্রীরামকৃষ্ণময়ী মা আমার—আজ একা যেন দশ হাতে আয়োজন ক'রে চলেছেন—আনন্দ-শ্রান্ত ছেলেদের মুখে যে প্রসাদ তুলে দিতে হবে। অক্লান্ত মমতায় ভ'রে তুলেছেন অন্নস্থালী, আর এক এক বার হয়তো রাঙা মুখখানা আঁচলে মুছে, ছিন্ন ঝাঁপে চোখ রেখে দেখছেন, দেবদয়িতের কীর্ত্তন শীলন আর আনন্দের হাসিতে হচ্ছে অশ্রুর মিতালি। কেটে যায় দিন—দেখতে দেখতে আসে নীলাম্বরী সন্ধ্যা—আসে রাত্রি।

উৎসবান্তে যোগীন-মা'র মতো কোন কোন ভক্ত মেয়ে র'য়ে গেছেন দেখে, ঠাকুর বলেন, "এত রাত্রে তোরা আর কোথা যাবি? আর শোবার জায়গাই বা কোথা হবে? আমার ঘরের পাশে ঐ ঘেরা বারান্দায় শুয়ে থাক্।" যোগীন-মা যান মা'র কাছে ঠাকুরের কথা জানাতে, গিয়ে দেখেন তাঁদের উপস্থিতি জানাবার আগেই সর্ব্বান্তর্য্যামী জননী ছোট্ট ঘরখানিকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার ক'রে শয্যা প্রস্তুত ক'রে রেখেছেন ভক্তমেয়ের জন্য। জননীর দেহঘট থাকতো

নহবতের কর্ম্মমন্দিরে, কিন্তু মন থাকতো শ্রীঠাকুরের চরণান্তিকে। বহুবার তার প্রমাণ গেছে পাওয়া। শ্রীঠাকুরের বালক-সেবক সারদাপ্রসন্ন, পরবর্ত্তী কালে যিনি স্বামী ত্রিগুণাতীত নামে পরিচিত, তাঁর ঠাকুরের সঙ্গ লাভ করা ছিল দুরূহ ব্যাপার। অভিভাবকের কড়া নজর এড়িয়ে তিনি পালিয়ে আসতেন চুপি চুপি দক্ষিণেশ্বরে : সেবকের অবস্থা বুঝে, ঠাকুরও প্রায়ই তাঁকে শেয়ারের গাড়ির ভাড়াটি দিয়ে দিতেন।

একদিন জানিনা কী ভেবে ঠাকুর তাঁকে বললেন, "যা, নহবত থেকে চারটি পয়সা চেয়ে নিয়ে যা।" হয়তো চাইলেন সন্তানকে জগজ্জননীর স্বরূপের কিছু আভাস বুঝিয়ে দিতে। যেমন নরেনকে পাঠিয়েছিলেন ভবতারিণীর মন্দিরে সাংসারিক সচ্ছলতার প্রার্থনা জানাতে। দুই মা-ই যে এক। সারদাপ্রসন্ন শ্রীঠাকুরের আদেশ শিরোধার্য্য ক'রে নহবতে এসে দেখেন, তিনি আসবার পূর্ব্বেই ঘরের বাইরে ঠিক চারিটি পয়সা রাখা আছে। বালক বিস্ময়াভিভূত হয়ে তুলে নেয়, আর বুঝি প্রণাম জানায় অন্তরের অন্তর লুটিয়ে দিয়ে, অলখচারিণী অন্তর্য্যামিনী জননীর উদ্দেশে। আবার কোন-দিন হয়তো শ্রীঠাকুর খেতে বলেছেন তাঁর আদরের নরেনকে, কিন্তু সেই কথা নহবতের অন্নপূর্ণা-স্বরূপিণীকে জানাতে এসে দেখেন, তাঁর বলবার পূর্ব্বে আপন হাতেই দেবী তাঁর সন্তানতুল্য নরেনের প্রিয় খাদ্য ছোলার-ডাল উনুনে বসিয়ে দিয়ে ময়দা ঠাসছেন ব্যস্তভাবে রুটির জন্যে। এই অন্তরে অন্তরে গোপন-লীলা যে কত প্রকাশিত হয়েছে, তখন বুঝেও যেন কেউ বোঝেনি।

জননীর নিজের কথাঃ "আমি নহবতে হাজার কাজ নিয়ে থাকলেও, আমার মন সর্ব্বদা ঠাকুরের কাছে প'ড়ে থাকতো, অত দূর থেকে খুব আস্তে আস্তে বললেও, আমি সব কথা শুনতে পেতুম।" ব্রজলীলাতেও শুনি, ব্রজময়ীর ভাব-তনু থাকতো দয়িত-চরণ-সঙ্গা।

অপরূপ ঠাকুরের লীলা, অপরূপা তাঁর লীলাময়ী লীলাসঙ্গিনী!

কখনও দেখি, অত নিকটে থেকেও হয়তো সুদীর্ঘ দুটি মাস গেছে

কেটে, জননী পান নাই শ্রীঠাকুরের ক্ষণিক দর্শন ; আকাশ ফেলেছে ক্লান্ত নিশ্বাস, ধরণীর চোখে বেদন-ব্যর্থতা! অদর্শন-ব্যথা কি বাজেনি জননীর প্রাণে? পলকহারা কি হয়নি পথ-চাওয়া? তবু দেখি, দয়িত-সুখতৃপ্তা জননী মনকে দিচ্ছেন সান্ত্বনাঃ "মন, তুই এমন-কী ভাগ্য করেছিস, যে রোজ তাঁর দর্শন পাবি?" 'কাছে থেকে দূর রচা'র বিরহসাধনাতেই কি প্রেমের পরীক্ষা? তাই এমন দিনও আসে যেদিন আপন হাতে ভোগের থালাটি সাজিয়ে নিয়ে আসা আর কাছে ব'সে খাওয়ানোর আনন্দটুকুও গেল উঠে, এবং সে কাজটি তুলে দিতে হ'ল কন্যাশোকসন্তপ্তা ভক্তমেয়ে গোলাপ-মা'র হাতে, তাকে শান্ত করতে শ্রীঠাকুরেরই ইচ্ছায়। অন্তরতমের এই নির্ম্মমতায় ক্ষণিক অভিমান এসে আঘাত করে, বুক নিঙড়ে কখন আনমনে যেন এসে পড়ে ছু'ফোঁটা জল, সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের অন্তর যেন ব'লে ওঠে—না না, অধীর হলে তো চলবে না, এ যে জীবনদেবতার ইচ্ছা, তার সুখেই তো এই জীবনের সব সুখ গেছে জড়িয়ে, তবে কেন এই বেদনা? শরণাগতিতে নিবিড় হয়ে এল ক্ষণবিচ্ছেদ-বেদনা, নতশিরে মেনে নিলেন জননী পরমদেবতার কল্যাণময়ী ইচ্ছা—আত্মনিবেদনে উন্মুখ।

বিরহেরই তীর আবার তীরেই বিরহ—দৃষ্টির বিভ্রমেই শুধু ক'রে তোলে সুদূর। গৌরীমা একদিন রহস-চপলতায় বলেন, "ছুটিতে দূরে দূরে থাকলে কি হবে, ভাব ছিল কিন্তু খুব।" নহবতের নিরালা কোণ থেকে সেদিন আসে সংবাদ, মা'র মাথা ধরেছে। উদ্বেগে আকুল হয়ে ওঠেন শ্রীঠাকুরঃ "হ্যাঁরে রামলেলো, মাথা ধরলো কেন রে?" একটুখানি কথা, তবু মন বলে। দূরের দরদীর এ যে বুকভাঙা দরদ!

জননীর দেবদেহের সুস্থতা-অসুস্থতা, সুবিধা-অসুবিধার প্রতি এমনিই ছিল শ্রীঠাকুরের ব্যাকুল দৃষ্টি। দূরে থেকেও অদূর কিনা! প্রচ্ছায়শীতল পঞ্চবটী-গহিনে ধ্যানমগ্ন লাটু, সহসা সেদিন শোনে শ্রীঠাকুরের মৃদুমন্দ ভর্ৎসনা-বাণীঃ "যার ধ্যান কচ্ছিস, সে নহবতে রুটি বেলছে।" ত্রস্তে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় লাটু। ঠাকুর তাকে

ডেকে নিয়ে আসেন নহবতে। কর্ম্মনিরতা জননীকে আহ্বান ক'রে বলেন, "এ ছেলেটি বেশ, তোমার ময়দা ঠেসে দেবে।" দ্বিধামাত্র না ক'রে, সেই দিন থেকেই লাটু লেগে যায় জননীর প্রয়োজনীয় ফাইফরমাস খাটতে। সেদিনের বালক-সেবক লাটু তাই পরবর্ত্তী কালেও মা'র কাছে চিরদিনের বালক লাটু, একান্ত স্নেহের পাত্র, আর লাটু-মহারাজেব কাছেও 'মা আমার দক্ষিণাপাণি দক্ষিণেশ্বরী মা'।

কখনও দেখা যায়, মা'র দেওয়া কাপড়খানি সযত্নে বাঁধছেন মাথায়, কখনও মা'র আঙিনায় বসে প্রসাদ খেতে খেতে চোখ-দুটি উঠেছে জলে ভ'রে, আবার কখনও বা মা'র হাত থেকে প্রসাদ নিয়ে চপল শিশুর মতো পালাচ্ছেন ছুটে। আর, চপল ছেলের কাণ্ড দেখে মায়ের খিলখিল ক'রে হাসি আর কলকণ্ঠের কাকলিতে সারা ঘর উঠেছে ভ'রে।
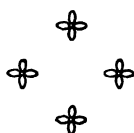
সারাটা দিন ঝাঁপ-ঘেরা নহবতের একাকীর মাঝে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিথর চরণে দাঁড়িয়ে কীর্ত্তনলীলা-দর্শনের ফলে কোমল দেবতনু যে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি? চরণ-দুটিও হয়ে পড়ে অপটু। দু'-একদিনের কথা তো নয়, কত ফুলদোলের বৈশাখ, শ্রাবণের নিরালা মেঘ, ফাগুনের পলাশ-বেলা—উঁকি দিয়ে দেখে গেছে সে-প্রতীক্ষার তিতিক্ষা, নীরবে চুপিসাড়ে। রহস্যচ্ছলে বলেন শ্রীঠাকুর, "বুনো পাখী খাঁচায় থাকলে বেতে যায়, মাঝে মাঝে বেড়াবে।" সরম-শিহরে রেঙে ওঠে শ্যামা মেয়ের মুখ: "তবে তো তিনি জেনেছেন"। তবু লুকোচুরির শেষ কই? তারপর থেকে সুরু হ'ল খাঁচার পাখীর একটুখানি মুক্তি-পাওয়া। মধ্যদিনের

রৌদ্রক্লান্ত বেলায় সারা দখিনাপুর যখন বিশ্রাম-মগ্ন, পাখীর চোখে নীড়ের ক্লান্তি—তখন জননী মন্দিরের খিড়কি দিয়ে যেতেন বাইরে, দেউলের একটু দূরে, যেখানে থাকে জনৈকা পাঁড়ে-গিন্নী, সেথায়। আবার বেলা ঘুমিয়ে পড়ার আগেই ফিরে আসতেন চুপি চুপি। বলা বাহুল্য, এসব ব্যবস্থাই হয়েছিল শ্রীঠাকুরের নির্দ্দেশক্রমে। কিন্তু এটুকু ভ্রমণ শরীরের পক্ষে হয়তো যথেষ্ট হয় না, তাই আজীবন দেহে সেই ব্যাধির কষ্ট সহ্য করেছিলেন নীরবে।

খেয়ালী দিনের ভাঙা-গড়ায় আকাশে ওঠে নূতন সূর্য্য, নূতন চাঁদ। জীবনের স্বপ্নসাধে আসে অভিনবত্ব। সেদিন দখিনাপুরের দেব-দেউলে এক স্মরণীয় মুহূর্ত্ত। সে ভোরের চোখে একটি অচঞ্চল পেলবতা। মনে পড়ে ধূপ-সুরভিত নহবত, জননী পূজায় সমাসীন, সম্মুখে শ্রীঠাকুরের মূর্ত্তি পূজার বেদীতে বিরাজিত, আর পুষ্প-নৈবেদ্যে দীপের আলো-ঝরা রিক্ত পূজার আয়োজন। সহসা ধ্যানস্তম্ভিত আরাধিতার নয়ন-সম্মুখে এসে দর্শন দেন দেহধারী আরাধ্য—স্বয়ং শ্রীঠাকুর। শ্রীমুখ জ্যোতিরঞ্জিত, নয়নে অপার্থিব তন্ময়তা। "কি গো, কি হচ্ছে?"—বলতে বলতে সম্মুখস্থিত আপন শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে পূজার উপচার-দর্শনে হয়ে ওঠেন ভাব-গরগর। মৃদু সচকিত নয়নে নিরীক্ষণ করেন দেবী—দেবতার মহাভাব-প্রসন্নতা। সহসা ঠাকুর পুষ্পথালি হতে তুলে নেন একটি ফুল, আর আপন শ্রীপটমূর্ত্তিতে অর্ঘ্য দিয়ে বলেন, "এই মূর্ত্তি একদিন ঘরে ঘরে পূজিত হবে।" কোথায় যেন বেজে ওঠে আনন্দ-মঙ্গলশঙ্খ; বিশ্বের আর এক প্রান্তের সাগর যেন ঝাঁপিয়ে পড়ে এপারের গঙ্গায়। পুলকধন্যা জননীর অঙ্গে জাগে দিব্য রোমাঞ্চ, সস্মিতসজল নয়নে থাকেন চেয়ে সেই অমৃতমন্থ মুখের পানে। ছোট্ট ঘরখানি যেন থমথম ক'রে ওঠে। আর, সারা বিশ্ব? সে যেন ভাখে কলম্বাসের মতো এক নূতন-জাগা কূল ···

আবার, দূর থেকে দিব্য রঙ্গটুকুও করতে ছাড়তেন না রঙ্গময় ঠাকুর, অপ্রাকৃত আনন্দের মাধ্যমেই যেন চলতো উভয়ের দেবলীলা।

শ্রীঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্রী—'রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের লক্ষ্মীদিদি' ছিলেন গোপীভাবে ভাবিতা কৃষ্ণপ্রেম-সাধনায় উৎসর্গিতা; তাঁর সারাটি মনপ্রাণ, সারাটি জীবন জননী সারদার সঙ্গলাভে ধন্যা। তখন মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে এসে তিনিও থাকতেন নহবতে। কোনদিন শ্রীঠাকুরের শ্রীমন্দিরে এসেছে হয়তো ভবতারিণীর প্রসাদ—শ্রীঠাকুর আনন্দে বালক-ভক্তদের মাঝে করছেন বিতরণ, যেন নীলাচল-তীর্থে গৌরের মঙ্গললীলা; আনন্দবাজারে মহাপ্রসাদ-পর্ব্বে আনন্দের ধুম লেগে গেছে লীলাপার্ষদদের মাঝে। সেদিনের নিত্যানন্দ-গদাধর-শ্রীবাসাদির মতো আজও সকলে পরমানন্দে পাচ্ছে শ্রীঠাকুরের দেওয়া প্রসাদ। বহুক্ষণ সেই অমৃত-কাড়াকাড়ির পরে হয়তো দেখা গেল কিছু প্রসাদ রয়েছে অবশিষ্ট, মধুর রঙ্গভরা হাস্যে ঠাকুর রামলালের হাতে সেটুকু তুলে দিয়ে বললেন—"যা, খাঁচায় শুকসারী আছে, দিয়ে আয়গে।" রামলালও হাসতে হাসতে চলে যান। ভক্তরা কেউ কেউ এ-ওর মুখ চায়, কিন্তু দুজনের মাঝে কী রঙ্গ হয়ে গেল, কেউ বোঝে না। হয়তো ভাবে, সত্যিই বুঝি খাঁচায় আছে বাঁধা দুটি পাখী—শুক আর সারী। শুধু এই রঙ্গলীলার সমঝদার রামলাল, সেগুলি নিয়ে যান যথাস্থানে—যেখানে গোপন নহবতে সেবার সাধনায় ডুবে আছেন জননী আর তাঁর সুখসঙ্গিনী লক্ষ্মীদিদি। হয়তো হেসে বলে রামলাল—"শুকসারীর জন্য খুড়োমশায় প্রসাদ পাঠিয়েছেন গো।" ঠাকুর প্রসাদ পাঠিয়েছেন—লক্ষ্মীদিদি হাসেন মায়ের পানে চেয়ে, আর সে হাসিতে মেশে মা'র মুখের একটুকরো হাসি; আনন্দ আর ধরে না! এমনি আরো কত যে রঙ্গ হ'ত, তার সংবাদ কে-ই বা রাখে?

আর একটি দিনের কথা। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীঠাকুরের চরণে পরম আকূতি নিয়ে উপস্থিত হয়েছে জনৈকা রমণী। তার সংসারে নাকি দেখা দিয়েছে এক বিষম পারিবারিক অশান্তি, যার সুরাহা করা সকলের পক্ষে হয়ে দাঁড়িয়েছে অসম্ভব।

গোপন নটবরের স্বরূপ প্রচ্ছন্ন থাকলেও, পরমহংস বা

ভক্ত-সাধু-খ্যাতি ছড়িয়েছিল তখনকার কলকাতার ঘরে ঘরে। সেই সরল বিশ্বাস নিয়ে রমণী নতশিরে অশ্রুসরস চক্ষে জানায় মিনতি শ্রীঠাকুরকে। জানায়—তার সংসারে শান্তি ফিরিয়ে আনবার ক্ষমতা একমাত্র শ্রীঠাকুরেরই আছে। অন্যসময়ে এইরূপ বাসনা-পরিতৃপ্তির আশায় কেউ কাছে এলে, ঠাকুর তাকে সর্ব্বতোভাবে পরিহার ক'রেই চলতেন। কখনও দূর থেকে দেখেই, দিতেন মন্দিরদ্বার রুদ্ধ ক'রে। কখনও তাদের কাছে অচেনা হয়ে, তাদের দিতেন গোলকধাঁধায় ফেলে। পরে তো কতবার বলেছেন, "রাজার কাছে গিয়ে কি কেউ লাউকুমড়ো ভিক্ষে করে?" কিন্তু বিশ্বাসের গভীরতায় কখনও কখনও তাঁব আসন ট'লে উঠেছে, ক্ষুদ্র বাসনার পরিপূর্ত্তিও তাঁকে করতে হয়েছে। কিন্তু সে ক্বচিৎ-কখনও।

যাই হোক, সেদিনের রমণীর আর্ত্ত অটল সরল বিশ্বাসকে ঠাকুর দূরে ঠেলে দিতে পারলেন না। রঙ্গভরা অথচ অভয় হাসি হেসে বললেন, নহবতের দিকে আঙুল দেখিয়ে, "ঐখানে যাও গো, ঐখানে যাও—ঐখানে যিনি আছেন তিনিই পারবেন তোমার অশান্তি দূর করতে। মন্ত্র বলো, ঔষধ বলো, সবই তাঁর ভালোরকম জানা আছে। আমি কিছুই জানি না। তিনি আমারও উপরে কিনা।"

সরলা রমণী ছুটে আসে নহবতে। জননী তখন পূজায় সমাসীন। আকুল-করা দুটি চরণতলে লুটিয়ে প'ড়ে আকূতি জানায় আর্ত্ত ভক্তটি, "এ অশান্তি থেকে উদ্ধার করো, মা!" তারপর জানায় শ্রীঠাকুরের কথা:

"পূরিবে বাসনা গিয়া জানাও তাঁহারে—
আমি কিবা জানি, তিনি আমার উপরে।"

—শ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি

হেসে ওঠেন রঙ্গময়ী, বুঝতে আর বাকী থাকেনা রঙ্গময়ের লীলাটুকু। রঙ্গভরে তিনিও দেন উত্তর: "কে বললো? ঔষধতন্ত্র তিনিই। আমি কী জানি বলো? শীগ্‌গির যাও, তাঁকেই ধরো গিয়ে।"

স্ত্রী-ভক্তটির তখন বিভ্রান্ত অবস্থা। শ্রীঠাকুর যেমন বলেছেন, কর্ম্মহীন কেরানীর ব্যাকুল অবস্থার কথা, অথবা স্বাতীনক্ষত্রের জলের আশায় পুত্রগতপ্রাণা জননীর ব্যাকুলতার কথা। ভক্তটি আবার ছুটে আসে, শ্রীঠাকুরের চরণান্তিকে মিনতিভরে জানায় মা'র কথাঃ তিনি ঔষধজ্ঞ, আমি কিছু নাহি জানি। তারপর আবার সেই কান্না, আর প্রার্থনা ঔষধের জন্য। তার খুবই বিশ্বাস যে, ঠাকুর ওষুধ দিলেই তার পারিবারিক অশান্তি হবে অপসারিত। কিন্তু লীলায় হার মানতে শ্রীঠাকুর আজ নারাজ। শ্রীমুখে সহানুভূতির সান্ত্বনা, আর আলো-উচ্ছল দুটি চোখে রঙ্গের উশ্রী; বলেন, নানা ভাবে বুঝিয়ে সেই একই কথাঃ "এখানে বাছা তুমি বৃথাই আসছ, আমি তো কই কিছুই জানি না; সেইখানেই যাও। আমি বলছি, ওখানে গেলে তোমার আশা মিটবেই মিটবে। তবে বড় চাপা, সহজে ধরা দিতে তাই চাইছে না।"

বুক-ভরা আকুলতা নিয়ে আবার ছুটে আসে আর্ত্ত মেয়েটি জননীর চরণতলে, বারবার জানায় প্রার্থনা। বিশ্বার্ত্তিহারিণীর হৃদয় বুঝি এবার ওঠে দুলে, করুণায় আর্দ্র হয়ে তার হাতে তুলে দেন সদ্য-পূজিত একটি প্রসাদী বিল্বপত্র; বলেন, "এই নিয়ে যাও, বাসনা তোমার পূর্ণ হবে।"

ছোট্ট একটুখানি রঙ্গভরা দেবলীলা, কিন্তু মনে হয়, এ যেন যুগলীলার ভবিতব্য। অদূর ভবিষ্যতে জননীর কোলে ভিড়ে আসবে বিশ্বের আর্ত্ত সন্তান-দল, তাদের শত হাসিকান্নার মণি-পান্নায় শত আবদারের আবেদনে জড়িয়ে থাকবে মা'র করুণ অধরের স্মিতরুচির হাসি, আর সারা যুগের বুকে ছড়িয়ে পড়বে এক নূতন আশার আলো। আর, ঠাকুর চিরদিনের মায়ের দুলাল আপনভোলা শিশু—যেমন বলতেন—"আমি খাই-দাই আর থাকি, আর সব মা জানেন।" এর প্রমাণ তো শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা-জীবনবেদের পাতায় পাতায়।

ভাগ্যের রূঢ় পরিহাসে বিপর্য্যস্তা আর-এক বিধবা রমণী—একটি মাত্র পুত্র তার গৌর, তাই লোকে ডাকে 'গৌরের মা'। পুত্রস্নেহে গর্ব্বিতা অনাথার ঐটুকুতেই আনন্দ। কিন্তু হায়, নির্ম্মম নিয়তি যেন পারেনা সইতে। তাই একদিন কাঙালিনী মায়ের বুক আরো কাঙাল ক'রে একমাত্র নয়ননিধি সেই গৌর হ'ল নিরুদ্দেশ, কোথায় কে জানে! দারিদ্র্যের কালো আকাশে ঢাকা জীবনে একটি ধ্রুবতারাই যার সম্বল, অকালের মরু-আখিকে সে কি দেয়না অভিশাপ?

"হায় দেবতা, একি করলে!"—শোকে দুঃখে উন্মাদ হয়ে ওঠে গৌরের মা। সায়কবিদ্ধা হরিণীব মতো ছুটে আসে দক্ষিণেশ্বরে; লুটিয়ে পড়ে শ্রীঠাকুরের চরণমূলেঃ "শান্তি দাও, প্রভু, শান্তি দাও! আর এ জ্বালা সইতে পারি না।" পুত্রহারা গোতমীর সাগর-ভাঙা কান্নায় যাঁর করুণা-ঘন নয়নে ঘনিয়েছিল বেদনার সন্ধ্যা, অপুত্রক সতীলক্ষ্মীর অশ্রু-নিবেদনে যাঁর শ্রীমুখে উচ্চারিত হয়েছিল মমতার প্রসাদবাণী, শাস্ত্র-নিষেধের অবরোধ অতিক্রম ক'রে আজ তাঁরি করুণা যেন মুখর হয়ে ওঠে। মিনতি-মধুর কণ্ঠে শ্রীঠাকুর বলেন জননীকে, "তুমি ওকে একটু দয়া করো—বড় দুঃখী।" ব্যথিয়ে ওঠে মায়ের বুক—ভাগ্যের পদদলিতা লাঞ্ছিতা দুহিতার পানে চেয়ে, হয়তো চোখে আসে জল। মুখে বলেন, "তোমার দয়া যে পেয়েছে, তার আবার ভাবনা কী?"

বকুলতলার কোল ঘেঁষে ছলছল করে সুরধুনী। আকাশের একটি কোণে ফুটে ওঠে দিনান্তের সঙ্গিহীন তারা। সারাদিনের ঝর্ঝর-মর্ম্মর ক্লান্ত হয়ে পড়ে ঘুমিয়ে, আর বিপর্য্যস্ত জীবনের সব ঝড়ও যেন হয়ে যায় নিথর নীরব। শ্রীঠাকুরের পানে চেয়ে কী যেন খুঁজে পায় পুত্রশোকাতুরা—ধীরে ধীরে চোখের জল মুছে, নেয় বিদায়। তারপর দিন-রাত্রির কতকগুলো বিষাদ-খিন্ন প্রহর পার হয়ে একদিন সে এসে দাঁড়ায় আনন্দ-নির্ঝরের উপকূলে। স্নিগ্ধ নয়নে দেখেন মা—পুত্রশোকাতুরার আজ কোন দুঃখই নেই, তার

হারানো গৌরের অসীম শূন্যতাকে ভরিয়ে তুলেছেন এ-যুগের গোরারায়—স্বয়ং শ্রীঠাকুর।

* * *

পুবের আবছা আঁধারে শুকতারা দেয় ডুব। সূর্য্য ওঠে, পঞ্চবটীর শাখায় পাখীরা ধরে বৈতালিক—আর দখিনাপুরীর অমৃতসরে নিত্য জমে স্নানার্থীদের ভিড়। সেদিন নহবতের দুয়ারে কেঁদে পড়েন এমনি এক স্নানার্থিনী, নাম শতদলবাসিনী। জীবনের নেমি-পথে দীর্ঘ একাদশ বর্ষ পার হয়ে পূর্ণ হতে চলেছে দ্বাদশ বর্ষ। এই সুদীর্ঘকাল স্বামী তার নিরুদ্দেশ। একটানা ঝড়ের বিলম্বিত লয়ে তার জীবন হয়ে পড়েছে ছন্নছাড়া, তবু সে হয়নি আশাহত। দেশ হতে দেশান্তরে সে করেছে অনুসন্ধান; কিন্তু আর বুঝি চরম ব্যর্থতাকে সে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না, জীবনের দুই কূল ভেঙে আসবে নিরাশার তুফান। মা'র চরণ-দুটি আঁকড়ে ধ'রে সে বলে—"বলো মা, বলো, আমার স্বামীকে কি আর আমি ফিরে পাব না?" আর যে মাত্র কয়দিন, তারপরই তো পূর্ণ হবে দ্বাদশ বর্ষ। শাস্ত্রবিধি অনুসারে সে-কাল পূর্ণ হলেই যে তাকে কুশপুত্তল দাহ ক'রে গ্রহণ করতে হবে রিক্তার বেশ। অভাগিনী আর ভাবতে পারে না—হু-হু ক'রে কেঁদে ওঠে; বলে—"মা, মৃত্যু দাও আমার এ-বেশ ছাড়ার আগে!"

সহসা জননীর দুটি দীর্ঘ আঁখি হয়ে ওঠে করুণা-মন্থর, যেখানে শোকের চিহ্নমাত্র নেই, শোকার্ত্তার জীবনের কোন কূলে যেন দেখেছেন আলোর দিশা; স্নিগ্ধকণ্ঠে বলেন, "কেঁদোনি মা, এমনও তো শোনা যায়, লোকে যার জন্য সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়ায় তা কাছেই রয়েছে। যেদিন যেটি হবার, ঠিক হবে। তুমি সতীসাধ্বী, একান্তমনে নারায়ণকে ডাকো, তাঁর কৃপা হলে এয়োতির বেশ ঘুচবে না।" যে দীপের আলো নিঃশেষ হয়ে এসেছিল, একটি কল্যাণ-হাতের স্পর্শে আবার সে সঞ্চয় করে আলো। দেখতে-দেখতে আঁধারও যায় কেটে, মায়ের আশীর্ব্বাণী হয় সফল। দ্বাদশ

বর্ষ পূর্ণ হবার পূর্ব্বেই শতদলবাসিনী ফিরে পায় তার নিরুদ্দিষ্ট স্বামীকে। তবু চেনার জগৎ চিনলোনা তাঁকে, চিনলেন শুধু বিশ্বের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

তাই যেদিন কিছু বেশী পরিমাণে ফলমিষ্টি ভক্তদের মাঝে বিলিয়ে দেওয়ার জন্য শ্রীঠাকুব নিজে করেছেন বিরক্তি-প্রকাশঃ "ওরা যে তপস্যা করতে এসেছে, ওদের লোভ বাড়িয়ে দিয়ে লাভ কি?"—মাতৃত্বে আঘাত লাগে মহামাতৃকার, অভিমানভরে সামনে থেকে চলে যান। সেদিনও শুনি ঠাকুরের কণ্ঠে কী আকূতি-অশ্রুল দুটি কথা—অনুতাপে রামলালকে বলছেন, "ওরে, তোর খুড়ীকে গিয়ে শান্ত কর্। ও রাগলে, আমার সব নষ্ট হয়ে যাবে।" এই ভয় একদিন জেগেছিল ভোলা-মহেশেরও প্রাণে, উমামহেশ্বরীর রুষ্টরূপে, যার প্রকাশ দশমহাবিদ্যায়,—একমাত্র মহাকালই যে জানেন মহাকালীর মর্ম্ম।

স্মৃতির তীর্থে জেগে ওঠে একটি-দুটি টুকরো কথা। দক্ষিণেশ্বর পঞ্চবটীর বনতীর্থে দু'কূল ছাপিয়ে নেমেছে সন্ধ্যার অন্ধকার। লক্ষ তারার প্রদীপ জ্বালিয়ে আরতির ধূপছায়া লগ্ন হ'ল শেষ। ভোগপাত্র হাতে এসেছেন মা সারদা শ্রীঠাকুরের মন্দিরে। ঠাকুর তখন ক্লান্ত-ভাবে শয্যায় শায়িত, চক্ষু-দুটি মুদ্রিত। ভাবলেন বুঝি লক্ষ্মী এসেছে খাবার দিতে। ব'লে উঠলেন, "দরজাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে যাস্।"

—"হ্যাঁ, বন্ধ ক'ল্লুম।"

একি! এ কার কণ্ঠ? চম্‌কে উঠলেন ঠাকুর—ত্রস্তে বসলেন উঠে। সঙ্কোচভরে বললেন, "আহা, তুমি! আমি ভেবেছিলুম লক্ষ্মী। তা কিছু মনে কোরোনি।" সলাজ মৃদুকণ্ঠে বলেন মা—"না না, মনে ক'রবো আবার কি?"

তবু মন মানে না। পরদিন শুকতারা-দীপ নিভতেই ছুটে আসেন দেবতা নহবতের দুয়ারে—এতখানি অনুশোচনা যে, সারাটি রাত পারেননি নিদ্রা যেতে। সেই কথা তুলে বললেন, "দ্যাখো গো, কাল সারারাত আমার ঘুম হয়নি ভেবে-ভেবে, কেন এমন রুক্ষ কথা

ব'লে ফেললুম!" জননীর দু'চোখে জাগে অনির্ব্বচনীয় প্রসাদ-প্রশান্তি—শিশুর মতো সান্ত্বনায় তৃপ্ত করেন আপনভোলা দেবতাকে। যেখানে যত আপন, মর্য্যাদার আসনখানিও সেখানে তত আকাশ-ছোঁয়া। তাই যুগের যিনি অধিকর্ত্তা, মাতৃভাবের সাধনায় পূজারী-রূপে 'আপনি আচরি' বিশ্বকে দিয়ে গেলেন এই শিক্ষা—বিশ্বেশ্বরীর প্রতিচ্ছবি-জ্ঞানে সমগ্র মাতৃজাতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধার শিক্ষা। আর মা—তাঁর কল্যাণ-হস্তে তুলে ধরলেন এই অমৃত-বর্ত্তিকারই আর-এক দিক—হিন্দু রমণীর চরম আদর্শ, সংসার-বর্ত্মে যে আদর্শ তাকে পৌঁছে দেবে একটি বিশেষ লক্ষ্যে।

সেদিন কোন বকুল-থরথর বেলায় নহবতের ধূলিধূসর অলিন্দে এসে দাঁড়ালো এক রূপদর্পিতা কুলবধূ। তার মদগর্বিত ভঙ্গীতে যেন বিষাদ-মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে আলো-সুন্দর প্রভাতটি। পলাশের রূপের আগুন যে সব বসন্তকে সার্থক ক'রে তুলতে পারে না, রমণীটি বোধ হয় তা জানতো না; হয়তো কোনমতে তীর্থধূলির স্পর্শ হতে নিজেকে বাঁচিয়ে সে জানালো প্রণাম জননীর চরণতলে। মা'র চোখে একটু তখন আনমনা বিস্ময়। প্রশ্নের প্রয়োজন হয় না, কুলবধূ নিঃসঙ্কোচেই জানালো তার মনের একটি হীন অভিসন্ধির কথা—সে নাকি তার স্বামীকে পরিত্যাগ করতে চায়। সচকিত হয়ে ওঠেন শিব-সীমন্তিনী: "কী তার অপরাধ?" স্তম্ভিত বিস্ময়ে শোনেন, অপরাধ তার অমার্জ্জনীয়—অন্ততঃ ঐ রমণীটির কাছে—সে যে কুৎসিত, কেন সে তার মতো রূপগর্ব্বিতাকে পত্নীত্বে বরণ ক'রলো—যদিও তার ঐশ্বর্য্যের নাই অভাব, আন্তর সৌন্দর্য্যেরও সে অধিকারী, তবু বাইরে তো সে কুরূপ। রমণীর কথার স্তরে স্তরে যেন ঘৃণা-বিদ্বেষের কালি ছিটকে পড়ে—বিস্ময়ে পাষাণ-নিথর হয়ে যান জননী। পতি-শিবনিন্দায় যিনি বিসর্জ্জন দিয়েছিলেন নিজের জীবন, সেই সতীলক্ষ্মীর সামনে তাঁরই ভারতের একজন হিন্দু রমণীর এই হীন বাচালতা! লজ্জায় মুখ ঢাকে আকাশ, নীরব হয়ে যায় বনের বাতাস। রমণীটি ভেবেছিল, শ্রীঠাকুর আর জননীর এই দুরে

থাকার রহস্যটিও বুঝি তারি পরিকল্পনার অনুরূপ, অতএব তার এই উদ্দেশ্যে মিলবেই মিলবে মা'র পূর্ণ সমর্থন। কিন্তু একি! সহসা বজ্রময়ী বিদ্যুতের মতো গর্জ্জে ওঠেন জননী ; বলেন, "জিভ দিয়ে উচ্চারণ কোরোনা অমন কথা! যে শোনে তারও পাপ। স্বামী আর নারায়ণ এক। কুরূপ ব'লে স্বামীকেই যদি ত্যাগ করবে, তবে আর রইলো কী?" ক্ষোভে লজ্জায় বিমূঢ় হতবাক্ রমণী। চকিতে মা'রও ফিরে আসে সহজ শান্ত রূপ, ধীর গম্ভীর কণ্ঠে বলেন, "যাও, স্বামীর কাছে গিয়ে ক্ষমা চাও, তার পায়ে ফেলে দাও এই রূপ,—ক'দিন থাকে রূপ? একটা কঠিন ব্যামো হলে, কোথায় ভেসে যাবে! মেয়েমানুষের রূপের বড়াই করতে নেই।" হতাশায় ভয়ে জীবন্মৃতা রমণী স্খলিতপদে নেয় বিদায়। তারপর কেটে গেছে আরো ক'টি দিন। অশোকে কিংশুকে প্রজাপতির সভা গেছে ভেঙে, ঝরা পাতার বিজয়ায় বনে বনে তখন চৈতালিক ঔদাস্য। আবার একদিন নহবতের দুয়ারে পড়ে কার শীর্ণছায়া? কে যেন ডাকে: "মা!" চমকিত বিস্ময়ে মুখ তুলে চান দেবী ; চরণধুলায় লুটিয়ে পড়ে—রোগ-মসীঢালা একটি জীর্ণ তনু, যেন বসন্ত-উৎসব-শেষের বাসবদত্তা—চৈত্রের ঝড় এসে কেড়ে নিয়ে গেছে তার দেহের সব রূপলাবণ্য, সমস্ত অঙ্গে মারী-গুটিকার নিষ্ঠুর ক্ষতচিহ্ন। সেই রূপদর্পিতা না? কোথায় গেল তার সেই রূপ! সব বোঝেন মা, চেয়ে দেখেন করুণা-গলিত নয়নে—রমণী ধুলায় লুটিয়ে কাঁদছে: "আমায় ক্ষমা করো, মা, আশীর্ব্বাদ করো!" রুদ্ধকণ্ঠ, অশ্রুজলে ভেসে যাচ্ছে মুখ, তবু ভালো লাগছে অনুতাপের অগ্নিস্নানে পরিশুদ্ধ এই তনু, মনে হয় যেন কত পবিত্র ; টেনে নেন জননী তাঁর অনুতাপক্লিষ্টা কন্যাকে। আর কোন চিন্তা নেই—হাসিমুখে মা করেন আশীর্ব্বাদ: "পতিসেবায় সুখী হও, মা!"

* * *

আত্মায় আত্মায় কী অপূর্ব্ব সংমিলন! ইচ্ছা, স্বাতন্ত্র্য, ব্যক্তিত্ব—যা নিয়ে গ'ড়ে ওঠে পরস্পরের মধ্যে এক অলঙ্ঘ্য ব্যবধান, জননী

সারদা তার কোনটাই যেন রাখেননি আপন বলতে—রামকৃষ্ণ-গতপ্রাণা শ্রীরামকৃষ্ণের মাঝেই পেয়েছিলেন আপনার পরিপূর্ণতা। ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ কিনা? এই অভেদ সত্তাই যে সমস্ত ভেদের উৎস।

ভক্ত লছমীনারায়ণ দানশীল মারোয়াড়ী, শ্রীঠাকুরের সেবার জন্য দিতে এসেছেন দশহাজার টাকা। মায়ের একান্ত শিশু ঠাকুর, মা ছাড়া আর তো কিছু জানেন না! বিষয়ের ছায়া দেখেও যে ভয়ে হন আকুল। ভক্ত মথুরের ইচ্ছা সত্ত্বেও, মথুরের সেবা ব্যতীত ভবিষ্যতের জন্য কোন আর্থিক সাহায্যই যিনি গ্রহণ করেননি, তিনি মারোয়াড়ীদের বাসনা-দিগ্ধ কোন দ্রব্যই গ্রহণ করতেন না, অর্থ তো দূরের কথা। তাই লছমীর শত আকূতি সত্ত্বেও ঠাকুর তাঁর অর্থ করলেন প্রত্যাখ্যান। চতুর ভক্ত তখন শ্রীশ্রীমার নামে ঐ অর্থ লিখে দিতে হন দৃঢ়সঙ্কল্প: "বেশ, তবে মাতাজীর নামে থাক্ ঐ টাকা।" লীলাময়ের লীলার রাজ্য—এইবার স্বয়ং মহামায়াকেও দিতে হয় মায়ারাজ্যের পরীক্ষা। শ্রীঠাকুর ডেকে বলেন মাকে—"ওগো, এই টাকা দিতে চাচ্ছে, তা আমি তো নিতে পারবো না—এখন তোমার নামে দিতে চাচ্ছে। তুমি নাওনা কেন? কী বলো?" শ্রবণমাত্র উত্তর দিতে জননীর বিন্দুমাত্র হয়না বিলম্ব। বলেন, এবং দৃঢ়কণ্ঠেই বলেন, "তা কেমন ক'রে হবে? আমি নিলে ঐ টাকা যে তোমারই নেওয়া হবে। কারণ আমি রাখলে, তোমার সেবা ও অন্যান্য প্রয়োজনে ব্যয় না ক'রে তো থাকতে পারবো না। ও-টাকা কিছুতেই নেওয়া হবে না।" এর পরের কথাগুলি শ্রীঠাকুরের মুখে: "ওর ঐ কথা শুনে আমি হাঁপ ফেলে বাঁচি।"

দিন তো নয়, যেন ঝ'রে-যাওয়া মধুপর্ণের দল, সুরভির অজস্রতায় দিগন্ত দখিনা আকুল। শ্রীঠাকুরের দেউলতলে একদিকে যেমন ভক্ত ছেলেদের মিলন-মেলা, এদিকে নহবতের মধুচক্রেও এসে জুটেছেন কানু-অনুরাগিণী গৌরীমা, লক্ষীদিদি; মা'র সখী গোলাপ-মা, যোগীন-মা, গোপাল-অন্ত-প্রাণ—গোপালের মা। ভক্ত-

ভগবানের নিত্য সেবার মাঝে মাঝে—হরি-কথালাপে কৃষ্ণ-রহস-লীলা-কীর্ত্তনে, কখনও মৃদু হাস্য-পরিহাসে নহবতের নিভৃত কোণটি হয়ে ওঠে কূজন-কুহরিত। কোনদিন শোনা যায় লক্ষ্মীদিদি ধরেছেন সুর, বাউল-ছাঁদে ধরা-চূড়া বেঁধে নিজেই সেজেছেন কৃষ্ণসখা বলরাম। শ্রীমুখের নকল শিঙাধ্বনি আসল শিঙাধ্বনিকেও বুঝি হার মানায়! হেসে লুটিয়ে পড়েন শ্রোতৃবৃন্দ। শ্রীমুখে আঁচল ঝেঁপে হাসেন মা। আবার লক্ষ্মীদিদি কখনও সাজছেন নানা রত্নাভরণ আর রঙীন বসনে বৃন্দাদূতী। রূপের-ডালি মেয়ে—কাঁচা সোনার বরণে যে-রূপই ধরবে, সে রূপই হবে অপরূপ। আয়ত চোখের ভঙ্গীতে ফুটে উঠেছে বিদগ্ধ মাধবকে প্রণয়-শাসনে বিদ্ধ করার আবেদন—উধাও মনও গেছে নাগালের বাইরে; গাইছেন—"একবার ব্রজে চলো ব্রজেশ্বর দিনেক দু'য়ের মতো"। দেখতে দেখতে তমাল-কালো স্মৃতির আঁধারে মন পথ হারিয়ে ফেলে, দু'চোখে নামে বিরহের শ্রাবণ-ধারা—জননীর চোখেও যমুনা তখন দু'কূল হারিয়ে নীল। ভাব-শিহরিত কারো অঙ্গ, কেউ ধ্যান-আবেশে মৌন-পলক; দিব্য অনুভূতির যেন বন্যা ব'য়ে যায়!

এমনি হেলাফেলায় আসে কত নীল নিদালির রাত, কত সোনালী ফুলের ভোর—পাতায় পাতায় নাচে হরিয়ালের দল। এমনি কোনদিনে হয়তো বলরাম-ভবন হতে এসেছেন গৌরীমা, লুটিয়ে দিয়েছেন একটি প্রাণঢালা প্রণাম মা'র চরণে—কিন্তু মায়ের মুখখানির পানে চাইতে গিয়ে দেখেন, যেন উদাস একটি বাদলছায়া গুমরে উঠছে দুটি আঁখির পাতায়; কী যেন বোঝেন গৌরীমা; একাধারে তনয়া আর সখী কিনা, মনে-মনে একটু হেসে চলে আসেন শ্রীঠাকুরের দেউলে, ভক্তদের বলেন ঘর খালি ক'রে দিতে। তারপর চুপি চুপি ফিরে এসে মাকে হাত ধ'রে নিয়ে চলেন দেবদর্শনে। এদিকে মায়ের সলাজ আপত্তিঃ "ভক্তদের অমনভাবে সরিয়ে দিলে, কী মনে করবে তারা; তা ছাড়া সবাই দেখতে পাবে যে।" গৌরীমার কণ্ঠে তখন বৃন্দার নির্ভীক উক্তিঃ "তোমার অত ভয়

কিসের বলো তো, মা? তোমায় দেখতে-পাওয়া লোকেদের ভাগ্যে থাকা চাই।" অবশেষে বৃন্দার দূতিয়ালিই হ'ল জয়ী, আর তাতে কৃষ্ণ-অনুরাগিণীরই কি লাভ কম? এ দূতিয়ালিটুকু ছাড়া তার প্রাণ বাঁচে কই!

* * *

দিনলক্ষ্মীর হাতে সৌভাগ্য-কঙ্কণ-দুটি কি কখনো জাগিয়ে তোলে সিদ্ধ বালাদের ঈর্ষ্যা? উমার বক্ষের চন্দ্রহারের ভাগ মাগে কি তারাবধূ রোহিণী? সেদিন গৌরীমা নহবতের দুয়ার ধ'রে দাঁড়াতেই দুটি অতৃপ্ত নয়ন যেন তড়িতাহত হয়ে আসে ফিরে: "একি মা, তোমার অঙ্গের আভরণ কী হ'ল?" জননীর পবিত্র মুখখানিতে উৎকীর্ণ হয়ে ওঠে একটি শ্বেতপদ্মের প্রসন্নতা; বলেন—"লোকে বলে, উনি পরমহংস সাধু—ওঁর সহধর্ম্মিণীর কি শোভা পায় অলঙ্কারের অহঙ্কার?" ব্যথায় ম্লান হয়ে ওঠে গৌরীমা'র মুখ; দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মনে-মনে বলেন, "তাই এয়োতির চিহ্ন ঐ বালা-দুটো রেখে, আর-সব খুলে ফেলেছ? কিন্তু আমি সইবোনা তোমার এই যোগিনী-বেশ।" তারপর তীব্র ভর্ৎসনায় মুখর হয়ে ওঠে মা'র ভৈরবী মেয়ে: "এতবড় স্পর্দ্ধা, স্বয়ং জগন্মাতাকে দিতে আসে কিনা উপদেশ—ত্যাগের উপদেশ!" মাকে বলেন, "মা, তুমি বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী, তোমায় কি এমন বেশ ধরতে আছে? তোমার গায়ে সোনা থাকলে, তাতে জগতেরই কল্যাণ।" নিটোল ক্ষমার একটি অনবদ্য শ্রী তখনও জড়ানো মা'র মুখে। মানসদুহিতা যেন আর পারেন না সইতে এই নীরব প্রশান্তি, মা'র হাতের কাজ কেড়ে নিয়ে এসে বসেন ঐ ঘরেরই একটি কোণে, সঙ্গে লীলা-রসিকা যোগীন-মা। মা'র দুই সঙ্গিনী মিলে আভরণহীন তনুশ্রীতে তুলে দেন অপরূপ বাস, হেলায় খুলে-রাখা হেম-আভরণে সাজিয়ে দেন বরতনু। প্রাণ লুটিয়ে প্রণাম করেন গৌরীমা, তারপর মা'র আলো-ঝলমল মুখখানির পানে চেয়ে বলেন, "কেমন সুন্দর মানিয়েছে বলো তো? চলো একবার কর্ত্তাকে দর্শন দেবে।" মা'র অঙ্গের অণুতে অণুতে

তখন নেমেছে রাঙা নদীর লজ্জা—সাগর-সন্ধানে আকুল, অথচ সরমে ব্যাকুল—কোনমতেই যাবেন না এই বেশে শ্রীঠাকুরের সামনে; দু'হাতে বাধা দিয়ে বলেন—"না, না।" এদিকে হার মানার মেয়েও নয় গৌরদাসী—তার যে কথা, সেই কাজ। "সে হবে না, চলো একবার কর্ত্তাকে দেখা দিয়ে আসবে।" অবশেষে একরকম জোর ক'রেই টেনে নিয়ে হাজির করেন মাকে শ্রীঠাকুরের সামনে, আর মুখে ফুটে ওঠে দূতীয়ালির বিজয়-হাসি। মেহুর দিগন্তের চোখে যে স্বপ্ন, সে বুঝি কথাই ক'য়েছিল সেদিন।

* * *

আনন্দের মধুকুঞ্জে দু'-একটি ঝরা পাতার রিক্ততাও সুগম করে মধু-চোরের মিলন-পথকে। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন-কাব্যেও ষষ্টিপরা বৃদ্ধা গোপালের মা মাঝে মাঝে গ্রহণ করেন সেই ভূমিকা। তাঁরও প্রাণে জাগায় বেদনা তাঁর আদরের বধূর আঁধার-বিধুর মুখখানি। প্রদীপের কালিতে কালো হোক গৃহকোণ, ক্ষতি নাই, কিন্তু ঐ আলোয়-ফোটা চোখের কোণে যেন না জমে ব্যথার কালি। তাই যখনি দেখেন শ্রীঠাকুরের শ্রীমন্দির হয়েছে ভক্তশূন্য, একমুখ হাসি নিয়ে ছুটে আসেন: "অ বৌমা, শিগ্যির চলো, গোপালকে একটু দেখা দিয়ে এসো।" অবশ্য নিজের স্বার্থও যে নাই, তা নয়। তাই মা'র আনমনা আপত্তিটুকু গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেন না; বলেন, "তোমাদের একত্তর না দেখতে পেলে, মনে আমার তৃপ্তি হয় না; ওঠো শিগ্যির, চলো, আবার কে কখন এসে পড়বে।" বৃদ্ধার অনুরাগ-গভীরতায় সাড়া দিতে হয় মাকে—পূর্ণ করতে হয় মনোবাসনা। যুগল-মিলন-মাধুরীই যে ব্রজ-ভাবসাধনার শেষ সাধ্য। এমনি ঘটে কত দিন!

আবার কোনদিন আসেন গোপালের মা। সে আর-এক রূপ। অস্তমিত গোধূলির নিষ্প্রভ চোখে এমন শিশু-সূর্য্যের আলো বড়-একটা দেখা যায় না। শ্রীঠাকুরের পার্ষদ স্বামী সারদানন্দজীও এ-কথা অকপটেই করেছেন স্বীকার। শ্রীঠাকুরকে দর্শন ক'রে এসে

দাঁড়ান গোপালের মা নহবতে, আর নববধূর লজ্জায় তাঁর আদেশের অপেক্ষায় নতমুখী মা সারদা মেনে নেন তাঁর স্নেহের কর্তৃত্ব। গোপালের কী পছন্দ-অপছন্দ সবই যে জানেন গোপালের মা, তাই মাতৃত্বের স্নেহমধুর দাবিতে দাঁড়িয়ে থেকে রাঁধিয়ে নেন বধূকে দিয়ে। কোনদিন বা নিজেই ধরেন হাতা-বেড়ি। ছেলেমানুষ মেয়ে, অত পারবে কেন? কিন্তু আসল কাজে ভুল নেই। পাকা রাঁধুনীর মতো গুছিয়ে রাঁধেন সব-কিছু, তারপর কমলার রাঙা হাতখানি স্পর্শ করিয়ে নেন তাঁর রন্ধন-সামগ্রীতে। তারপর থরে থরে ভোগের উপচার সাজিয়ে এনে, ধ'রে দেন গোপালের সামনে। আনন্দ-সার্থক সেই মধ্যবেলার দখিনাপুর আজও যেন কল্পধ্যানের পরম পাথেয়। মা নন্দরানীর মতোই বিগলিত আকূতি নিয়ে বসেছেন গোপালের মা—তালবৃন্তের বীজনে জুড়িয়ে দিচ্ছেন গোপালের অঙ্গ, সামনে ভোগ-উপচার। বৃদ্ধার কণ্ঠে হারিয়ে-যাওয়া ব্রজের স্নেহাতুর মিনতিঃ "অ গোপাল, তুমি ভালো ক'রে খাও, বাবা, ছোলা দিয়ে শাকভাজা হয়েছে—এটি আগে খাও; বড়ি দিয়ে ঝোল আর-একটু খাও, বাবা! সজনে-ডাঁটার চচ্চড়িটা কেমন হয়েছে? এ রান্না স্বয়ং লক্ষ্মী রেঁধেছেন—অমর্ত্ত হয়েছে রান্না, তুমি পেট ভ'রে খাও, গোপাল।" শ্রীঠাকুরের মুখে চতুর হাসি তখন কৌতুকে উচ্ছল; শ্রীনাথ সেন, রামদাস বগ্যি সব হাতের রান্নাই যে তাঁর চেনা, বুঝতে বাকী থাকেনা বৃদ্ধার সরল ভক্তির চাতুরিটুকু; হেসে বলেন, "সবই যদি তোমার বৌমার রান্না, তুমি কবে রেঁধে খাওয়াবে বলো তো?" গোপাল-মা'র সে কী অপ্রতিভ লজ্জা ঢাকবার ব্যর্থ প্রচেষ্টা। তবু বৌমার পরাজয় মেনে নিতে বৃদ্ধা একেবারেই নারাজ; বলেন, "বাবা, বৌমার রান্নার কাছে কি আমার রান্না! আমার বৌমার হাত-ধোয়ানী জলেই রান্না চমৎকার হয়।" আর কি কথা চলে? হার-মানা হাসিতে সারা মুখ রাঙিয়ে নিরস্ত হন ঠাকুর, আর গোপালের মৌন স্বীকৃতিতে বিজয়িনী গোপালের মা'র তখন বিজয়-উল্লাস—বুকের খুশী যেন উপছে পড়ে মুখে।

জীবন-পরিক্রমার শেষ লগ্নে পৌঁছেও, বৃদ্ধা ভুলতে পারেননি পিছনের স্বপ্নসার্থক দিনগুলি ; বলেছেন, "তখন আমার মনে আর কোন উদ্দেশ্য—কোন প্রার্থনা ছিল না, গোপালের আর বৌমার চাঁদমুখ দেখবো, এই ছিল আশা। রকমারি রান্না ক'রে গোপালকে খাওয়াবো, বৌমাকে খাওয়াবো—এই ছিল প্রার্থনা। তা পূর্ণ হলেই প্রাণ ভ'রে যেত।"

* * *

শিখা-সন্ধানী প্রজাপতির পাখা পুড়ে যায় যে-দীপের হাত-ছানিতে, তারি মাটীর বুকে কেন ছড়িয়ে থাকে একটুকরো ছায়া ? সে অপরাধ কি মাটীর—না দীপের ? মানসদুহিতা গৌরীমা, তাঁর জননী গিরিবালা দেবী। জন্মসাধিকা ছিলেন এই গৃহ-তপস্বিনী। কন্যার মুক্তিপথের প্রথম দুয়ার তিনিই দিয়েছিলেন উন্মুক্ত ক'রে। অথচ মহামায়ার কী লীলা ! অচিন দেবতার অচিন লীলাসঙ্গিনী তাঁর কাছে তখনও একান্তই অচিন—গিরিবালা কোনমতেই যেতে চান না মাকে দর্শন করতে ; এই ব্যাপারে কন্যার অভিমান-ভরা অনুযোগে তিনি বলেন, "তোদের এখনও অভাব আছে, আমার অন্তরে ত্রিপুরেশ্বরী বিরাজ করছেন—আমার আর কারো প্রয়োজন নেই।" অপরাজেয় বেদনায় আহত উত্তর আসে কন্যার কাছ হতে : "ভাগ্যে থাকলে তো হবে।" কালের নির্ম্মম দাবি নিয়ে দিন যায় চ'লে—মাতা বা কন্যা কারোর দিনচক্রে ঘটেনা কোন পরিবর্ত্তন, মাঝে মাঝে শুধু কথার বোঝাপড়া, এই পর্য্যন্ত। অবশেষে একদিন কন্যার দিব্য অভীপ্সাই হ'ল জয়ী। কোন এক শান্ত সুরভির দিনে গিরিবালা দেবী এলেন দক্ষিণেশ্বরে, সঙ্গে গৌরীমা। উদ্দেশ্য—মাতৃদর্শন। নহবতের দুয়ারে প্রবেশের মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আত্মসচেতন সাধিকা ; কোন দুর্ব্বলতাই তাঁর মনকে করেনি অবনমিত। জননী সারদা তখন গৃহে ছিলেন কর্ম্মরতা—সহসা অপরিচিত পদশব্দে চোখ তুলে চেয়ে দেখেন, দুয়ারে দাঁড়িয়ে এক প্রাচীনার সঙ্গে গৌরীমা। সঙ্গে গৌরীমাকে দেখেই হোক, আর চেনা-জনের চোখের চাওয়াতেই

হোক, চিনতে বাকী থাকেনা মা'র—আগন্তুকা কে। সঙ্গে সঙ্গে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন তাঁর চির-অভ্যস্ত আদর-ঢালা হাসিতে। কিন্তু একি হ'ল! গিরিবালা দেবীর দৃষ্টি অমন নির্ব্বাক অথিরতায় কেন ভরা? মনে উঠেছে আলোর ঝড়, চোখে বুঝি তারি আভাস। নীরব গৌরীমা; কেটে যায় কয়েকটি অস্পষ্ট মুহূর্ত্ত। সহসা আর্ত্ত কান্নায় ভেঙে পড়েন গিরিবালা: "অ্যাঁ মা, তুমি—তুমি এ যে আমার সেই!" তারপর অশ্রু-আতুল মুঠে নিবিড় ক'রে জড়িয়ে ধরেন মা'র অফুট চরণ-দুটি, আর উন্মাদিনীর মতো গায়ে মাথায় মাখেন রাঙা পায়ের রাঙা ধূলি। আত্ম-অভিমানের মিনারটাই যখন গুঁড়িয়ে চুর হয়ে গেল, তখন ধুলা ছাড়া আর কি কিছু বাকী থাকে? মুক্তো-ঝরা ভোরের মতো একঝলক হেসে শুধান মা—মেয়ে গৌরীকে, "কী হয়েছে, মা অমন করছেন কেন?" বিজয়গর্ব্বে গৌরীমা দেন উত্তর: "হবে আবার কি—যা হবার তাই হয়েছে।" তারপর ভাব-স্তম্ভিত গিরিবালার পানে চেয়ে ঝ'রে পড়ে মা'র আকাশ-আকুল হাসির ঝরনা, আর তার সঙ্গে সে-হাসিতে যোগ দেন গৌরীমা—আনন্দ আর ধরে না!
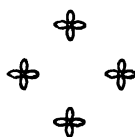
প্লেটোর মতে, এ জগতের অস্তিত্বময়তা হচ্ছে তাত্ত্বিক জগতের অভিলেখ মাত্র। বৈষ্ণব-দর্শনেও দেখি, ধুলার বৃন্দাবনের লীলা-বৈচিত্র্য নিত্যবৃন্দাবনের নিত্যলীলায় চির-চিরন্তন। শ্রীঠাকুরের কথায়: যাঁর-ই নিত্য, তাঁর-ই লীলা। তাই যুগে-যুগের অবতার-লীলায় মেলে একই লীলার অভিজ্ঞান।

দিন যায়—দখিনাপুরে আনন্দ-পর্ব্বের একটা অধ্যায়ের হয় পরিসমাপ্তি। মনে পড়ে, ১২৯৬ সালের পেনেটীর মহোৎসবের

দিন। প্রতিবৎসর ঋতু-রঙ্গিমায় ফিরে ফিরে আসে জ্যৈষ্ঠের শুক্লা-ত্রয়োদশী তিথি ও-কূলের বাতাস হতে সুরভি-লিপি বহন ক'রে, আর এ-কূলের দখিনাপুরে ভক্তগোষ্ঠীতে প'ড়ে যায় সাজ-সাজ রব।

পেনেটীর উৎসবের ছিল এক বিশেষত্ব। দক্ষিণেশ্বরের নব-গৌরচন্দ্রের শুভাগমনে পেনেটীর ধুলায় জেগে উঠতো নদীয়ার আনন্দ। হরিনাম-রঞ্জিত আকাশ, নাম-উল্লসিত কল্লোলিনী সুরধুনী শ্রীঠাকুরের চরণ-চুম্বনে, তাঁর কনক-নিন্দিত দেবতনুর অপরূপ ভাববিলাসে যেন হয়ে উঠতো আর-এক আনন্দতীর্থ—দূরাগত, নিকটস্থ নানা ভক্তের সংঘট্টের সে এক বিপুল জনসমাগম। সেই ভক্ত-সাগরতীর্থে যখন নৃত্য করতেন ভক্তহৃদয়রঞ্জন—প্রস্ফুটিত প্রেমশতদলের মতো হিল্লোলিত হ'ত বরতনু, আর যুললাজ-বরিষণে ভ'রে উঠতো ধূলিধূসরিত বঙ্কিম চরণ। অবিস্মরণীয় সে-দর্শন, শুধু দর্শনে আর অনুভূতিতেই দেয় ধরা; মুখে তা বলা যায় না। আজও সেই আনন্দতীর্থ-দর্শনে যাবে সকলেই, চারখানি পানসি ঠিক হয়েছে। স্ত্রী-ভক্তেরা যাচ্ছে অনেকেই—সকলেই প্রস্তুত, নীরব শুধু নহবতের নীরব প্রতিমা, তাঁর ইচ্ছা যে নির্ভর করছে শ্রীঠাকুরের উপর। তীর্থযাত্রিণীদের কেউ কেউ করেন বিস্ময়-প্রকাশঃ "ওমা, এখনও যে কিছুই সারা হয়নি—তবে কি মা যাবে না?" হৃদয়-গহিনে একটু মৃদু কম্পন, দয়িত-সঙ্গসুখের নিচুপ আশা, কিন্তু না, আর একটি ইচ্ছা-অনিচ্ছার নিবিড়ে হারিয়ে গেছে স্বতন্ত্র ইচ্ছার সর্ব্বস্ব। বলেন মা—"যাওনা একবার, জেনে এসো, তিনি কী চান?" আনন্দে উৎসাহে ছুটে আসেন ভক্তিমতী কল্যাণী—"মা কি যাবেন আমাদের সাথে?" জিজ্ঞাসা করতেই, শ্রীঠাকুর বলেন যেন একটু দ্বিধাতুর ভঙ্গীতে, "তোমরা তো যাচ্ছ, ওর ইচ্ছা হয় তো চলুক।" শুধু এইটুকু—জননীর কাছে এসে জানান ভক্তিমতী। হয়তো ভাবেন, নিশ্চয়ই যাবেন মা—শ্রীঠাকুরের এই নির্দ্দেশ জেনেই। কিন্তু কই, শ্রীমুখে ফুটলোনা তো সম্মতির হাসি?

শ্রবণমাত্র কেমন যেন নীরব থমক জাগলো দুটি চোখে, বোধ-স্বরূপিণী বুঝি বুঝে নেন শ্রীঠাকুরের প্রকৃত ইচ্ছাটুকু, বুঝতে পারেন পূর্ণ অনুমতির কথা এ নয়, অনিচ্ছার আভাস রয়েছে এখানে। সঙ্গে সঙ্গে আনন্দলীলা-দর্শনের সমস্ত ইচ্ছা নিঃশেষে ফেলেন মুছে। মুখে জানান ভক্তদের—"অনেক লোক সঙ্গে যাচ্ছে, সেখানেও ভিড়, অত ভিড়ে উৎসব দেখা আমার হবে না; আমি যাব না।" ভক্তরা শ্রীঠাকুরের সঙ্গে যাত্রা করেন উৎসব-মেলায়, আর জননী একলা থাকেন সেই নিত্যদিনের নিভৃতে। কিন্তু না-দেখার অন্তরালে থাকে কল্পনার অনেক দেখা। তাই অনুধ্যানের স্বপ্ন-সরণিতে ভেসে ওঠে—পুষ্পল চরণের আলতো ছন্দে নেচে চলেছেন গৌরগদাধর, তাঁকে ঘিরে উদ্দাম নৃত্যে আকুল কীর্ত্তন-মুখর জনতা। আর দুই কূলে তরঙ্গ তুলে ব'য়ে চলেছে আনন্দের গৈরিক স্রোতঃ "ন'দে টলমল টলমল করে গৌর-প্রেমের হিল্লোলে রে—"। সে প্রেমের হিল্লোলে ওপারের অরণ্যে আসে সবুজ বেলা, দিগন্তে ধরে রঙের ঝিলিক; হরিময় হয়ে ওঠে জীবন-মরণ। কিন্তু এপারের আকাশে কেন জমে একটি আসন্ন মেঘের মেদুরতা, কেন কেঁপে ওঠে দখিন-নয়ন? ··· দিন গেল কেটে। উৎসবান্তে যথাসময়ে ফিরে এলেন শ্রীঠাকুর। এতক্ষণে বললেন দেবতা, তাঁর নিভৃত মনের গহিন ইচ্ছাটুকুঃ "অত ভিড়, তার ওপর ভাবসমাধির জন্য আমাকে সকলেই লক্ষ্য করছিল; ও সঙ্গে না গিয়ে ভালোই করেছে। ওকে সঙ্গে দেখলে, লোকে ব'লতোঃ 'হংস-হংসী এসেছে।' ও খুব বুদ্ধিমতী।"

✤

✤ ✤

✤
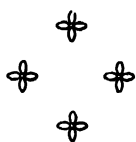
দূর-চক্রবালে মিলিয়ে-আসা একটি করুণ আলো যেন অন্ধকারের ভীরু আলিঙ্গনে এখনি যাবে হারিয়ে—দখিনাপুরের বন-দিগন্তে সুরু হ'ল তারি প্রস্তুতি। পেনেটীর মহামহোৎসবের পরেই শ্রীঠাকুরের গলরোগের হ'ল সূত্রপাত—ধরণীর পুঞ্জীভূত পাপভার আপন শ্রীঅঙ্গে নিয়েছিলেন টেনে, তারই ফলস্বরূপ এই কঠিন রোগযন্ত্রণা। হায়, যুগে যুগে ক্রস-বিদ্ধ হতেই কি তাঁর নেমে-আসা? আনন্দের দীপ-দেওয়ালিতে লাগলো যেন ঝড়ের হাওয়া। ভক্তদের মুখে অনাগত আশঙ্কাঃ 'তাইতো, কী হবে!' ছুটে আসে তরুণ ভক্তের দল, নিজেদের হাতে তুলে নেয় সেবা-ভারঃ না, না, তারা কিছুতেই ছেড়ে দেবেনা তাদের অন্তরতমকে। সবার অলক্ষ্যে করুণ কটাক্ষে হেসে ওঠেন দেবতা—খেলার হাট ভেঙে এসেছে; একতারাটির তার আলগা ক'রে এবার শেষ করতে হবে গানের পালা। বলেন—"বাউলের দল, এলো গেলো, কেউ চিনলো না।" তবু হাল ছাড়েনা ভক্তদল—চিকিৎসায় সেবায় নিবিড় ক'রে জড়িয়ে ধরে সেই বিদায়-চপল চরণ-দুটি। কিন্তু কোন ফল হয় না। অবশেষে চিকিৎসার সুবিধার জন্য তাঁকে আনা হ'ল শ্যামপুকুরের একটি ভাড়া-বাড়িতে, আর দখিনাপুরের বেসুর ভূপালীতে নীরব হয়ে গেল গহিন বীণার তার! চির-গোপন-বাসে অভ্যস্তা জননীও এলেন এই বাড়িতে, কোন অন্দর-মহল না থাকা সত্বেও। ছোট্ট সিঁড়ির পাশের একটি চাতালে নিলেন একটুখানি স্থান ক'রে। এখানেও চললো গোপন সেবা, হারিয়ে যাবার আবেগে আরো নিবিড় আরো গভীর—কখন যে স্নান সেরে উঠে যান, কেউ জানতে পারে না। দিনের পর দিন ভক্ত-সমাগমে পূর্ণ বাড়িটিতে শত কর্মের মাঝেও কেমন ক'রে

যে রাখেন আপন অবস্থিতিটুকু গোপন, কেউ দেখতে পায় না। ভাবতেও যেন লাগে বিস্ময়—কোথায় লুকিয়ে রাখেন জীবনের সব অশ্রু? শ্রীঠাকুরের গোপন-ভাবে-ভাবিতা জননীর পক্ষেই এ যেন সম্ভব। কিন্তু চিকিৎসার এখানেও হয়না সুবিধা। এর পরে ভক্তেরা শ্রীঠাকুরকে নিয়ে আসেন কাশীপুরের বাগানবাটীতে। অবিশ্রাম উপদেশেরও ঘটেনা বিরতি। এদিকে রোগ-উপশমের কোন লক্ষণ যায়না পাওয়া; বিনিদ্র সেবায় আরো সজাগ হয়ে ওঠে বালক-অন্তরঙ্গ-দল, চিকিৎসাও চলে যথারীতি। কিন্তু নিষ্ঠুর নিয়তি, নিরাশার অন্ধকারে একটি তারার প্রদীপ জ্বেলে দিতেও যায় ভুলে! দেখতে দেখতে চলার পদক্ষেপে কেটে যায় কয়েকটি মাস।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি—শ্রীরামকৃষ্ণ-জগতে একটি স্মরণীয় দিবস। কাশীপুর বাগানবাটীর বিস্তীর্ণ উদ্যানে শ্রীঠাকুর সেদিন এসেছেন নেমে, বহু ভক্তের হয়েছে সমাবেশ। বুক-চাপা বেদনায় ভাঙা ফাটলের বুকে হঠাৎ যেন এসে পড়ে একটু আলো—তারি নাম বুঝি ক্ষণিকের আশা, ভক্তদের চোখে মুখে তারি মধুর দীপ্তি—আবার তবে ফিরে এলো দখিনাপুরের আনন্দচঞ্চল দিনগুলি! সহসা ঠাকুর করেন প্রশ্ন ভক্তবীর গিরিশচন্দ্রকে—“গিরিশ, এটাকে তোমার কী মনে হয়?” পাঁচ সিকে পাঁচ আনা বিশ্বাস-ভরা কণ্ঠে ভক্তবর দেন উত্তর—“বেদ-বেদান্ত যাঁর কথা ব'লে শেষ করেননি, আমি মুখে কেমন ক'রে তাঁর কথা ব'লবো?” ভক্তের অপার বিশ্বাসের আবেগ-ভরা কথায় করুণা-বিগ্রহের নয়নে জেগে ওঠে কী এক গভীর প্রসাদ-দৃষ্টি—শ্রীহস্ত ভক্তবক্ষে অর্পণ ক'রে শ্রীমুখে উচ্চারণ করেন, “চৈতন্য হোক, চৈতন্য হোক—”। চৈতন্যময়ের নিজ মুখের সেই চিন্ময় বাণী—ভক্তপ্রাণের সুপ্ত চেতনাকে তোলে উদ্‌বুদ্ধ ক'রে, অশ্রু-আবেগে থরথর ক'রে কেঁপে লুটিয়ে পড়েন গিরিশ করুণার তীর্থ দুটি দুর্লভ চরণে। একে একে সকলেই পায় সেই কৃপা-পরসাদ। কী আশ্চর্য্য, একটি ভক্তের বিশ্বাসের মহিমায় শ্রীরামকৃষ্ণ-কল্পতরুর অমৃতফল-লাভে সেদিন সকলেই

হ'ল ধন্য। শ্রীরামকৃষ্ণ-কল্পতরু নিত্য, আর তেমনই নিত্য ভক্তের অন্তরের খাদহীন বিশ্বাস।

কিন্তু এই অপরূপ করুণার দানলীলাই হ'ল দেবদেহের অসুস্থতা-বৃদ্ধির কারণ। প্রবল আকার ধারণ ক'রলো গলরোগ, তার সঙ্গে ভক্তপ্রাণের ক্ষীণ আশাদীপটিও যেন হ'ল নির্ব্বাণোন্মুখ।

সর্ব্বংসহার অপার ধৈর্য্যের বাঁধও এবার আর থাকে না। জননী সারদা ছুটে আসেন শ্রীতারকেশ্বরে, বিশ্বনাথের ছুয়ারে। বিরহ-সন্ত্রাসে এসে লুটিয়ে পড়েন চোখের জলে ছিন্নমূল ব্রততীর মতো দেবাদিদেবের কৃপা-সম্ভাবনায়ঃ "দয়া করো হে শিবসুন্দর—দয়া করো!" নিরম্বু উপবাসে খিন্ন শুষ্কতনু, আসন্ন ঝড়ের আভাসে ম্লান বিধুর, যেন তপস্বিনী উমার তপোশীর্ণা প্রতিমূর্ত্তি; অন্তরে একটিমাত্র প্রার্থনা—অন্তরতমের দেবদেহের সকল জ্বালা যাক্ দূরে। যাঁর চরণের একটি কুশের ক্ষত বক্ষে হানে শতবজ্রের বাণ, তাঁর তনুর তীব্র জ্বালা কেমন ক'বে সইবে প্রাণ? অবিশ্রান্ত অশ্রুধারে প্রার্থনা চলে বিরামহীন। সে বিধুর দর্শনে পাষাণও হয় বুঝি বিগলিত! ছুটি গভীর দীর্ঘশ্বাসের মতো পর পর ছুটি দিন গেল কেটে—কোমল দেহলতা গেছে শুকিয়ে, যেন কৃষ্ণা-একাদশীর চন্দ্রলেখা, আকাশের আকুলতা নিয়ে লুটিয়ে পড়েছে মাটির বুকে। তৃতীয় দিবসের সন্ধ্যা-প্রহরও হ'ল অতিবাহিত, ঘনিয়ে আসে আলো-অবলুপ্ত গভীর রাত্রি—ছুর্ব্বলতায়, প্রার্থনার গভীরতায় জননীর দেহমন তখন আবেশে অবসন্ন; সহসা অন্ধকারের মোহজাল ভেদ ক'রে জাগে এক তীক্ষ্ণ গম্ভীর শব্দ—জননী হয়ে ওঠেন সচকিতা ঃ "ও কিসের শব্দ?" যেন কতকগুলি মৃন্ময়পাত্র আঘাতে হ'ল চূর্ণবিচূর্ণ। সহসা অন্তরলোকে এক অভূতপূর্ব্ব ভাবান্তর—জেগে ওঠে এক নির্ম্মম বৈরাগ্য। জননীরই শ্রীমুখের কথা ঃ "রাত্রে একটা শব্দ পেয়ে চম্‌কে উঠলুম। জেগেই হঠাৎ আমার মনে এমন ভাব এলো, এ জগতে কে কার স্বামী? এ সংসারে কে কার? একেবারে সব মায়া কাটিয়ে এমনি বৈরাগ্য এনে দিলে।"

"ঈশ্বরীয় ভাবের ইতি করা যায় না"—দক্ষিণেশ্বর-ঈশ্বরের শ্রীমুখের কথা। তা হলে তাঁর ভাবের ইতি করা কেমন ক'রে যাবে—সাধারণ বুদ্ধির মাপকাঠিতে? ব্রহ্মস্বরূপিণী—কালস্বরূপিণী যিনি নিজের সৃষ্টি নিজেই প্রয়োজনে গ্রাস করতে সক্ষম—লীলা-অবসানের প্রত্যাসন্ন ক্ষণে তাঁর বিরাট মনে যে এইরূপ ইচ্ছা, এইরূপ ভাবের উদয় হবে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি? বুঝি মহামায়া আপন হাতে বাঁধন কেটে না দিলে, শিবেরও সাধেব বাঁধন খুলবে না! পবক্ষণেই মন নেমে আসে ভাবাতীত রাজ্য থেকে। আস্তে আস্তে কোনরূপে উঠে মন্দিরের পিছনের কুণ্ড থেকে স্নানজল মুখে চোখে দিয়ে যেন একটু সুস্থ হন। পরের দিন জননী ফিরে এলেন শ্রীঠাকুরের সকাশে, সেই কাশীপুরের দেবালয়ে। প্রত্যাগত জননীকে দেখে শ্রীপ্রভুব মুখচন্দ্র মৃদুহাস্যে হয়ে ওঠে রঞ্জিত: "কি গো, কিছু হ'ল?" জননীর স্থিরমৌন মুখের পানে চেয়ে পরক্ষণেই বলেন তেমনি হাসি হেসে—"কিছুই না।" কে বুঝবে এর অর্থ—চির-রহস্যাচ্ছন্ন এই শ্রীবামকৃষ্ণ-সারদা-লীলা!
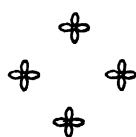
এর পরের কথা বলতে গিয়ে ভাষা হয়ে যায় মূক। জননীর সেই গভীর বিরহের কথা বলতে গেলে, শুধু মরমী কবির কথাই মনে পড়ে:

বিরহিণী বিরহ কি কহব মাধব!
দশদিশ বিরহ হুতাশ,
সহজে যমুনা জল অধিক ভেল
কহতহি গোবিন্দদাস।

জননীর যুগে যুগে সঞ্চিত এই অসীম বিরহের এক কণাও

মানুষ পারেনা ধারণা করতে, বহন করা তো সুদূরপরাহত। আর সে-বিরহের সুরুই হ'ল বাদল-ভরা দিনে—এ মাস যেন বিরহেরই মাস; তবু ক্ষণ-বরষার আছে শেষ, এ বিরহ যেন অন্তহীন। শ্রীঠাকুর নিত্যলোকের স্বর্ণদেউলে, আর শ্রীঠাকুরের অদর্শনে ধরণীর শূন্য-মন্দিরে বিরহব্যাকুলা জননীকে দেখে মনে হয় বিচ্ছেদের বালুচরে ঝরা এক শোকের শেফালী। মনে পড়ে শ্যামবিরহিণীর কথা ঃ

"এ সখী হমারি দুখের নাহি ওর
ঈ ভর বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর।" (বিদ্যাপতি)

জননীরই মুখের কথা ঃ "আমি ঠাকুরের অদর্শনে পাগলের মতো হয়ে গিছলুম।" একটানা অশ্রুজলের মাঝে ব্যথা যেন খুঁজে পায়না তীর, শুধু কান্না—দু'কূলহারা কান্না—অশান্ত, অবুঝ। কিন্তু বিরহ অনন্ত এবং নিত্য হলেও, অনন্তমিলন—নিত্যমিলনও যে অতি বড় সত্য। বৈষ্ণবধর্ম্মের ভাব-সম্মেলনই তো তার প্রমাণ। তাই যখন শ্রীরামকৃষ্ণ-বিচ্ছেদ-বেদনায় মুহ্যমানা মা সারদা, লোক-প্রথা অনুসারে আপন শ্রীকরের কঙ্কণ-দুটি করছেন উন্মোচন—সহসা ঠাকুরের প্রকাশ। সীমন্তিনী-শ্রেষ্ঠার রিক্তশ্রী কেমন ক'রে সইবেন তিনি? জননীর হাত-দুটি ধ'রে বললেন, "আমি কি কোথাও গেছি গা? এই যেমন এ-ঘর থেকে ও-ঘর।" আর খোলা হয় না, হারানো দিনের নিটোল স্মৃতিতে অটুট হয়ে থাকে সে-বন্ধন। আবার বিচ্ছেদ-বেদনার প্রবলতায় যখন জননীর দেহত্যাগের সঙ্কল্প হয়ে উঠেছে দৃঢ়—

"পুন যদি চাঁদমুখ দেখনে ন পাব
বিরহ অনল মাহ তনু তেয়াগিব"

—জোছনার তুষানলে জ্বলে গেছে কুঞ্জবীথি, সুরধুনীর সোনার ঢেউ কালীয়নাগের বিষে হয়ে গেছে গরল-ঢালা! তপ্ত তনু কোথায় জুড়াবে? তার চেয়ে মরণের নীল আঁধারে ডুব দেওয়াই তো ভালো! সে সঙ্কল্পেও পাষাণ-দেবতা হানে বাধা। একটি বুক-জুড়ানো দরশ

দিয়ে বলেন, "না, তুমি থাকো, অনেক কাজ বাকী আছে।" আর যাওয়া হ'ল না। মধুরের নিঠুর কথাও যে চিরমধুর। তাইতো বলেন মা, "শেষে দেখলুম—তাইতো, অনেক কাজ বাকী!"

মর্ত্তের চিরবিরহে অমর্ত্তের চিরমিলন ···

এই কথায় মনে পড়ে যায় বহুদিনের কথা—শ্রীঠাকুর আপনমনে গাইছেন আপন ভাববিলাসে ঃ

"এসে পড়েছি যে দায়ে সে দায় ব'লবো কায়
যার দায় সে আপনি জানে পর কি জানে পরের দায়।"

পরক্ষণেই মা সারদার দিকে চেয়ে বলেছেন, "শুধু কি আমার দায়? তোমারও দায়।" বুঝেছিলেন, তাঁর বিচ্ছেদ-বেদনায় তদ্‌গতপ্রাণা জননী সারদার দেহধারণের ইচ্ছা হবে চিরলুপ্ত। তারি জন্যে নানা ছলে নানা ভাবে গীতিছন্দে জানাতেন শত অনুরোধ, জননীকে ধ'রে রাখতে। এই অসীম আকূতি, একি বিশ্বের দায়? না, নিজেরই দায়? না, দু'য়ে এক?

দেখেছেন "মহানগরীর আঁধার গহ্বরে ভেসে বেড়াচ্ছে কতকগুলো কামনার কীট, তবু তারা মুখ তুলে চাইছে আকাশের পানে ঃ 'আলো দাও, এক ফোঁটা আলো' "। তাই বলতেন, "কলকাতার লোকগুলো যেন অন্ধকারে পোকার মতন কিলবিল ক'চ্ছে, তুমি তাদের দেখবে! আমি কী করেছি, তোমাকে এর চাইতে অনেক বেশী করতে হবে।" এই বিরাট প্রয়োজনই ধ'রে রাখলো জননীকে মাটীর বুকে।

শ্রীঠাকুরের নিত্যলোকে শুভাগমনের পরও, শত সন্তানের আর্ত্তি জননীর বিদায়পথের হ'ল যেন শত বাধা। ধুলার ছেলের ধুলা মুছিয়ে দিতে, শ্রীঠাকুরের বিচ্ছেদ-বেদনার মাঝেও থাকতে হ'ল। তা নইলে, বিশ্বার্ত্তিহারিণী নাম কেন? জগদ্ধাত্রী ছাড়া জগৎকে আর কে ধ'রে রাখবে? তবু বুকের জ্বালা কি নেভে? কোথা সেই দখিনাপুরের চাঁদের হাট? আর, কোথায় ভাব-গরগর-তনু গদাধরচন্দ্র বিনা এই শূন্য-নগরী!

মন যেন আর টিকতে চায়না কোনমতে; শূন্য লাগে হৃদয়-দেউল, শূন্য লাগে বাহির-ভুবন: "শূন ভেল দশ দিশ, শূন ভেল নগরী"।

তাই বিচ্ছেদ-জ্বালা বুকে নিয়ে সর্ব্বত্যাগী কয়েকটি সেবকের সঙ্গে জননী করলেন তীর্থযাত্রা—বৃন্দাবনের পথে। ছেলেদের বুকেও তখন জ্বলছে আগুন! তারা যেন আজ দিশাহারা তরণী। তাই অনিকেত জীবনের নিঃসঙ্গতায় জননীর সঙ্গে তীর্থপথে তারাও দিলে পাড়ি। বৈরাগ্যের দহন-জ্বালাই হ'ল যেন আঁধার-পথের আলোর দিশা।

মধ্যপথে দেওঘর হয়ে কাশীধামে নামলেন ভক্তসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত জননী। ঝলমল করছে জ্যোতিপর্ণা বৈতরণী। মর্ত্তের লক্ষ-মানুষের চলেছে বাসনার মুক্তিস্নান, তীরের প্রান্ত ছুঁয়ে দূরান্তে গিয়ে মিলেছে সৌধমালার মৌন শোভা। 'হর হর মহাদেব' ধ্বনিতে বেজে উঠেছে মুক্তির জয়গান। এই মর্ত্তের শিবলোকে চরণ পড়তেই শিবানীর দেহ-মনে জেগে ওঠে দিব্য ভাবাবেশ। পশ্চিম দিগ্বলয়ে আগুনে মেঘ বিলীন হয়ে যেতেই, উধাও হয়ে নেমে এলো সন্ধ্যা—সুরু হ'ল বিশ্বেশ্বরের আরতি। শিবশম্ভুর জয়হুঙ্কার—গুরুগম্ভীর নিনাদে গমগম করছে মন্দির-গুহা, ঊর্দ্ধশিখায় জ্বলছে কর্পূর-দীপ, দুধগঙ্গায় পিছল প্রতোলিতলে লুটিয়ে পড়ছে লক্ষ লক্ষ ভক্তের শঙ্কিত প্রণাম। সেই বিরাট দেবতনু দেবাদিদেবের মহান্ আরতি-দর্শন-শেষে যখন ফিরে আসেন জননী আপন আলয়ে, তখন ভাবাবেশে টলমল অঙ্গ, সে অঙ্গে বিরাটের প্রতিচ্ছায়া। বিপুল পদক্ষেপে চলেছেন স্বর্ণকাশীর পথ বিদ্যুদ্বন্ত ক'রে। গৃহে এসে তেমনি আবেশে আচ্ছন্ন অবস্থায় পড়লেন শুয়ে। বহুক্ষণ অতীত হলে, ভাবলোক হতে মন সহজাবস্থায় আসে ফিরে; বলেন মা, "ঠাকুর আমাকে হাত ধ'রে মন্দির থেকে নিয়ে এলেন।" বারাণসী যেন বিরাট ভাবের রাজ্য, তাই শিবস্বরূপ ঠাকুরও সেখানে বিরাট। আর সেই ভাবে ভাবময় হয়ে জননীর চরণেও জেগে উঠেছিল

বিরাটের ছন্দ। মা যে আমার কালের বুকে নৃত্যপরা মহাকালী!

এর পরে মা এলেন অযোধ্যা নগরীতে। অযোধ্যায় তখন শবরী-যামিনী। সেথায় কয়েকটি দিন আর কয়েকটি রাত কাটিয়ে আবার যাত্রা করলেন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের লীলাতীর্থ বৃন্দাবনে। কল্পনার অশ্রু-সজল চোখে ঝিলমিল ক'রে ওঠে তমাল-ছায়া-নীল বনানী, যার কুন্তলে দোলে হিন্দোল-লতা, কৃষ্ণসারের প্রতীক্ষা-আকা যার আকুল দিঠি। একটি বুক-ভাঙা অতীতকে বিস্মৃত হতে মা ছুটে চললেন সেই অনিন্দ্যলোকে, যদি মেলে দয়িতের দরশন। মিললো কি?

বিষণ্ণ রোদের রিক্ততায় ক্লান্ত প্রান্তর—শিমুলের আগুন-হাওয়ায় কেঁপে উঠেছে দিগন্ত। শ্রীবৃন্দাবনের পথে ঝড়ের বেগে ছুটে চলেছে গাড়ি, তীব্র আর্ত্তনাদে দিক্ উদ্‌ভ্রান্ত ক'রে।

জননী পথশ্রমে ক্লান্ত, শয়ননিষণ্ণ অবস্থায় হাতখানি রেখেছেন গাড়ির জানলায়; ক্লান্ত শুভ্র সে-হাতে জড়ানো দয়িতের বিদায়-স্মৃতি—শ্রীঠাকুরের হাতের সোনার ইষ্টকবচখানি; সহসা চকিত-দর্শন —মুক্ত বাতায়ন-পথে ফুটে ওঠে একটি জ্যোৎস্না-নিমীল মুখ, সেই পাগল-করা হাসি, সেই আকুল-করা কথা: "ওগো, হাতে সোনার ইষ্টকবচ এমন ক'রে রেখেছ কেন? ও-যে চোরে অনায়াসে খুলে নিতে পারে।" চকিত-দর্শনেও বুক ভ'রে ওঠে: "এসেছ ঠাকুর!"—দু'চোখে নামে অশ্রু। একটি নিবিড় নতি জানিয়ে, তাড়াতাড়ি উঠে মা ইষ্টকবচ খুলে রাখেন, শ্রীঠাকুরের মূর্ত্তির সাথে। তখন থেকে সে কবচ হ'ল পূজার সামগ্রী।

এরপর কল্পলোকে ভেসে ওঠে কানুহারা শ্রীবৃন্দাবন—চিরবিরহিণী রাধা আর বিচ্ছেদ-দগ্ধ, তপ্ত দীর্ঘশ্বাসে পরিপূরিত নিধুবন; আর উছলিত যমুনা, যেন অশ্রুজলের উজান। সেই শূন্য-ব্রজভূমি দর্শনমাত্র যেন জননীর শ্রীরামকৃষ্ণ-বিরহ নবরূপায়ণে হয়ে ওঠে আকুলছন্দা—ছুটে আসে বিরহ-সহচর চৈত্রানিল, কিংশুক-ধনু ফেলে দিয়ে মূক হয়ে থাকে মধুবন, কলাপচক্রে নিথর মুখ আবরিত করে ময়ূরের দল। সেই বিচ্ছেদ-লগ্নের সহচরী হলেন লীলাসঙ্গিনী যোগীন-মা।

তিনি তখন বৃন্দাবনবাসিনী। তাঁর কণ্ঠ আকুল বাহুতে জড়িয়ে সুরু হ'ল মা'র বুক-ভাঙা ক্রন্দন, যেমন ক'রে একদিন কৃষ্ণচন্দ্রের বিরহে ললিতা-বিশাখার কণ্ঠলগ্ন হয়ে করেছেন অজস্র বিরহাশ্রু-মোচন। আজও বুঝি তারই পুনরাবৃত্তি।

দিন কাটে—কিন্তু বিরহের লীলাপীঠে এসে ক্রন্দনাবেগ যেন কোনমতেই হয়না প্রশমিত।

অবশেষে আনন্দঘনতনু শ্রীঠাকুরের ঘন ঘন দর্শন-বিলাসে কিছু শান্ত হয় জননীর অন্তর; তবু চির-চাওয়ার মনে জেগে থাকে একটি অতৃপ্তির তৃপ্তি—দীন আভরণটুকুও মনে হয় দহন-বলয়। তাই এখানে এসেও আবার খুলতে হলেন উদ্যত, ঠাকুরের স্মৃতি-বিজড়িত সেই আভরণ-দুটি। সীতার দর্শনকালে সেই মূর্ত্তির হাতে ছিল যেমন দুটি বালা, ঠিক তার অনুরূপ বালা-ই শ্রীঠাকুর গড়িয়ে দিয়েছিলেন জননীর হাতে। পরম দয়িতেব বিদায়-ব্যথায় সে-স্মৃতিটুকু কেন দেয় এত জ্বালা? তাঁর অদর্শনে সে-কনককঙ্কণ যেন মনে হয় শত বন্ধন! কিন্তু খোলা আর হয় না। আবার সেই চকিত-দর্শন, আবার কমল চোখের মৌন মিনতি: "তুমি হাতের বালা খুলো না। গৌরদাসীর কাছে বৈষ্ণবতন্ত্র জেনে নিও। কৃষ্ণ পতি যার, তার বিধবা হওয়া নাই—সে চির-সধবা।" দু'চোখের যমুনা যেন পথ খুঁজে পায় না—আকুল হয়ে ছুটে আসেন মা, গৌরদাসীর কাছে। মানসকন্যা গৌরীমা—মুখে মুখে শাস্ত্র তাঁর। তিনি তখন তপস্যায় মগ্ন ছিলেন বৃন্দাবনের কোন নিভৃত স্থানে। "মা তুমি?"—আনন্দে উদ্বেল হয়ে ওঠেন মানস-দুহিতা গৌরীমা, জননীর অভাবিত আগমনে; সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে কত কথা। স্মৃতির দিগন্তে হেসে ওঠে একফালি বাঁকা চাঁদ, আর তার অনেক দূরে সুরধুনীর সন্ধ্যা-নিঝুম তীরে কেঁদে ফেরে একটি নীড়হারা পাখী: 'কৃষ্ণ কোথা' 'কৃষ্ণ কোথা'। মেয়েকে দেখে মা'র বুকের পাথার আর কূল মানে না; দুজনের বাহু-বন্ধনে দুজনেই পড়েন বাঁধা, তারপর অশ্রুতে হাসিতে ভুলে-যাওয়া অনেক কথায় কেটে যায় আনন্দ-বিষাদ-

মুহূর্ত্তগুলি। মনের ভার একটু হালকা ক'রে মা এবার জানান তাঁর মানসকন্যাকে তাঁর দিব্য গভীর দর্শনের কথা। জননীর মুখে এই অপরূপ দর্শনলীলা-শ্রবণে পরম আনন্দিত হয়ে গৌরীমা প্রমাণ দেন, মুখে মুখে বৈষ্ণবতন্ত্রের শ্লোকের পর শ্লোক আবৃত্তি ক'রে। শুধু কি তাই? শ্রীঠাকুর তাঁর গৌরদাসীকেও যে দিয়েছিলেন দর্শন, এবং আদেশ—জননী সারদাকে বৈষ্ণবতন্ত্র শ্রবণ করাতে।

কী অপরূপ! যেমন ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন-ঠাকুর, তেমনি তাঁর লীলাসঙ্গিনী—সর্ব্বভাবে ভাবময়। তাই এক-একটি তীর্থে দেখি বিভিন্ন ভাব-বৈচিত্র্য। কখনও হয়তো চতুরাশ্রেষ্ঠা শ্রীরাধিকার ভাবে আবিষ্টা জননী সকলের নয়ন-অলক্ষ্যে চলে যাচ্ছেন ধীর সমীরের তীরে—তৃণের রোমাঞ্চ-জাগা তমালবীথির ছায়ে। বিরহ-দিগ্ধ অন্তরে এখন চলেছে অন্তরতমেব অনুসন্ধান। তাই উদাস আঁখির পল্লবে একটি নিরুচ্ছ্বাস চাওয়া। এদিকে দিশেহারা ভক্তদল জননীর অনুসন্ধানে আকুল: "কোথায় গেলেন মা?" অনেক খোঁজের পরে তবে মিলেছে যমুনার তীরে তাঁর দর্শন, ভাব-অচেতন অবস্থায়। সঙ্গিনীরা 'রাধেশ্যাম' নামে ফিরিয়ে এনেছেন চেতনা; আধো-বিহ্বলতায় বলছেন জননী অতি অস্ফুটে—"আমি কোথায়?"

* * *

কখনও ছুটে গেছেন বংশীবটে, যদি মেলে দয়িতের দর্শন: ওগো, ঐ তো দাঁড়িয়ে ব্রজমনোহারী শ্যামসুন্দর—শিরে শিখণ্ডক, গলে বনমালা, বিদ্রুম-অধরে মোহন-মুরলী, ডাকছে 'রাধা' 'রাধা' ব'লে। কী যেন মনে পড়ে জননীর: হ্যাঁ, হ্যাঁ, তিনিও তো ছুটে এসেছেন ঐ কুল-ভাসানো বাঁশীর ডাকে—ঘরে ফেরার কথা তো আজ নয়! ঐ-তো চাঁদকে ঘিরে জ্যোৎস্নামালার মতো দাঁড়িয়ে ললিতা-বিশাখা-মঞ্জরীর দল! কিন্তু সে কই? রাধা? যাকে ডাকতে গিয়ে বাঁশী পাগল হয়েছে: 'রাধা কই?'—'রাধা কই?' তবে কি আর ভাবতে পারেন না জননী; বুঝি আপন তনুর তনিমায় চাইতে গিয়ে কী

যেন দেখে চম্‌কে উঠে লুটিয়ে পড়েন বংশীবটের ধুলায়। আর কিছু মনে নাই ··· যমুনা কখন গেছে উজান, দূর-দখিনা ঘনকুন্তলে ফেলে গেছে সুরভিশ্বাস, শুধু একটি কান্নাপাগল স্মৃতি আছড়ে মরছে হৃদয়ের ছুই কূলে। সেদিনও ফিরিয়ে এনেছিল মাকে তাঁর সেবিকারা অনেক অনুসন্ধানের পর।

একদিন তো কান্তরূপসঙ্গা যমুনায় ছু'হাত বাড়িয়ে ঝাঁপ দিতে হলেন উদ্যত—যোগানন্দজীর চীৎকারে ধ'রে ফেললেন গৌরীমা আর গোলাপ-মা। তাই বুঝি পরবর্ত্তী কালে ভক্তদের বলেছেনঃ "আমিই রাধা।"

মনে পড়ে, এই ব্রজধামেই কোন সন্ন্যাসীর কাছে মা'র জনৈকা সেবিকা জানান প্রার্থনাঃ "বাবা, কিছু একটা মন্ত্র জপ করো, যাতে মা'র শোক-নিবারণ হয়।" হেসে বলেন সন্ন্যাসী—"ঐ মায়ীর আবার শোক কি! ওঁর স্পর্শেই যে সর্ব্বশোকের বিনাশ হয়। অধীর হয়ে গোলাপ-মা প্রশ্ন করেন, "তবে মা এমন হয়ে থাকেন কেন?" আবার হাসেন ব্রহ্মজ্ঞ সাধুঃ "ঐ মায়ী সদাসর্ব্বদা ওঁর পিয়াকে দেখতে পান। আরও কিছুকাল এমনি থাকবেন, তারপর ভাণ্ডার উজাড় ক'রে দেবেন।" স্মরণধন্য সেই দ্রষ্টা ইতিহাসের আড়ালে থাকলেও, শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তমণ্ডলীর শ্রদ্ধান্বিত প্রণাম তাঁর স্মৃতিকে চিরদিন জাগিয়ে রাখবে।

কখনও ভাবসম্মিলনের পুলকশ্রীতে আনন্দচঞ্চলা বালিকার মতোই ঘুরেছেন বৃন্দাবনের মন্দিরে মন্দিরে—কৃষ্ণ-দর্শনের আনন্দে বিভোর। কখনও বা কলাপীমুখর নিধুবনে কৃষ্ণ-অনুভাবনায় তন্ময়। রাধারমণের শ্রীমন্দিরে রাধারমণের চিন্ময়-দর্শনে হয়ে পড়েছেন আবেশে আকুল, আর ভাব-উছলিত নয়নে ফুটে উঠছে অপরূপ দর্শন —কোন ভক্ত মেয়ে যেন চিন্ময় শ্রীবিগ্রহকে ব্যজনের দ্বারা করছেন সেবা। এই দেববিগ্রহের নিকটেই জননী জানিয়েছেন প্রার্থনা—অদোষদর্শিতার জন্য, যেমন ক'রে দখিনাপুরে চাঁদের পানে চেয়ে জানাতেন নিদাগ হবার প্রার্থনা। একি অপূর্ব্ব দীনতা!

দীনাবতারের লীলাসঙ্গিনী, তাই দীনভাবের অপূর্ব্ব বিকাশ দেখি জননীরও জীবনে।

পরবর্ত্তী কালে সন্তানগণ দেখেছেন যে, কতখানি অসন্তুষ্ট হয়ে উঠতেন বৃথা পরনিন্দা-পরচর্চ্চায়; জননীব সম্মুখে তো দূরের কথা, পাশের ঘরেও যদি শুনেছেন পরের সমালোচনা, তীব্রকণ্ঠে তীব্র ভর্ৎসনায় তা প্রতিবাদ করেছেন; ছিদ্রান্বুসন্ধানকাবীর কথায় বলছেন, "লোকে কাপড় ময়লা কবে, ধোপা সেই কাপড় সাফ ক'রে দেয়। লোকে খারাপ কাজ কবে, আর যারা সেই কাজের চর্চ্চা করে, তারাই তাদের পাপেব ভাগী হয়।"
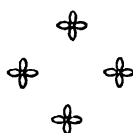
এইবার সুরু হ'ল জননীর গুরুভাবের বিকাশ। এই পুণ্য-ব্রজধামেই খুলে গেল জননীর প্রধান লীলার একটা দিক। অফুরন্ত কৃপার ধারায় বিশ্বকে অমৃতায়িত, পরিপূরিত করবার এ এক নূতন লীলা—যে লীলা হয়নি কোন অবতারে, এমনকি শ্রীঠাকুরও যে লীলা রেখেছিলেন প্রচ্ছন্ন আকারে। মনে পড়ে শ্রীঠাকুরের কথা ঃ "আমি কী করেছি, তোমাকে এর চেয়ে অনেক বেশী করতে হবে।"

তখনও মা অবগুণ্ঠনবতী। ছু'-একটি বালক-সেবক ছাড়া কোন শ্রীরামকৃষ্ণসন্তানের সঙ্গে তখনও হ'তনা কোনরূপ বাক্যালাপ। সহসা শ্রীঠাকুরের দর্শন ··· অধরজ্যোৎস্নায় ছড়িয়ে পড়লো ছুটি কথা ঃ "ছেলে যোগেনকে দিতে হবে দীক্ষা।" ইষ্ট-নির্দ্দেশও হ'ল একটি চকিত পুলকের হাসিতে। যেন আনন্দভারাতুর আকাশের একটি বিরাট ইঙ্গিত নেমে এলো বসুন্ধরার চোখে। কিন্তু জননীর বিচ্ছেদ-বিধুর মর্ম্মে তখনও বেদনবিরূপতা। তাই কোনমতেই হন না রাজী। ক্রমাগত তিন দিন ধ'রে ঠাকুরকে দিতে হয় দর্শন এবং

আদেশ দুই-ই। তিন দিন পরে সহসা সেদিন আনন্দ-ব্রজে নেমে এলো যেন একটি জগন্মঙ্গল মুহূর্ত্ত। জননী পূজার আসনে উপবিষ্ট, পুষ্পচন্দনে ধূপদীপে অর্চ্চিত ক'রে চলেছেন দয়িতসুন্দরকে; ধীরে সে-পূজা নিবিড় হয়ে ওঠে ভাবমন্থিত একটি গভীর বিলুপ্তিতে··· কেটে যায় পল, অতীত হয় মৌন প্রহর ··· সম্মুখে যোগেন-মহারাজ —শ্রদ্ধা-শুচির একটি নীরব প্রার্থনা ফুটে উঠেছে তাঁর অশ্রু-ভারাতুর দুটি চোখে—প্রতীক্ষায় আকুল। একটু পরেই দেবীর কম্পিত অধরে ঝঙ্কৃত হ'ল একটি পাবক-মন্ত্র, দীক্ষিত হলেন যোগানন্দ; একটি অচল বিদ্যুৎ নেমে আসে যেন মানসগঙ্গার কানায় কানায়—বারেক শিহরিত হয়ে, ধ্যান-উপশান্ত হয়ে যান মা'র চিহ্নিত সেবক—নিশ্চল নিশ্চুপ। শুধু অনুভূতির একটু মৃদু কম্পন জেগে ওঠে মাঝে মাঝে অকম্পিত দেহে। জননীর কণ্ঠের সেই মন্ত্রবাণী এত তীব্র গভীর ঝঙ্কারে সেদিন জেগেছিল যে, পাশের ঘরেও ঝঙ্কৃত হয়েছিল তার দিব্য অনুরণন। চকিত গৃহবাসী সকলেই অনুভব করেছিল সেই বিদ্যুৎ-বিলাস।

স্বামী ত্রিগুণাতীত, স্বামী যোগানন্দ মা-সারদার প্রথম দীক্ষিত সন্তান। তার মধ্যে স্বামী ত্রিগুণাতীতই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীঠাকুরের লীলাকালেই তাঁর নির্দ্দেশে জননী দিয়েছিলেন তাঁকে দীক্ষা। তখন তিনি বালক 'সারদা-প্রসন্ন'—সারদার প্রসন্নতাই যে ছিল তাঁর জীবনের চরম আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু বিস্ময়ের কথা—দীক্ষা হয়েছিল, তবে গুরুশিষ্যের মধ্যে তখন হয়নি চাক্ষুষ সাক্ষাৎ। সাগর-গুণ্ঠিতা কমলার মতোই জননী তখন মানবচক্ষুর অন্তরালে। সেদিন নহবতের নিবিড় অন্তর থেকে ভেসে এসেছিল মা'র মন্ত্রোচ্চারিত মৃদুকণ্ঠ, আর বাইরে কৃপাপ্রার্থী বালকের মর্ম্মে মর্ম্মে আত্মায় আত্মায় তা হয়েছিল গ্রথিত। কর-জপের সময়ে শুধু জননীর বরদ হস্তখানি দেখেছিলেন বালক ত্রিগুণাতীত। আর আজ মা'র চরণাশ্রিত সন্তানরূপে পরিগণিত হলেন মা'র আর-এক সেবক-সন্তান—আদরের ছেলে যোগীন। মা'র কথাঃ "শরৎ

আর যোগীন এ-ছুটি আমার অন্তরঙ্গ।” কোমলস্বভাব যোগানন্দ, মা'র কাছে তাঁর ছিল একটি অদ্ভুত আবদার: “মা, আমি তোমার মেয়ে—তুমি আমাকে ‘যোগা’ ‘যোগা’ ব’লে ডাকবে।”

শুদ্ধসত্ত্বময়ী জননী ভক্ত ছেলেদের কাছ হতে চিরদিন নিজেকে রেখেছিলেন প্রচ্ছন্ন ক’রে, লোকশিক্ষা-ব্রতে; বলতেন—“বাবা, মানুষের ছাল তো!” তাই চিরশুদ্ধ সন্তানও বুঝি নিজেকে প্রকৃতি-ভাবে রেখে, জীবন-ভোর করেছিলেন মাতৃদেবীর সেবা।

গুরুভাবে অধিষ্ঠিতা হয়েও, সন্তানের কল্যাণের প্রয়োজন ব্যতীত কোনদিন মা কোন ভক্ত-সেবক, দীক্ষিত সন্তানকেও আদেশের ভঙ্গীতে বলেননি কোন কথা। সন্তানদের দীক্ষাদান-কালে শ্রীঠাকুরের মূর্ত্তির পানে অঙ্গুলি নির্দেশ ক’রে বলেছেন, “ঐ উনিই গুরু”—শ্রীরামকৃষ্ণময়ী সারদা। বৃন্দারণ্যে সেদিন মিলনমদির নিশিশেষে চন্দ্রাবলীর স্মৃতির কুঞ্জে হয়তো ভ্রষ্ট মালার লাঞ্ছনা আর নিকুঞ্জতীর্থের ছুয়ারে মুরলীর চারু গুঞ্জন এইমাত্র বুঝি নীরব হ’ল, শুকসারীর কুঞ্জভঙ্গের গানে হারানো দিনের অনেক কথা। জননী সারদার পদ্ম-নিটোল ছুটি চোখে সহসা জাগে ধ্যাননিমীল তন্ময়তা। চেনা বাঁশীর সুর কোথায় যেন হারিয়ে গেল, নীল তমালের ছায়ায় যেন মিলিয়ে গেল কার শিখিচূড়ার বঙ্কিম ছায়াটুকু—অতল গভীরে ডুবে যায় মা’র ছুটি আঁখি, ডুবে যায় মন, নিথর নিস্পন্দ হয় তনু-তীর!

ছুটে আসেন ভক্ত মেয়ে যোগীন-মা: “ওগো, এইতো বেশ ছিলে, মা, এরি মধ্যে ডুব দিয়েছ সমাধির অথৈ তলে!” আকুল কণ্ঠে সুরু করেন সারদেশ্বরের শ্রবণাভিরাম নাম। অবশেষে আসেন স্বামী যোগানন্দ; তাঁর আকুল কণ্ঠের নামে বুঝি জননীর ধীরে ধীরে দেহে আসে যেন বাহ্য চেতনার আভাস। কিন্তু তখনও ভাব-বিলসিত তনু-মন, মুখে আধো-আধো বুলি। সহসা একি!—ব’লে উঠলেন “খাবো”; সকলে চম্‌কে ওঠে: এ কার আধো-ফোটা বুলি চিরদিনের চেনা কণ্ঠে? এ যে ঠাকুরের কণ্ঠ!

এই তো সেই বৈষ্ণবধর্ম্মের সর্ব্বসাধ্যসার ভাবমুগ্ধতারও পরের কথা ঃ

না সো রমণ না হাম রমণী
দুঁহু মনোভাব এক পেশল জানি।

সেবক নিয়ে আসে ভোগ এবং জলপাত্র ধ'রে—দেয় ভাব-গরগর শ্রীমুখে—আনন্দ-আতুর নয়নে ছাখে সকলে, জননী গ্রহণ করেছেন অন্নাদি, যেমন ভাবাবেগে গ্রহণ করতেন ঠাকুর নিজে। পানের অপর দিক দাঁতে কেটে, নিচ্ছেন পান। বিস্ময়-বিহ্বলতায় আকুল ভক্তদল বলে—"ওগো, পান খাবার এই রীতিও যে ছিল শ্রীঠাকুরের চিরদিনের!" ভক্তদল পরমানন্দে বিভোর—আনন্দ-ব্রজের এই ভাব-সম্মেলনে তারা আজ কৃপাধন্য। সহসা সার্থকনামা স্বামী যোগানন্দ করেন কয়েকটি প্রশ্ন ; সঙ্গে সঙ্গে মেলে তার উত্তর, আবেশ-ভারাতুর জননীর কণ্ঠে—যেমন ক'রে ঠাকুর দিতেন উত্তর, কইতেন কথা—ঠিক তেমনি ক'রেই। ধীরে ধীরে আবেশ যায় কেটে, দাক্ষিণ্যময়ীর দুটি নয়নে আবার ফুটে ওঠে অভয়-দাক্ষিণ্য—নইলে ছেলের প্রাণ জুড়োবে কেন? সকলেই বোঝে বিরহ-মিলনের পরম সন্ধিতে এবার এসে পড়েছে একটি অনাগতের আলো।

মনে পড়ে, মায়ের মুখে যুগাবতারের বেদগাথা-শ্রবণে কোন ভক্ত হয়ে উঠেছেন দর্শন-ব্যাকুল—গভীর আক্ষেপের সঙ্গে ব্যথা জানান, "মা, ঠাকুর শরীর ধারণ ক'রে জগতে এলেন, কিন্তু এমনি দুর্ভাগ্য যে, তাঁকে প্রত্যক্ষ দেখতে পেলুম না।" সন্তানের আকুলতায় স্নেহসিক্ত কণ্ঠে বলেন জননী, আপন দেবদেহের পানে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ ক'রে ঃ "এর ভিতর তিনি সূক্ষ্মদেহে আছেন। ঠাকুর নিজমুখে বলেছিলেন, 'আমি তোমার ভেতর সূক্ষ্মদেহে থাকব।'" শ্রীঠাকুরেরই কথনভঙ্গী ঃ "এর ভিতর তিনি"—এ কথা তো তাঁরই কথা।

এরপর বৃন্দাবনের পথধূলিকে ধন্য ক'রে সুরু হ'ল পঞ্চকোশী পরিক্রমা। কত নীলাভ ধূসর বনলেখা মেলে দিলো তার করুণ

ছায়া, কত মুক্তালতাগুচ্ছ ছুঁয়ে গেল অলকপ্রান্ত, সজল চাওয়ায় অভিষিক্ত ক'রলো বন-হরিণের দল, নিকুঞ্জের বসন্ততীর্থে কলাপ মেললো কেকা। পরিক্রমা হ'ল শেষ। হরিদ্বার, জয়পুর, পুষ্কর প্রভৃতি তীর্থ পরম-তীর্থ হ'ল মা'র চরণস্পর্শে। ইন্দ্রধনুর বর্ণলীলায় দিক্-হারানো অলকানন্দা, লছমনঝোলার দুর্গম সেতুবক্ষে তীর্থঙ্করের দল, দিগন্তরালে শৈলশৃঙ্গের অটল স্তব্ধতা—মা'র দৃষ্টিপ্রসাদে সবই যেন হয়ে উঠলো প্রসাদ-সুন্দর। পরে বৃন্দাবন হয়ে দীর্ঘ একটি বৎসর অন্তে মা ফিরে এলেন কলকাতায় শ্রীবলরাম-মন্দিরে।

তিল তিল ক'রে জ্বালিয়ে দেওয়া যে আগুন জ্বলেছে জীবন-পদ্মে, নিত্যদিনের দুঃখকে বহন ক'রে জননী এবার যেন যোগালেন তাতে সমিধরাশি—সাধ ক'রে স্বেচ্ছায় যেন জ্বালালেন তপস্যার বৈতানিক-বহ্নি, জ্বলবার দুর্ব্বার আকাঙ্ক্ষায়। কলকাতা হতে চলে এলেন কামারপুকুরে, শ্রীঠাকুরের লীলা-বিজড়িত স্মৃতির তীর্থে —সঙ্গে ছেলে যোগেন আর সঙ্গিনী গোলাপ-মা। কিছু রেলপথে এসে, হ'ল অর্থের অনটন, তখন সুরু পদব্রজে তীর্থযাত্রা—এ যাত্রায় তো চির-অভ্যস্তা আমাদের সর্ব্বংসহা জননী—তা না হলে, ছেলে যে চলার পথ পায়না।

কামারপুকুরে মাকে দেবমন্দিরে রেখে, স্বামী যোগানন্দ পাড়ি দিলেন তীর্থের অদিশ-পথে, তপস্যার অনির্ব্বাণ আকাঙ্ক্ষায়। এদিকে তিতিক্ষার প্রতিমূর্ত্তি মায়েরও সুরু হ'ল বেদন-দহন।

রাসমণির দৌহিত্র ত্রৈলোক্যনাথ মাসে মাত্র সাতটি ক'রে টাকা দিতেন, সেটিও স্থানীয় কর্ম্মচারী-খাজাঞ্চির ঈর্ষ্যা-বিরোধিতায় হ'ল বন্ধ। খবর পৌঁছয় ঠাকুরের নরেনের কানে; ছুটে আসেন নরেন্দ্রনাথ। শত অনুরোধ জানান বীর সন্ন্যাসী নিজে: "মাত্র ঐ ক'টি টাকা, তাও তোমরা বন্ধ করবে—এ যে অতি হৃদয়হীনতা!" কিন্তু অতি প্রখর অনল এই ঈর্ষ্যানল—মানুষের সমস্ত মনুষ্যত্বকে ক'রে ফেলে ভস্মীভূত। তাই নরেন্দ্রনাথের কথা কানে তোলেনা কেউই গভীর অবজ্ঞায়। অচিরে সে-নিষ্ঠুরতা হ'ল মায়ের শ্রবণগোচর; কিন্তু

জাগলোনা কোন ক্ষোভের আভাস, কোন হতাশার গ্লানি। শুধু নির্ম্মম বৈরাগ্যে বলেন, "বন্ধ ক'রেছে, করুক। এমন ঠাকুর-ই চলে গেছেন—টাকা নিয়ে আমি কী ক'রবো!" মনে পড়ে পরম দয়িতের নির্দ্দেশ: "হরিনাম ক'রবে, শাক বুনবে আর খাবে।" সহজ রঙ্গে সেদিন যেন অতি সহজ পথের কথাই বলেছিলেন ঠাকুর, আর জননীর নয়নের ধ্রুবতারায় বুঝি অঙ্কিত হয়ে গিয়েছিল ভবিষ্যতের এই করুণ স্বাক্ষর। কিন্তু তাতে কোন চিন্তা নেই কোন ক্ষোভ নেই, জগতের সকল দুঃখের মুহূর্ত্তটিকে আনন্দের শুচিতায় বরণ ক'রে নিতেই তো এবার আসা। শুরু হ'ল শাকান্ন-ভোজন। কোনদিন বা নুনটুকুও জোটে না। শুধু অন্ন। তবু এ দুঃখ মনে হয়না দুঃখ। অসহ ব্যথা হয়ে বাজে শুধু শ্রীঠাকুরের অদর্শন। দীর্ঘদিনের সীমায় এক-একটি নিঃসঙ্গ সন্ধ্যার মতো মনে হয় বিরহ-বিধুর হৃদয়টিকে। শূন্য-কুঞ্জে এখন শুধু ঝরা-ফুলের পালা! তবু চাওয়া—চিরন্তন চাওয়া। সেই হালদার-তাল, সেই হিজল-ঝরা পথপ্রান্ত, ঘাসফুলের আলপনা-আঁকা গৃহাঙ্গন! শুধু হারিয়ে গেছে নূপুর-নিঝুম দুই চরণের ছন্দ, তার পলাতকা ছায়ায় কেঁপে মরছে সন্ধ্যার প্রদীপ আর ভোরের শুকতারা। কিন্তু শুধুই কি বিরহ! একটু পাওয়া না হলে, চাওয়া মধুর হবে কেমন ক'রে? এক এক দিন অশ্রুসলিলে ভেসে যায় বক্ষ, মিলন-রিক্ত দুটি আঁখি অসহ আবেগে বলে: "ওগো, একটিবার দেখা দাও!" চকিতে অরূপ আলোয় ভ'রে ওঠে গৃহকোণ, আর শ্যামার মেয়ের অতৃপ্ত নয়নের সামনে দাঁড়ান দয়িত গদাধর। এমনি লুকোচুরির আসা-যাওয়া ঘটে মাঝে মাঝে। কোনদিন শিশুসুন্দর বেশে এসে আবদার ধরেন ঠাকুর, খিচুড়ি রেঁধে দেবার জন্য; পরম পরিতৃপ্তির আনন্দে জননী ঠাকুরের সে আবদার করেন পূরণ। কোনদিন বা বলেন কত গভীর উপদেশের কথা।

মধুহীন মধুপের অবশ ডানায় দিন চলে কেটে। মনে পড়ে এদিনের কথায়, নীড়-বিরাগী কবি শেলির 'ভালবাসার বিষাদময়

পরিতৃপ্তি'র কথা। যে পরিতৃপ্তির নিবিড়তা বোঝে শুধু মরমী বিরহী—বাস্তবতার নির্ম্মম দৃষ্টি সেখানে অন্ধ। জননীর হাতে দয়িতের শেষ স্মরণিকা কনক-কঙ্কণ-ছুটি সেদিন হয়ে ওঠে পাড়ার লোকের সমালোচনার বিষয়। সংস্কারের জটিলতায় তারা কিছুতেই খুঁজে পায়না পথ। অসহ মন্তব্যে নিরুপায় জননী অবশেষে দৃঢ় সঙ্কল্পেই খুলে ফেলেন সেই স্মৃতির স্বর্ণসোহাগ। কিন্তু আবার এলো বাধা। তবে এবাব সে-বাধা এলো অন্যভাবে। বলতে গিয়ে কথা হয় রূপকথা। গঙ্গাহীন দেশের মেয়ে আমাদের সারদালক্ষ্মী, তবু হরিচরণচ্যুত জাহ্নবীর প্রতি একটা অনির্ব্বচনীয় আকর্ষণ, এ যেন তাঁর দৈব সংস্কারেরই পরিচায়ক। কত আনমনা দ্বিপ্রহরে অগম দূরেব স্বরধুনীর স্মৃতি দু'চোখে ওঠে উথলে; কত প্রদোষের আগুন-মেঘের পানে চেয়ে, মনে পড়ে বকুলতলার রক্তসন্ধ্যা—মুছে-যাওয়া দুটি অলক্তক-রেখায় আজো বুঝি সে এঁকে দেয় ঝরা-বকুলের চুম্বন। মনে পড়ে, অস্ত-তারার আলোয়—তার ঢেউয়ে অঙ্গ-জুড়োনো স্নান-অভিষেক। গভীর রাতের স্বপ্নে আজো যেন ভেসে আসে সেই গঙ্গাজলী হাওয়া। প্রোষিত-বধূর একটানা বিরহের দিনে দূর থেকে সে দেয় হাতছানি। শ্যামার মেয়ের বিরহ-জ্বালা যেন দ্বিগুণ ওঠে বেড়ে; মনে জেগে ওঠে সাধ—যাই একবার গঙ্গাস্নানে জুড়িয়ে আসি সব জ্বালা, অন্তহীন বিরহে যদি মেলে কূল। সহসা এক অপরূপ দর্শন—কোথায় যেন বাজে ভগীরথের সপ্তশঙ্খ; চেয়ে দেখেন জননী—সম্মুখের পথ বেয়ে আসছেন শ্রীঠাকুর, করুণা-বিগলিত শ্রীগদাধরচন্দ্র—ভরা চাঁদের জ্যোৎস্না নিঃশেষে লীন হয়ে গেছে সে-রূপে। পিছনে অন্তরঙ্গ আর অগণিত ভক্তের মেলা—শ্রীঠাকুব আসছেন, পদ্মরাগ-শ্রীচরণে ঝলকে-ঝলকে উৎসারিত হচ্ছে জাহ্নবীর গলিত রজতধারা—অনুরাগে উদ্বেলিতা, হরিচরণচ্যুতা জাহ্নবীর হরিচরণ-রাগে সে এক অপূর্ব্ব শোভা; আলোর অলকানন্দা যেন কূল হারিয়ে অকূল-উচ্ছল। সেই অকূলপাথার ঢেউয়ে পথের ধুলা গেছে ঢেকে। আত্মহারা

জননী সারদা মিলন-মেত্বর দুটি নয়ন নিবিড় ক'রে ধরে রাখেন দেবতার পানে, তারপর আকুল আবেগে ছুটে যান গৃহকোণে; তুলে আনেন অঞ্জলি-ভরা কুসুম-স্তবক, আর মুঠো-মুঠো ছড়িয়ে দেন চরণ-গঙ্গার আনন্দ-বন্যায়। পরবর্তী কালে ভক্তসকাশে শুনি শ্রীমুখোক্তিঃ "আমি ভাবলুম, দেখছি ইনিই তো সব। এঁর পাদ-পদ্ম থেকেই তো গঙ্গা। আমি তাড়াতাড়ি রঘুবীরের ঘরের পাশের জবাগাছ থেকে মুঠো-মুঠো ফুল ছিঁড়ে গঙ্গায় দিতে লাগলুম।"

শ্রীচরণ-গঙ্গায় বুঝি ভেসে যায় লোকসমাজ, ভেসে যায় লোকনিন্দা। যে আকুল ধারায় যুগে যুগে ভেসে গেছে কূল, ভেসে গেছে লাজ-মান-ভয়—না, না, সে তো হারায়নি, দূর থেকে ক'রছে শুধু বিরহের পরীক্ষা। এরপর ভক্তদল সবিস্ময়ে দেখেন জননী সারদা চির-সতীলক্ষ্মীর চিহ্ন কনক-কঙ্কণ আবার করেছেন ধারণ, আর অঙ্গাবরণেও শোভা পাচ্ছে সরু লালপাড় কাপড়—চির-আয়তির চিহ্ন, রুচির শোভন।
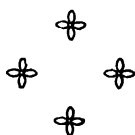
দিন যায়—দিগন্ত-বিসারী শূন্যতার মাঝে কতকগুলি আলোছায়ার স্মৃতিপট ছড়িয়ে রেখে। এইবার বুঝি ছেলেদের মনে পড়ে, ধুলার দেউলে পড়ে-থাকা জননীর কথা। মনে পড়ে, না জানি কত দুঃখে গেছে জননীর এক-একটি দীর্ঘ দিন, দীর্ঘ রাত। ব্যথায় টনটন ক'রে ওঠে বুকঃ একি ভুল করেছে তারা! কালক্ষেপ না ক'রে, কয়েকজন সন্তান জননীকে সাদর আহ্বান জানিয়ে, নিয়ে আসেন কলকাতায়। তখনও নীড়-বিরাগী তরুণ বৈরাগীর দল ছড়ানো ফুলের মতোই ছড়িয়ে আছে এদিক-ওদিক, বন্ধনহীন একান্ত উদাস। মা-ও তাই কখনও বলরাম-মন্দিরে বা কখনও ভক্ত

শ্রীমাস্টারমহাশয়ের বাড়িতে, না হলে, ভাড়া-বাড়িতে থাকছেন অস্থায়িভাবে। এই সময়ে মা'র স্মরণপথে জেগে ওঠে শ্রীঠাকুরের একটি নির্দ্দেশ—জননী চন্দ্রার দেহান্তে শ্রীগদাধরের পাদপদ্মে পিণ্ডদান দেবার ভার দিয়েছিলেন ঠাকুর জননীরই উপর। সেই নির্দ্দেশ পালন করতে স্বামী অদ্বৈতানন্দ, যিনি ঠাকুরের স্নেহের সম্বোধনে বুড়োগোপাল নামে পরিচিত, তাঁরি সঙ্গে মা শুভাগমন ক'রলেন শ্রীশ্রীগয়াধামে।

সেখানে শ্রীগদাধর-চরণচিহ্নে চন্দ্রাদেবীর পিণ্ডদান-কার্য্য সমাধা ক'রে যাত্রা করেন বোধগয়ায়। নিরঞ্জনার সিকতা-বক্ষে ফল্গুর উচ্ছ্বাস যেন জেগে ওঠে, দিক্-বিস্মৃত বিহারগুলি যেন নির্ব্বাণকল্প মহাস্থবিরের প্রতীক; তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে জন্মজন্মান্তরের জাতক-স্মৃতি হয়ে ওঠে মূর্ত্ত। বোধগয়ায় এসে শ্রীবোধিসত্ত্বের স্মৃতি-তীর্থ মঠ-দর্শনে, তার ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত অপূর্ব্ব-শ্রী-দর্শনে মনে পড়ে মা'র আপন পথচারী সন্তানদলের কথা; বুক ওঠে ব্যথিয়ে, নয়ন হয়ে ওঠে অশ্রুসিক্ত। হায়, তাঁর সন্তানরা যে তখন অর্দ্ধাশন-অনশনে ফিরছে আশ্রয়হারা পথে-পথান্তরে; কখনো গোপন গিরিগুহায়, কখনো তরুতলে, ভূতল-নিবাসে, নির্জ্জন নির্ঝরিণীর উপল-শয্যায় কাটছে তাদের কঠোর তপস্যাভরা দিনগুলি। নাড়ীর টানে মায়ের মায়ায় ছুটে যাঁর আসা, আপনভোলা ছেলের জন্য, তাঁর করুণ নয়ন যে নিত্য সজল। চোখের অশ্রু আর বাধা মানে না, আকুল কান্নায় একটি অকুণ্ঠ আকূতি জাগে বুক নিঙড়েঃ "হায় ঠাকুর, তোমার ছেলেরা ঘুরবে পথে পথে, পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে আশ্রয় নেবার মতো একটি ঠাঁইও তাদের মিলবে না, ঠাকুর!" সে প্রার্থনা হয়েছিল সফল। পরে বলেছেন, "ঠাকুরের ইচ্ছায় মঠটি হ'ল।" আজ রামকৃষ্ণ-কল্পতরু অগণিত পথচারীদের কলগুঞ্জনে নিত্য মুখরিত।

বোধগয়া হতে বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর বাটীতে হ'ল মা'র স্বল্পকাল-স্থিতি। সেখানে সারদাগৌরীর দিন কাটে কঠোর তপশ্চর্য্যায়। শিবব্রতধারিণী মহেশ্বরীর তপসঙ্গিনী হন জয়া-বিজয়ার মতো

যোগীন-মা, গোলাপ-মা। অলস-নিমীল শিশির-সন্ধ্যা—একলা তারা পুবের পানে চেয়ে রয়েছে অক্লান্ত জাগরণে। শিব-মগ্না শিবানী। এমনি কোন গভীর মুহূর্ত্তে সমাধি-ভঙ্গে ব'লে ওঠেন অস্ফুট স্বরে, "ও যোগীন, আমার হাত কই, আমার পা কই?" ত্রস্ত বিস্ময়ে সঙ্গিনী বলেন, "সেকি মা! এই তো। এই তো তোমার হাত, এই তো তোমার পা। বুঝতে পারছ না?" মিলন-তীর্থে ভেসে-চলা একফালি চাঁদ শুধু হেসে ওঠে দিগ্বলয়ে, আর সঙ্গিনীর শত প্রচেষ্টায় জননীর দিব্য দেহে মন ফিরে এলেও, সে দিব্য আবেশের ঘোর যেন কেটেও কাটতে চায় না। সে ভাবের আকুল আবেশ জড়িয়ে থাকে তন্নমনে সর্ব্বক্ষণ, একাধিক দিবস ধ'রে। কখনও দেখেন যেন নানা বর্ণের জ্যোতিতে ঘিরে আছে হেমনিন্দিত দেবতনু, যেন সর্ব্বদেবতার আলোর আরতিতে গড়া হৈমবতী।

* * *

দেখতে দেখতে ঘনিয়ে আসে শীর্ণ পর্ণের দিন—অবাক মাটীর চোখে শান্ত বিষণ্নতা। কুহেলি-করুণ শীতার্ত্ত অগ্রহায়ণে আবার তীর্থের পথে দেখি জননীকে, ভক্তসঙ্গে চলেছেন পুরীর দিকে। শ্রীজগন্নাথক্ষেত্রের পথ তখন দুরতিক্রম দুর্গম। তখনও রেলপথ হয়নি। কিছুদূর স্টীমারে যাত্রা ক'রে, বাকী পথ অতিক্রম করতে হ'ল গো-যানে। তুষ্ণীক আকাশের নীচে ধূমেল ধূসর প্রকৃতির স্তিমিত সৌন্দর্য্য। উধাও দিশেহারা পথ দিগ্বলয়ে বিলীন। তুষার-সিক্ত বাতাস আর তন্দ্রা-ছড়ানো জটিল অন্ধকার পার হয়ে চলেছে গাড়ি—শীর্ণ পাতার মর্ম্মরে আর্ত্তনাদ ক'রে উঠছে বনতল, ধ্রুবতারার চোখে পথ-চেনার আলো। গাড়ি চলেছে এগিয়ে। আজীবন মাতৃসেবক সারদা-সন্তান—সারদা-মহারাজ সে-রথের সারথি। সারাটি রাত গাড়ি হাঁকিয়ে, নিশান্তের প্রথম আলোয় তিনি জননীকে পৌঁছে দিলেন শততীর্থের লীলাভূমি, ভারতের অন্যতম তীর্থে শ্রীশ্রীপুরীধামে। উষার প্রথম আলোয় দর্শন হ'ল নীলাদ্রিনাথের

শ্রীবিগ্রহ, আর সাগরতীর্থের দুয়ার খুলে সপ্তাশ্বের প্রথম প্রণাম এলো প্রভাত-গায়ত্রীর চরণে। এখানে ভক্ত বলরামের ক্ষেত্রবাসীর মঠখানি হ'ল জননীর কিছুদিনের বাসভবন।

দিন যায়—সিকতার অনন্ত বিন্দুগুলির প্রহর নিয়ে মহাকাল করেন খেলা। কখনও তারার ফুল ফোটে আঁধার-উদধির বুকে; কখনও ভরা চাঁদের জ্যোৎস্নায় রচিত হয় শেষনাগের স্বপ্নশয্যা, আর প্রভাত-সন্ধ্যার মিলন-সঙ্গমে প্রতিদিন সাগর-দুহিতার দুটি আলতো চরণের ছন্দে প্রতিটি ঝিনুকের পাতায় ফুটে ওঠে মুক্তালিপি—অপূর্ব্ব দর্শনে সজল হয়ে ওঠে জননীর ভাবনেত্র। শ্রীক্ষেত্র দর্শন ক'রে মুক্তিদাত্রী আনন্দাশ্রু করেছেন বর্ষণ, শত শত সন্তানের মুক্তির কল্পনায় বলেছেন, "যখন রথের সময় পুরীতে জগন্নাথ দর্শন করি, এত লোক জগন্নাথ দর্শন করছে দেখে আনন্দে কাঁদলুম—ভাবলুম, আহা বেশ, এত লোক মুক্ত হবে।" পরক্ষণেই বুঝি দিব্য দৃষ্টি ছুটে যায়, সেই দর্শন-ব্যাকুল তীর্থযাত্রীদের গভীর মানস-রাজ্যে যেখানে স্তরে স্তরে জমে আছে বাসনার গহিন আঁধার, মুক্তির আলো সেখানে তো প্রবেশপথ পায়না খুঁজে। তাই বলেন, "শেষে দেখি যে—না, যারা বাসনা-শূন্য সেই এক-আধটিই মুক্ত হবে।" শ্রীজগন্নাথকে দেখেন যেন শিবস্বয়ম্ভু—লক্ষ শালগ্রামের বেদীর উপর উপবিষ্ট হিমধবলকান্তি দেবাদিদেব। বলেন ভক্তদের, "জগন্নাথকে দেখলুম যেন পুরুষসিংহ—রত্নবেদীতে বসে আছেন। আর আমি দাসী হয়ে তাঁর সেবা ক'রছি।" যেন রূপময়ী কমলার রম্যরূপ। পুরুষোত্তমের চরণ-নন্দিতা জননীর এ-রূপ তো নিত্যলোকের রূপ। এখানে প্রকাশিত হয় আর-এক আকুল-করা ভাববিলাস। দেখেন ভক্তদল—জগন্নাথের দেবায়তনে বিগ্রহ-দর্শনার্থে বক্ষাঞ্চলে ঢেকে নিয়ে এসেছেন শ্রীঠাকুরের দিব্য প্রতিকৃতি। শ্রীঠাকুরের সর্ব্বতীর্থ-দর্শন হয়েছিল, বাকী ছিল শ্রীজগন্নাথ আর গয়া। তাই জননী নিয়ে এসেছেন দেবদয়িতের চিত্রখানি বিগ্রহ-দর্শনার্থে। "ঘট-পট-ছায়া-কায়া সমান কিনা"। দেব-মানব-ভাবের অপূর্ব্ব সম্মিলন!

চারটি মাস শ্রীক্ষেত্রে দেবদর্শনে অতিবাহিত ক'রে, মা অন্তরঙ্গ সন্তান সাথে ফিরে এলেন কলকাতায়। সেখান থেকে আবার শ্রীঠাকুরের লীলাতীর্থ কামারপুকুরে। এ ধামে সুদীর্ঘ একটি বৎসর কাটিয়ে, এলেন ভক্ত-বলরাম-মন্দিরে। এই বৎসরেই বৈশাখের প্রথম দিবসে মা'র শ্রীচরণপ্রান্তে মাথা রেখে ভক্ত বলরাম বিদায় নিলেন ধুলার ধরণী থেকে—শ্রীরামকৃষ্ণলোকের মহাপ্রস্থানে। শ্রীঠাকুরের ভক্ত রসদদার বলরাম—সে যে একান্ত কৃপার পাত্র। মনে পড়ে, একটি পিছনে-পড়ে-থাকা দিন, শ্রীঠাকুর তখন দেহে। ভক্ত বলরামের সহধর্ম্মিণী অসুস্থা। ঠাকুর চির-অবগুণ্ঠিতা জননীকে করেন আদেশ, "যাও, দেখে এসোগে।" ভীরু লজ্জায় ব্যাকুল দুটি আঁখি তুলে মা বলেন, "কেমন ক'রে যাব, পায়ে হেঁটে?" শ্রীঠাকুরের কণ্ঠে জাগে—ভক্তের প্রতি গভীর দরদ-ভরা বাণী: "আমার বলরামের সংসার ভেঙে যাচ্ছে, আর তুমি যাবে না! হেঁটে যাবে। হেঁটে যাও।" সেবার পালকি পাওয়া গেলেও, শ্যামপুকুরে অবস্থানকালে তিনি আবার যখন অসুস্থ হন, তখন জননী সকল দ্বিধার আড়াল ঠেলে, ছুটে এসেছিলেন ভক্ত মেয়ের রোগশয্যায়। সেই বলরাম চলে গেল সংসার ভাসিয়ে, না, মা'র চরণ-কূলে তুলে দিয়ে? তার সাক্ষী মহামায়া স্বয়ং।

ভক্ত-ভবনে সেদিন সন্ধ্যায় মা অন্তরঙ্গ-সঙ্গে ধ্যানমগ্না। সে-ধ্যানের পরিণতি হয় সুগভীর সমাধিতে। সে-সমাধি যেন আলোর দেশে ব্রজবধূর রূপাভিসার। সেখানে স্বরূপ হয় দর্শন—নিজেকে দেখেন যেন অপরূপ রূপময়ী। মঞ্জুল বনজ্যোৎস্নার রূপোলী-আবেশ-জড়ানো তনুর তনিমা—বৃন্দারণ্যের সেই বাঁশরী-কাঁদানো মুখ, যে মুখের তরে চাঁদ হয়ে যায় রাত-বিরাগী। তারপর ঐ তো তার পরম-দয়িত গদাধরসুন্দর! আনন্দের উশ্রী-ভাঙা সেই হাসি! আলোর বাসরে আলোয় আলোময় হয়ে আছেন বসে। নূপুরিত পায়ে কারা যেন এসে জানালো জননীকে আনন্দ-অভিনন্দন। তারপর পরম সোহাগে আদরিণী মেয়ের মতো বসালো তাঁকে

গদাধরসুন্দরের পাশে। জননী বলেন, "সে যে কী আনন্দ, বলতে পারিনি ; একটু হুঁশ হতে দেখি, শরীরটা পড়ে রয়েছে। তখন ভাবছি, কী ক'রে এই শরীরটার ভেতর ঢুকবো ? ওটাতে আবার ঢুকতে মোটেই ইচ্ছা হচ্ছিল না। অনেক পরে তবে ওটাতে ঢুকতে পারলুম ও দেহে হুঁশ এলো।"

এর পরে জ্যৈষ্ঠ মাসে বেলুড়ে ঘুসুড়ির বাড়িতে হয় মা'র শুভ অবস্থান। জননীর বিশ্বজয়ী সন্তান বিবেকানন্দ এইখানে একদিন হলেন প্রসাদ-ধন্য। পরিব্রাজকের বেশে তিনি চলেছেন দূর পাশ্চাত্ত্যে জয়যাত্রায়, তাই এসেছেন ভারতলক্ষ্মীর অগ্নিমন্ত্রটি অনুপ্রবিষ্ট ক'রে নিতে অন্তরের অন্তরলোকে। বিদায়ের আগে মা'র চরণে অঞ্জলি দিয়ে গেলেন তাঁর সুমধুর আত্মভোলা কণ্ঠের সঙ্গীত-অর্ঘ্য, আর পাথেয় নিলেন মায়ের আনন্দ-অশ্রুল আশিস্-বাণী। সপ্তসিন্ধুর তীর সেদিন সূর্য্যসম্ভাবনায় হয়ে উঠেছিল উন্মুখ।

কিছুদিন পরে এখান থেকেও মা সারদাকে সরে যেতে হয় বরানগরে—সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের ভাড়া-বাটীতে। দেবদেহ তখন অসুস্থ। সেখানে সেদিন ঘটলো এক অপূর্ব্ব লীলা—ভক্তবর গিরিশের সেদিন প্রথম মাতৃচরণ-দর্শন। কম্পিত-কলেবর গিরিশ অশ্রুসজল নেত্রে মাতৃচরণে হয়েছেন সাষ্টাঙ্গ প্রণত—যেন মহামায়ার চরণতলে সুরাসুর-সংগ্রামের শেষ প্রণাম। নিকটে তিন বৎসরের মূক শিশুপুত্র। ভক্তিতে ভাববিহ্বলতায় জড়িত কণ্ঠে বলেন গিরিশ, "মা গো! এই ছেলের জন্যই আজ অভাগার ভাগ্যে ঘটলো শ্রীচরণ-দুটির দর্শন।" সৌম্য রুচির একটি আলোর স্নিগ্ধতায় ভরে উঠলো প্রসন্নময়ীর শ্রীমুখ।

এই পুত্রটির জীবনের আছে একটি ক্ষুদ্র ইতিহাস—জানিনা তা কতখানি সত্য। গিরিশচন্দ্র একদিন প্রভু-সকাশে জানান সকরুণ আবেদন: "দাও বর, ভগবান, তোমায় যেন আমি পাই আমার পুত্ররূপে। তোমাকে আবার আসতে হবে ফিরে, আমি যে চাই তোমাকে আরো আপন ক'রে পেতে—প্রাণ ভ'রে সেবা ক'রতে।"

ঠাকুর হন না রাজী ; পরে যেন হয়ে যান মৌনগম্ভীর। কিন্তু লীলা-বসানের কিছু পরেই গিরিশচন্দ্র লাভ করেন এই দিব্য পুত্ররত্নটিকে, আর পাঁচ-সিকা পাঁচ-আনা বিশ্বাস নিয়েই করেন তার সেবা। কিন্তু মাত্র চারটি বৎসরেই শিশু শেষ করে ধরণীর লীলা। সেই শিশুরত্নই সেদিন গিরিশচন্দ্রের মাতৃদর্শনের উপলক্ষ্য। মায়ের শ্রীমুখে শুনি : "সেই ছেলে কেবল কাপড় ধ'রে টানে আর ওপরদিকে আঙুল দেখায়।" তারি ব্যাকুল ইশারায় আবদারে গিরিশচন্দ্র না এসে পারেন না। কি জানি, শিশুরূপে কে দু'দিনের লীলা ক'রে গেলেন দিব্য চেতনাটুকু নিয়ে—ভক্ত না ভগবান ?

১৩০০ সালের কথা। পথিক-সময় পার হয়ে এসেছে অনেক বেদন-বন্ধুর পথ। তখন জননী নীলাম্বরবাবুর ভাড়াটিয়া বাড়িতে—বেলুড়ে। সুরধুনীর শ্যাম তীরেই মা'র এই বাসভবনটি। সেদিন আকাশের রামধনু-ছোঁয়া-বর্ণ চত্বর ছায়া কাঁপছে সুরধুনীর ঢেউয়ে। ওপারের ভাঙা চরে উধাও-দিনের ডাক। ঠিক এমনি একটি দুকূল-হারা লগ্নেই হ'ল মার এক অপূর্ব্ব দর্শন—জোয়ার-ভাঙা জাহ্নবীর গৈরিক বন্যায় যেন চকিত দর্শন দিয়ে নেমে গেলেন শ্রীঠাকুর, আর সঙ্গে সঙ্গে কনককান্ত-নন্দিত তনু স্বর্ণপ্লাবনে গলিত হয়ে, হয়ে গেল একাকার। সেই রূপ-মন্থিত আকাশ-বাতাস যেন মূর্চ্ছিত হয়ে উঠলো মা'র দুটি নয়ন-পল্লবে। তারপর কোথা হতে এসে দাঁড়ালেন সপ্তলোকের ঋষি নরেন্দ্রনাথ—বীর সন্ন্যাসীর কম্বুকণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠলো : 'জয় রামকৃষ্ণ', 'জয় রামকৃষ্ণ', 'জয় রামকৃষ্ণ'! সঙ্গে সঙ্গে অঞ্জলি ভ'রে সেই মুক্তির মুক্তধারা ছড়িয়ে দিলেন চতুর্দ্দিকে, আর সেই পুণ্য-সলিল-নিষেকে অসংখ্য মুক্তিকামী মানব যেন সদ্যমুক্তির আনন্দে চলে গেল অমৃতলোকের দিকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-অমৃত বিলিয়ে দেবার ভার যে ছিল তাঁর ওপর, সপ্ত-লোকের ঋষি তাইতো নেমে এসেছিলেন সাত-সায়র-সেঁচা সমাধির সুখ ছেড়ে। কিন্তু এই অপরূপ দিব্যদর্শনে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে ওঠে মা'র মন—রাঙা চরণ আর চলেনা গঙ্গার বুকে। এ তো শুধু গঙ্গা

নয়, এ যে হরির শ্রীঅঙ্গ-সঙ্গায় হয়েছে হরিময়! বিগলিত গদাধরের এ যে রূপ-জাহ্নবী।

সেদিন এলেন ভক্তচূড়ামণি শ্রীনাগমহাশয়—দীনাবতারের দীন ভক্ত, দীনতার মূর্ত্ত আদর্শ। শোনা যায়, দর্শনের পূর্ব্বে সারাটি ক্ষণ শুধু বালকের মতো অশ্রুসরস কণ্ঠে 'মা' 'মা' ব'লে ডেকেছিলেন। সেদিন মাতৃচরণে নিবেদন করতে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন কিছু মিষ্টান্ন আর সরু লালপাড় ধুতি। নাগমহাশয়ের ছোট্ট তরণীখানি যখন এসে লাগলো 'উদ্বোধন'-এর ঘাটে, তখন আকাশের শূন্যচরে বেলা থম্‌কে দাঁড়িয়েছে। মায়েব চরণ-চিহ্নিত তীর্থবাটে এসেই ভক্ত-চরণ ধুলায় যেন পড়ে না—ভাববেপথু শীর্ণ দেহ যেন হয়ে পড়ে আবেশে অক্ষম। যেন একান্ত মা'র কোলের শিশু! মুখের সব কথা যায় হারিয়ে, আবেগে বাষ্পাচ্ছন্ন কণ্ঠে শুধ 'জয় মা' 'জয় মা'! নয়ন অশ্রু-অন্ধ—চলবে কে?

ছুটে আসেন স্বামী প্রেমানন্দ—ঠাকুরের দরদী বাবুরাম; আবেশে অবশ দেহখানি তুলে ধ'রে নিয়ে আসেন জননীর দেউলতটে, তখনও মা শ্রদ্ধার পাষাণ-দেউলের মা, ভক্ত ছেলেবা দূর হতেই জানায় তাঁর চরণে প্রণাম। নাগমহাশয়ও সে-নিয়মের করলেন না ব্যতিক্রম। দেউল-সোপানে সুরু করলেন মাথা খুঁড়তে। "আহা, নাগমশায় করেন কি, করেন কি!"—ছুটে আসেন উদ্বেগ-আকুল সন্ন্যাসীর দল। কিন্তু কে শুনবে কার কথা? একটিবার হয়তো প্রেমার্ত্ত চোখ-দুটি তুলে, আবার তীব্র আঘাতে জর্জ্জরিত ক'রে তোলেন নিজের মাথা; চরণধুলায় ধুসর ক'রে দিতে আকুল অহং-এর ক্ষীণ আবরণটিকে। কপোল-ভাঙা অশ্রুর সঙ্গে কপালের রক্তধারা মিশে এক হয়ে যায়, রঞ্জিত ক'রে তোলে মাটী। বাধা দিতে ক্রুটী করেন না কেউই। কিন্তু নির্ব্বাক হয়ে যান সন্ন্যাসীর দল—ভাবোন্মাদকে নিরস্ত করবে কে? ছুটে আসে মন্দিরের দাসী মা'র কাছে: "মা, নাগমশায় কে? তিনি প্রণাম করছেন, কিন্তু মাথা এত জোরে ঠুকছেন—মনে হয়, রক্ত

বেরুচ্ছে। পাগল নাকি, মা ?” দাসী বলেছিল ঠিকই, ভাবোন্মত্ত নাগমহাশয়কে বাইরের দৃষ্টিতে উন্মাদই মনে হ'ত। দাসীর কথা শুনে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন মা : “ওগো, শরৎকে বলো, এখানে পাঠিয়ে দিতে।” ধ'রে ধ'রে আনেন শরৎমহারাজ। সে এক অদ্ভুত রূপ, সে রূপের বর্ণনাখানি দেন মা নিজেই : “শরৎ নিজেই ধ'রে নিয়ে এলো ; দেখি, কপাল ফুলে গেছে, চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে ; হেথায় পা ফেলতে হোথায় পড়ে, হোথায় পা ফেলতে হেথায় পড়ে। চোখের জলে আমায় দেখতে পাচ্ছে না। আমি ধ'রে বসালুম। কেবল 'মা' 'মা' শব্দ—যেন পাগল, অথচ শান্ত ধীর স্থির।” কী মধুর দৃশ্য ! আপনহারা ছেলে পেয়েছে মায়ের বুক-জুড়ানো কোল। মা'র সোহাগে গরগর। নাগমহাশয়ের সেকি আকুলতা ! সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতের সঙ্গে অজস্র প্রেমাশ্রুধারে জননীর চরণকমল হয়ে ওঠে শিশির-সিক্ত। সযত্নে তুলে বসান মা, মুছিয়ে দেন স্নেহাঞ্চলে সন্তানের অশ্রুরাশি। এদিকে নিবেদনের বস্তুগুলি বুঝি আর হয়না বিধিমতো নিবেদন করা। সকল বিধির পারে যে ঠাঁই, সেখানে বিধিই যে হয় বন্ধন, তাই নাগমহাশয়ের সযত্নে-আনা মিষ্টি মা স্বয়ং করেন গ্রহণ আর সোহাগ-ভরে তুলে-তুলে প্রসাদ দেন ভাবপাগল ছেলের মুখে। সে এক আরো অপরূপ দৃশ্য। জানিনা কোন্ অলকার সোহাগ-নির্ঝরে আছে মাটির মায়ের এত সুষমা ! আপনহারা ছেলে, আর আরো আপনহারা মা !

মায়ের আদরে নাগমহাশয়ের সে ভাবঘোর আর ভাঙে না। আনন্দে আত্মহারা। খেতে আর পারেন না, শুধু বিহ্বল চোখে মায়ের শ্রীচরণ-দুটিতে হাত দিয়ে বসে আছেন, আর বলছেন, “বাপের চেয়ে মা দয়াল, বাপের চেয়ে মা দয়াল।” মা দিলেন একখানি কাপড়—আকুল আবেগে নাগমহাশয় জড়িয়ে নেন মাথায়, আনন্দে কী যে করবেন যেন ভেবেই পান না। সেদিনকার মতো বহুক্ষণ পরে সেই আধোভাঙা ভাবাবেশেই বিদায়গ্রহণ করেন মা'র পাগল ছেলে। সেদিনকার মতো সারা হয় বাৎসল্যের মিলন-জয়ন্তী।

নাগমহাশয় বিদায়-মুখে শুধু ব'লে গেলেন তাঁর সারা জীবনের সাধনবাণী : "নাহং নাহং, তুঁহু তুঁহু—আমি কিছু নই, মা—আমি কিছু নই, সব তুমি"—অতি অপরূপ! এই দীনবেশধারী মহাপুরুষের কথায় জননীর শ্রীমুখে শুনি : "কত ভক্তই তো আসছে, এমনটি আর দেখিনি।"

কোনদিন বা এসেছেন নাগমহাশয় আমের টুকরি মাথায় নিয়ে, কিনা, মাকে নিজে বসে খাওয়াবেন। অথচ বলবেন না কিছু মুখে। বলবেই বা কে? ভক্তির চরম অবস্থা, সেই ভাবতন্ময়তায় চির-প্রতিষ্ঠিত নাগমহাশয়ের বাহ্যজ্ঞান অধিকাংশ সময়েই থাকতোনা বললেই চলে। তারপর মাতৃনামে, ঠাকুরের নামে, দর্শনে আরো যেন হয়ে পড়তেন আপনহাবা; জলভরা প্রেমচক্ষু-দুটি দেখলে বোঝা যেত প্রেমের ঠাকুরেব প্রেমিক ভক্তই বটেন। মা'র কথায় : "আহা, কী প্রেমচক্ষুই ছিল তার—রক্তাভ চোখ, সর্ব্বদাই জল পড়তো।" সেদিন এসে আকুল হয়ে শুধু ঘুরছেন মৌন নির্ব্বাক হয়ে। মা'র কথায়, যেন 'কাঙাল হয়ে' ঘুরছেন। কারো কথার কোন উত্তর আর দেন না, শুধু উদ্‌ভ্রান্ত অশ্রুতে ভেসে যাচ্ছে মুখ-বুক। অবশেষে আসে মা'র আহ্বান। নাগমহাশয়কে পাঠিয়ে দেবার আদেশ দেন মা সারদানন্দ-মহারাজকে। তখন তো একেবারে বিহ্বল, নয়নে অবিশ্রান্ত অশ্রু, আর মুখে আকাশ-ফাটা 'মা' 'মা'! ঠাকুরের ভোগ দেওয়া হ'ল সেই আম, মা-ও নিলেন পাগল ছেলের নৈবেদ্য। পরের ঘটনা শুনি মা'র মুখে : "পাতা দেওয়া হলে, পাত থেকে প্রসাদ উঠিয়ে বললুম—খাও। কে খাবে! তার শরীরে হুঁশ নেই, হাত যেন অবশ। আমি ধ'রে বলতে বলতে, খেলে তো নাই, একখানা আম নিয়ে মাথায় ঘষতে লাগলো। আমি শরৎকে ব'লে পাঠাতেই, সে লোক পাঠিয়ে নিয়ে গেল। প্রণাম করতে করতে কপাল ফুলিয়ে দিলে, অন্নপ্রসাদ আর নিলে না। কিছু বাদে হুঁশ হতেই নাকি চলে গেছে, খবর পেলাম।"

❖
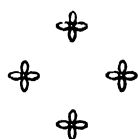
ভক্তের চোখের জলে ভেজে কমল-চরণ, কিন্তু বুকের জ্বালা? সে তো নিভতে চায়না কোনমতে। সে জ্বালা যে তুষের আগুন—আগুনে-মেঘের মতো জ্বালিয়ে দেয় সাগর-সন্ধ্যাকেও। দিনান্তের অনির্ব্বাণ তৃষ্ণার কোথায় শেষ, কে জানে! শ্রীরামকৃষ্ণ-বিরহব্যাকুলা মা আমার, বিরহ-হুতাশ বুকে নিয়ে তাই বুঝি ফেরেন তীর্থের পথে-পথেই একান্ত উদাসীন। কিন্তু হায়, একটি হাসির মূলে কিনে নিয়ে, কান্নার মূলে বিকিয়ে দেওয়াই যে নিঠুরের রীতি! তাই বুকের জ্বালা আর নেভে না, উধাও চাতকের চোখে সপ্তসাগর যেন মৃগতৃষ্ণিকার ছায়া। মা'র সে-জ্বালা যেন বোঝেন মেয়ে যোগীন। তাঁরও জ্বালা তো কম নয়, তাই মাকে দেন পরামর্শ: "মা, চলো আমরা পঞ্চতপা করি, তবেই মনের আগুন নিভবে।"

জননীর স্মৃতিপটে যেন ভেসে ওঠে কিছুদিন পূর্ব্বের একটি দর্শন-স্মৃতি। কিশোরী এক সন্ন্যাসিনী—গৈরিক বর্ণে রঞ্জিত অঙ্গাবরণ, রুক্ষ এলায়িত কেশপাশ, কণ্ঠে দোদুল্যমান রুদ্রাক্ষের মালা—কুমারী যোগেশ্বরী মূর্ত্তি—সাথে সাথে ফিরছে ছু'চোখে মৌন ইঙ্গিতের তড়িৎ-শিখা। চকিতে মা'র দিব্য চেতনসত্তায় ওঠে একটি গভীর বাণী 'পঞ্চতপা'। আজন্ম সরলা মা সারদেশ্বরী জেনেও যেন জানেন না—এ বাণীর অর্থ। তাই বলেন, "পঞ্চতপা কী, জানতুম না। যোগেনকে বললুম, পঞ্চতপা কী?" সেই পঞ্চতপাই আজ করতে বলেন যোগীন-মা। তবে তাই হোক। বুঝি মনে পড়ে শৈল-সানুর রিক্ত প্রান্তরে একটি দহন-লগ্ন; মনে পড়ে ললিত-কপোল-চুম্বিত বিশ্রস্ত জটায় ঢাকা অপর্ণা-রূপ!

সেদিন রুক্ষ জ্যৈষ্ঠের এক রৌদ্র-নিষণ্ণ প্রহরে উন্মুক্ত আকাশের নীচে, মনের আগুন নিভাতে ধুধু ক'রে জ্বলে ওঠে সপ্তজিহ্ব অগ্নির

দীপ্তশিখা। অন্তরের আগুন বাইরের সঙ্গে বুঝি হয়ে যাবে একাকার। ধীর শান্ত চরণে এসে দাঁড়ান মা—শিবসুন্দরের ধ্যান-ঘোর ভাঙতে ব্রতধারিণী শিবানী।

চারিদিকে চারিটি অগ্নিকুণ্ড, আর মাথার উপর গগনের হোমকুণ্ডে সদ্য জ্বলে উঠেছে প্রভাতী অরুণের রক্তিম শিখা। প্রথম-দর্শনেই মা'র মনে যেন জাগে ভয়ের আভাস; তাই বলেন, "প্রাণে বড় ভয় হ'ল, কী ক'রে এর ভেতর যাব আর সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত বসে থাকবো।" যোগীন-মা দেন অভয়ঃ "এসো মা, কোন ভয় নাই।" কোমলা বালিকার মতো অভয়া পেয়েছেন ভয়, আর অভয় দিচ্ছেন ভক্ত। দেহ ধারণ করলে, সবই মানতে হয় কিনা—"থিয়েটারে যে রাজা সেজেছে, সে রাজার মতো ব্যবহার ক'ববে"—এ-যে যুগদেবতার বাণী। যাই হোক, যোগেন-মা'র অভয়েই যেন আশ্বস্তা মা প্রবেশ করেন সেই দহন-তীর্থে; বলেন, "মনে-মনে ঠাকুরের নাম নিয়ে ঢুকে দেখলুম, আগুনের কোন তাপ নাই।" বেদন-বজ্রের তীব্রতায সব অনুভূতিই বুঝি হারিয়ে যায়।

ক্রমান্বয়ে পঞ্চদিবস ধ'রে চললো এই উদয়াস্ত প্রচণ্ড তপোলীলা। মনে পড়ে কবি কালিদাসের কাব্যালোকেঃ গৌরীর দহন-সাধন—

"শুচৌ চতুর্ণাং জ্বলতাং শুচিস্মিতা
হবির্ভুজাং মধ্যগতা সুমধ্যতঃ।"

কোমল তনুর কমনীয়তাকেও অস্বীকাব ক'রে চলেছিল এই কঠোর তপশ্চর্য্যা।

"তদানপেক্ষ্য স্বমারীরং মার্দ্দবং
তপো মহৎ সা চরিতং প্রচক্রমে .."

তপস্যার অন্তে জানিনা নির্ব্বাপিত হয়েছিল কিনা মা'র অসহ জ্বালা! কিন্তু তনু-মনের দুই তীর স্মৃতির দাহতে যেন অঙ্গার হয়ে উঠলো। সে তনুর কথা বলতে গিয়ে নিজেই বলেছিলেন, "পাঁচ পাঁচ দিন এইরকমে কাজ করায় শরীর যেন পোড়া-কাঠ হয়েছিল।"

"সোনার বরণ হইল শ্যাম,
সোঙরি সোঙরি তোহারি নাম"

-স্বতঃই মনে ওঠে মরমী কবির এই দুটি পদ।

অনুষ্ঠানের পরে দিব্যনেত্রে দেখলেন মা—যেন সেই কিশোরী ভৈরবী মিলিয়ে গেল তাঁর দেবতনুতে। দহন-যোগ-অনুষ্ঠানের প্রয়োজনের জন্যই বুঝি মা'র অঙ্গসম্ভূতা যোগিনী-মূর্ত্তির হয়েছিল প্রকাশ। কার্য্যান্তে আবার হ'ল লয়। এর প্রয়োজন কেন, বলতে গিয়ে, ভক্তসকাশে শুনি মা'র নিজেরই কথা: "পঞ্চতপা-টপা এসব ক'রে শরীরকে কেন কষ্ট দেওয়া? পার্ব্বতীও শিবের জন্য করেছিলেন। এসব করা লোকের জন্য। না হলে, লোকে বলবে, কই সাধারণের মতো খায়-দায়, আছে। আর পঞ্চতপা-টপা মেয়েলী—যেমন ব্রত সব করে না?"

বিশ্বের তপোবন এই ভারতের একপ্রান্তে সহজ মেয়েলী ব্রতরূপে যে অগ্নিব্রত সাধন ক'রে গেলেন স্বয়ং অশিবনাশিনী, সে ছোঁয়া কবে লাগবে ভারতের মেয়ের বুকে বুকে, কবে হবে তার জ্যোতির্ম্ময় প্রকাশ—তাদের তপস্যার প্রবৃত্তি তপঃশক্তিরূপে? কবে জাগবেন ধ্যান-নিথরিত শিবসুন্দর?

❀ ❀ ❀ ❀
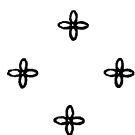
১৩০৫ সালের কথা। আলো-আঁধারের মিলন-সংলাপে আরো অনেক মুহূর্ত্ত হয়ে গেছে পার—অচেনা অতীত হাতছানি দিচ্ছে সুদূরের ভবিষ্যৎকে। ভক্তসঙ্গে মা'র আরও কিছু তীর্থভ্রমণ হয়েছে সারা। এবারে সঙ্গে ছিলেন শ্যামাসুন্দরী। বিরহ-ব্রজের বেদন-লগ্নকে ধন্য ক'রে মা তিনটি মাস পরে যখন ফিরে এলেন কলকাতায়, কালীক্ষেত্রের ভাগীরথী-বক্ষে তখন আনন্দ-ললিতের সুর-উচ্ছ্বাস।

বৃন্দাবন হতে মা এনেছিলেন একটি ছোট্ট সুন্দর গোপালমূর্ত্তি, কিন্তু কি জানি কেন, গোপালজীকে বসানো হয়নি পূজার বেদীতে। জননীর সোহাগ হতে বুঝি বঞ্চিত হয়ে গোপালজীর জাগে অভিমান, তাই সেদিন চপল নীলমণি টলমল চরণে অভিমান-ভরা কালো ডাগর চোখ-দুটি মেলে এসে দাঁড়ান মা'র দিব্য আঁখির সম্মুখে—কচি ঠোঁটের আলতো কথায় আকুল-করা আবদারঃ "তুমি আমাকে এনে, ফেলে রেখেছ। তুমি আমাকে খেতে দাওনি, পুজো করোনি। তুমি পুজো না করলে, আমাকে কেউ পুজো করবে না।" বুঝি ব্যথায় দুলে ওঠে মা'র বুক। পরদিনই আর অপেক্ষা না ক'রে ছোট্ট ঠাকুরটিকে বের করেন প্যাঁটরার ভেতর থেকে। জননীর সস্নেহ চুম্বনে ভ'রে ওঠে নন্দলালের শ্যামল-শোভন মুখখানি। একি বৃন্দারণ্যের উপবনে লীলাক্লান্ত আনন্দ-নন্দনের স্নেহ-ভিখারিনী দশভুজা? না, নিত্যলোকের নিত্য-রাধা গোপাল কোলে? যাই হোক, এর পর হতে দেখা যায়, গোপালজী তাঁর আসনখানি পেতেছেন মা'র নিত্যদিনের আরাধিত দেবতার পাশে—অর্চ্চিত হচ্ছেন নিত্য পূজার পুষ্প-চন্দনে।

১০২-নম্বর বোসপাড়া লেনের বাড়িতে সেদিন মা'র চরণপ্রান্তে প্রণত হলেন স্বামী বিবেকানন্দ—স্বামিপাদের কণ্ঠে তখন দুলছে বিশ্বদেউলের জয়মাল্য। শ্রীঠাকুরের নাম, ভাব, আদর্শের জয়ধ্বজা বহন ক'রে, সুদূর পাশ্চাত্ত্যের গগনকেও গৌরবমণ্ডিত ক'রে মায়ের কোলে ফিরে এসেছেন মায়ের বীর সন্তান। শোণিতাভ সূর্য্যশিখার মতো বিশ্বজয়ী বরপুত্রকে দেখে সারদা-সরস্বতীর শ্রীমুখে জাগে এক অনির্ব্বচনীয় দ্যুতি। হয়তো মনে পড়ে, শত-চাওয়া অতীতের শ্রীঠাকুরের দুটি কথাঃ "ওগো, আমার নরেন এসেছে"। মায়ের ছেলের কিন্তু মা'র কাছে আজ শত অভিমান। কত ব্যথায়, কাঁটার পথে, কত দুখের সাগরপার হয়ে দেশ-দেশান্তে পৌঁছে দিতে হয়েছে জীবনের ধ্রুবতারার আলোখানি। জানান স্বামীজী—কোন ফকিরের অভিসম্পাতে দেহ নাকি তাঁর হয়ে পড়েছিল অসুস্থ, আর

সে-স্থানও তাঁকে পরিত্যাগ করতে হয়েছিল তারই অভিসম্পাতে। কারণ, ফকিরের চেলা তার গুরুর চেয়ে অনুরক্ত হয়ে পড়েছিল স্বামীজী-মহারাজের দেবপ্রভাবে এবং বিশ্বজয়ী প্রতিভায়।

তাই অভিমানের সুরে বলেন নরেন-স্বামী, "সামান্য একটা ফকিরের শক্তিও ঠাকুর রোধ করতে পারলেন না?" ক্ষুব্ধ শিশুকে স্নেহময়ী জননী করেন শান্ত: "বাবা! শঙ্করাচার্য্যও তো শুনতে পাই এমনি ক'রে নিজের শরীরে রোগ আসতে দিয়েছিলেন। তোমার শরীরে আসতে দেওয়া আর তাঁর নিজের শরীরে আসতে দেওয়া, একই কথা। তিনি তো ভাঙতে আসেননি, গড়তে এসেছিলেন। সবই বিদ্যা, বিদ্যাকে তো মান্য করা চাই। তিনি তো হাঁচি-টিকটিকি পর্য্যন্ত মেনে গেছেন।"

অশান্ত শিশুর অভিমান আর যায় না; বলেন, "তুমি যাই বলোনা কেন, আমি মানি না।" স্মিতহাস্যে করুণাময়ী দেন উত্তর: "না মেনে থাকবার কি জো আছে? তোমার টিকি যে বাঁধা!" জমাট-বাঁধা অভিমান যায় গ'লে—বিশাল দুটি আঁখি হয়ে ওঠে অশ্রুর অলকানন্দা, শিশুর উচ্ছ্বাসে আঁকড়ে ধরেন মায়ের চরণ-দুটি: "ক্ষমা করো, মা, ক্ষমা করো!" আর মা? অবুঝ ছেলের মাথায় হাতখানি রেখে শুধু দেন অভয় হাসির সান্ত্বনা।

আবার অভিমানী সন্তানের কণ্ঠেই শুনি আর-এক সুর—মা'র প্রতি সে কী গভীর শ্রদ্ধা! মনে পড়ে আর-এক বৈরাগী দিন—অনিকেত জীবনের অদিশায় নির্ব্বাণের বন্ধনহীন পথে ছুটে-যাওয়া। ব্যাকুলতা নিয়ে আবার সেদিন উপস্থিত বেদান্তকেশরী। আকাশ-উদাস সুরে বলেন, "মা, আজকাল আমার সবই যেন উড়ে যাচ্ছে!" হেসে বলেন বিশ্বেশ্বরী, "দেখো দেখো, আমাকে কিন্তু উড়িয়ে দিও না।" সঙ্গে সঙ্গে ভাবোদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে নরেনের আয়ত-অরুণ আঁখি—শরণ-নত শিরে বলেন, "মা, তোমাকে উড়িয়ে দিলে, থাকি কোথায়? যে জ্ঞান গুরুপাদপদ্ম উড়িয়ে দেয়, সে তো অজ্ঞান।" ভ'রে ওঠে মা'র বুক, আর করুণাক্ষরা নয়ন হতে ঝ'রে পড়ে

আশিস্‌ধারা। আর, ভবিষ্যৎ-ভারতের পূর্ব্বাশায় জাগে নবীন পূষণের শুভ মাঙ্গলিক।
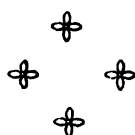
শরৎ হ'ল সারা। বিরহ-সন্তপ্ত শেফালীর একটি রাতের জীবন অনেক আগেই হয়ে গেছে নিঃশেষ, শুধু সুরু ও সারার আলোক-সাক্ষী হয়ে জ্বলে হেমন্তের আকাশপ্রদীপ।

শ্যামাপূজার দিন মা'র শ্রীচবণ-স্পর্শে হয় বেলুড়ের প্রাণপ্রতিষ্ঠা। সেদিন মাকে পেয়ে ছেলের দলে সে কী আনন্দ! পরমোৎসাহে সারা মঠভূমিখানি মাকে ঘুরে ঘুরে দেখানো হ'ল; মায়ের নরেন-ই হ'ল তাতে অগ্রণী। বলেন, "মা, তুমি আপনার জায়গায় আপনমনে হাঁফ ছেড়ে বেড়াও।" একমুঠো উচ্ছল খুশী যেন ছড়িয়ে পড়লো মঠভূমির এ-প্রান্ত হতে ও-প্রান্তে। বেদন-নৈপুণ্যে সার্থক-হয়ে-ওঠা এই দিনটি যেন ডেকে আনলো একটি সোনাব ভবিষ্যৎ। সেদিন আবার জননী আপন হাতে করেন পূজার যোগাড়, নিটোল নিখুঁত আয়োজনে ভ'রে ওঠে শ্রীমন্দির। তারপর সুরু হয় পূজা। সে এক আনন্দসুন্দর মুহূর্ত্ত। হেমন্তের অতল সোনায় ডুবে-থাকা দিনটি যেন সুরধুনীর কূলে দাঁড়িয়ে আছে; বর্ত্তমানের সীমা লঙ্ঘন ক'রে চলে গেছে দৃষ্টি—এ আলোর উৎস কোথায়? পূজার আসনে বসে মা আত্মারামের কৌটাখানি আপন বক্ষতলে রেখে, দরবিগলিত অশ্রু-ধারায় করেন অভিষেক—হৃদয়-রতনকে হৃদয়ের পূজা-নিবেদন। বাহিরের জগৎ যায় হারিয়ে—মনে পড়ে শ্যাম-পাগলিনী শ্রীরাধার উক্তি:

> "হরি যব আওব এ মঝু গেহে
> মঙ্গল যতহুঁ করব মঝু দেহে।"

এদিকে ছেলের দলে তখন আনন্দের কোলাকুলি—মঠের বৃক্ষ ঘিরে-ঘিরে সে কী আনন্দ-নৃত্য! আত্মভোলা নরেনকে মধ্যমণি ক'রে নাচেন রাখাল, বাবুরাম, শরৎ, শশী, আরো অনেকে। খোল-করতাল-কণ্ঠনাদে সুরধুনী উথল-পাথল। আনন্দের ঢেউ লেগেছে তখন দিক্-দিশায়! অবশেষে মধ্যাহ্ন-ভোগের শেষে, প্রসাদ-পর্ব্বের পর শেষ হয় সে-উৎসব-সূচী।

তারপর অপরাহ্নে নিবেদিতা-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা-উৎসব। সেখানেও হ'ল মা'র শুভাগমন। মূর্ত্ত সরস্বতীর পুণ্য-আবির্ভাবে যেন আলোয় মুখর হয়ে ওঠে ছোট্ট স্কুল-বাড়িখানি।

আইরিশ-দুহিতা নিবেদিতা যেন সুরভিত হোমাগ্নির মতোই স্নিগ্ধ, প্রোজ্জ্বল—পবিত্রতায় ত্যাগে মূর্ত্তিমতী বেদকন্যা। তাইতো তিনি হয়েছিলেন গুরু-ইষ্টের একান্ত করুণার অধিকারিণী। আর তাঁরও শ্রীঠাকুর, শ্রীমা, স্বামীজী, সমগ্র রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভারতের প্রতি সে কী মরমী প্রাণের অনুরাগ, কী শরণে নত শ্রদ্ধা! মনে পড়ে, তিনি যখন এলেন তাঁর সমস্ত ঐশ্বর্য্যের বিসর্জ্জন দিয়ে, তাঁর স্বদেশ ও আইরিশ জননীর কোল ছেড়ে দরিদ্র ভারতের সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দিতে, সেদিন কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ভারতের হিন্দুয়ানির কথা স্মরণ ক'রে স্বামীজী হয়ে পড়লেন বেশই চিন্তাকুল,—কোথায় রাখবেন বিদেশিনীকে। কিন্তু সে চিন্তাভার যেন দখিন-হাওয়ায় গেল মিলিয়ে। 'সিস্টার' এসে যখন নত হলেন জননীর চরণতলে, তখন এই ভারতের মেয়ে—মা আমার—পবিত্র বাহুর বন্ধনে কোলের কাছে টেনে নিলেন এই বিদেশিনী মেয়েটিকে। আয়ারের তুষার-আকাশ থেকে ছুটে-আসা একটা দুরন্ত 'সোয়ালো' ভারত-মায়ের মাটীর গানে সেদিন প্রথম শুনলো পূর্ব্ব-পশ্চিমের মিলন-'সোনাটা'। কৃতজ্ঞতায় সজল হয়ে ওঠেন নিবেদিতা, সোহাগ-বিগলিত হৃদয়ে নিজেকে মনে করেন যেন মা'র কোলের ছোট্ট দুলালী। মনে হ'ল যেন বিদেশিনী নয়, বিদেশ হতে বহুদিন পরে ফিরলো ঘরের মেয়ে —আর ফিরলো একেবারে মায়ের কোলে। সে কথা বলেছেনও

বারে বারে : "মা, আমরা আর-জন্মে হিঁদু ছিলাম। ঠাকুরের কথা ও-দেশে প্রচার হবে ব'লেই আমরা ও-দেশে জন্মেছি। তা দেখো, এমন বাঙালী হয়ে যাব যে, একেবারে ঠিক-ঠিক।" মায়ের মুখে ফোটে হাসি, নিবেদিতার চোখে সে যেন ম্যাগনোলিয়ার একমুঠো প্রসাদী আলো। তাই বুঝি মাকে দেখে, শিশুর মতন হতেন আনন্দে পাগল, ভুলে যেতেন নিজের জাতি-গৌরব—মানসম্ভ্রম। সোহাগী মেয়ের মতো বসতেন মা'র কাছে পা-তুটি ছড়িয়ে—দ্বিধা-সঙ্কোচের বালাই নেই ; সরল হেসে বলতেন, "মা, ভারতের সব শিখলাম, কিন্তু ভারতের মতো পা মুড়ে বসাটা আর কিছুতেই হ'ল না।" আবার সন্ধ্যাবেলা মাতৃদর্শনে এসে, যত্ন ক'বে লণ্ঠনের কাঁচে জড়িয়ে দিচ্ছেন কাগজ, যাতে মা'র চোখে আলো না লাগে। মায়ের দরদী মেয়ে কিনা! মনে পড়ে, আর একটি বিদেশী ফুলের সন্ধ্যা—আমাদেরই ধূপছায়া বাংলার এই দেবনিকেতনে সে-সন্ধ্যা হয়েছে সার্থক। এসেছেন নিবেদিতা-সঙ্গে সহকর্ম্মিণী কৃস্টিন। ছোট্ট মেয়ে যেন প্রথম শিখেছে বাংলা-মায়ের সন্থ-শেখানো আধো-আধো বুলি : "এ মাটৃ ডেবী, আ-প-নি হ-ন আ-মা-ডি-গে-র কালী।"—সঙ্গে সঙ্গে কৃস্টিন করেন সেই কথার পুনরুক্তি : "Oh! Holy Mother is our Kali.—yes." মায়ের মুখে তৃপ্তিভরা হাসি : "না বাপু, আমি কালী-টালী হতে পারবোনি—জিভ বার ক'রেই থাকতে হবে তাহলে।" মায়ের কথা তাঁদের বুঝিয়ে দিলে, একমুখ হেসে বলেন তুজনে—সে কত আদর-ভরা কথা। তাঁদের ভাষাতে বলেন, "মাকে এতটা কষ্ট স্বীকার করতে হবে না। আমরাই দেখব মাকে কালীরূপে, কারণ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ যে আমাদের মহাদেব।" হেসে বলেন মা, "তা না-হয় দেখা যাবে।" তবু মেয়েদের জাগে ভয়, আবদার-ভরা সুরে বলেন—"She admits." (উনি স্বীকৃতা)।

স্বীকৃতি পেয়ে আনন্দ আর ধরে না। পরমানন্দে চরণধূলি মাথায় নেন তুলে এই ব'লে : "হে জননী, তবে আমরা তোমার পবিত্র

চরণধূলি গ্রহণ করি।" বাইরের আঁধারে তখন সদ্য ফুটে উঠছে একটুকরো অকৃত্রিম জ্যোৎস্না।
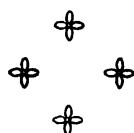
একটু আলো এসে পড়তে-না-পড়তে, যেন তার বুক জুড়ে ঘনিয়ে আসে একখণ্ড কালো মেঘ। দীর্ঘ দ্বাদশবর্ষ-ব্যাপী মা'র সেবাই ছিল যাঁর তপোময় জীবনের তপস্যা, একান্ত সাধনা—মা'র অন্তরের বস্তু, প্রথম-দীক্ষিত সন্তান—সেই স্বামী যোগানন্দ দীর্ঘদিনের রোগশয্যায় শায়িত থেকে, নিলেন চিরবিদায় ধূলি-মলিন ধরণীর কোল থেকে—১৩০৫ সালের ১৫ই মাঘ। তার স্মৃতি বলতে রইল শুধু তাঁর জীবনভোর জননীর প্রতি দরদ-ভরা আকূতি, আর অকুণ্ঠ সেবা। আর রইল মা'র চোখের ব্যথার অশ্রু। মা'র দরদী সেবক, দরদী সন্তান যেদিন বিদায় নেবেন, তার পূর্ব্বে ভক্ত এসে দেখেন গণ্ডপ্লাবী অশ্রুধারায় জননী উপবিষ্টা। ভক্ত দিতে গিয়েছেন সান্ত্বনা: "সেকি মা! আপনি কাঁদছেন কেন? সেরে যাবে।" অশ্রু-উদ্বেলিতা জননী ব'লে উঠেছিলেন, "আমি যে দেখলুম, বাবা, ঠাকুর নিতে এসেছিলেন!" তারপর সান্ত্বনাহীন অশ্রুধারায় হয়ে উঠেছিলেন একান্ত আকুল। ভক্ত নতশিরে ফেলেছিলেন শুধু অশ্রুবারি, তাঁর মুখে যোগাযনি কোন সান্ত্বনার ভাষা। অবশেষে জননীর দর্শনই হ'ল সত্য। ভক্তদের শত আকূতি, ধ'রে রাখবার শত প্রচেষ্টা, মায়ের চোখের জল সব-কিছুকে বিফল ক'রে চলে গেলেন স্বামী যোগানন্দ। তখন গভীর বেদনার হাহাকারের মাঝে জননী বলেছিলেন, "বাড়ির একখানা ইঁট খসলো, এবার সব যাবে!" সন্তান-বিচ্ছেদের ব্যথা মা অন্তর থেকে মুছে ফেলতে পারেননি কোনদিন। মায়ের স্মৃতির তীর্থে যেন চির-অমর হয়ে

বেঁচে ছিলেন ছেলে যোগীন। মায়ের স্মৃতির ঝাঁপিতে চিরদিন তোলা ছিল তাঁর সারা জীবনের চিহ্নিত যা-কিছু।

"শরৎ আর যোগীন এ-ছুটি আমার অন্তরঙ্গ"—তাই পরবর্ত্তী সেবকরূপে দেখি শ্রীশরৎ-মহারাজকে, অপরূপ নীরব সেবার অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত। জননী সারদার সেবাই যেন ছিল তাঁর একমাত্র আনন্দ। তাই সগৌরবে বহন করেছেন মা'র নামাঙ্কিত সন্ন্যাসের নাম 'সারদানন্দ'। তাঁর পূর্ব্বে কিছুদিনের জন্য সেবাভার গ্রহণ করেছিলেন মায়ের আর-একটি কৃতী সন্তান—স্বামী ত্রিগুণাতীত; তাঁরও পূর্ব্বাশ্রমের নামটি ছিল আবার মা'র শ্রীনাম-চিহ্নিত 'শ্রীসারদাচরণ'। বলিষ্ঠ দেহ, বলিষ্ঠ প্রাণের অধিকারী ছিলেন স্বামী ত্রিগুণাতীত। তাঁর সেবায় তপস্যায়, জীবনের প্রতি পদক্ষেপে পাওয়া যেত তারি বিস্ময়কর প্রকাশ।

গভীর রজনী। অন্ধকারের অনুজ্জ্বল পরিচয় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সুদূরের বনলেখা, শুধু দূর-আকাশের তারাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ঝিকামিক করছে কতকগুলি জোনাকি, আর দূরের আলেয়া তাদের বিদ্রূপ ক'রে হেসে উঠছে, আবার যাচ্ছে মিলিয়ে। ঠিক এমনি সময়ে বর্দ্ধমানের পথ হয়ে জয়রামবাটীর পথে চলেছে একখানি গরুর গাড়ি। পল্লীর আঁকাবাঁকা অসমতল পথ, তারি বুকে কোনরকমে মন্থর গতিতে তাল রেখে, সে চলেছিল আঁধারের আড়াল ঠেলতে-ঠেলতে। চলেছেন বিশ্বজননী তাঁর এই দীন রথচক্রের গতিতে সে-রাতের পথরেখায় একটি নূতন চিহ্ন এঁকে দিয়ে পিত্রালয়-অভিমুখে। পল্লীলক্ষ্মী মা আমার ক্লান্ত-অবসন্ন-দেহে শয়ন-নিষণ্ণ; সঙ্গে সেবক-সন্তান ত্রিগুণাতীত-মহারাজ—তিনি চলেছেন পদব্রজে মা'র গাড়ির পিছনে পিছনে, মা'র পাহারাদারের মতো। শিব-গেহিনীর সাথে সেবক নন্দী।

প্রহরের পর প্রহর হয় অতীত। ত্রিযামা রজনীর শেষপ্রান্তে এসে দাঁড়ায় আঁধারের শেষবিন্দুটি। রাতের আকাশ ফিকে হয়ে আসে, পূর্ব্বাচলে জ্বলজ্বল করে শুকতারা। আনমনা ত্রিগুণাতীত

চলেছিলেন আপন-ভুলে, অক্লান্ত পদক্ষেপে ; সহসা কী যেন চোখে পড়ে। সর্ব্বনাশ, আর তো দেরি করা চলে না! ছুটে যান ত্রিগুণাতীত—সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় বীর বলিষ্ঠ দেহখানি লুটিয়ে পড়েছে মা'র রথের সম্মুখের পথরেখায়। কারণ অবশ্য খুঁজে পাওয়া যায় একটু পরেই। পথের বুকে এক গভীর গর্ত্ত, অবিস্তীর্ণ পথের সীমা—তাই গাড়ির চাকা পড়বেই সেই গর্ত্তের মুখে ; ফলে, এক গভীর ঝাঁকুনির আঘাতে জননীর নিদ্রার ব্যাঘাত তো হবেই, কোমল তনুখানিও যে আহত হবেনা তাও বলা যায় না। তাই দরদী বীর সেই ধরণীর অসমতা পূর্ণ ক'রে মা'র পথের আঘাতটুকু নিতে চাইলেন আপন দেহে।

কিন্তু এদিকে যে জেগে ওঠে নাড়ীর টান। ভোর-রাতের হাওয়ায় হঠাৎ কেমন আচম্‌কা যেন মা'র তন্দ্রাবেশ যায় টুটে ; কী যেন ভেবে আকুল হয়ে উঠে বসেন, তারপর ছইয়ের আড়াল ঠেলে সহসা পথের পানে চেয়ে শিহরিত হয়ে ওঠে সর্ব্বদেহ। কী সর্ব্বনাশ, একি কাণ্ড! তীব্র চকিত কণ্ঠে চালককে আদেশ করেন, "গাড়ি থামাও—শিগ্‌গির গাড়ি থামাও।" একটা স্তম্ভিত আঘাতে থেমে যায় গাড়ি, আর ব্যাকুল পদক্ষেপে গাড়ি থেকে নেমে, ছুটে আসেন মা সন্তানের পাশে ; সযত্নে তাকে ভূমিশয্যা থেকে তুলে ধরেন ছোট্ট শিশুর মতো, তারপর সুরু হয় মৃদু তিরস্কার। গায়ের ধুলা ঝেড়ে, স্নেহভরা শাসনে বলেন, "একি কাণ্ড, বাবা, যদি আমার ঘুম না ভাঙতো—তাহলে কী কাণ্ড হ'ত বলো তো? ছিঃ ছিঃ, এমন কাজ করে!" আপন-ভোলা পাগল ছেলের মুখে তখন তৃপ্তির বিজয়-গর্ব্ব। মনে হয়, এ কি তিরস্কার? এ যে শত সোহাগের গুঞ্জন। পরে মা কত সপ্রশংস মনে উল্লেখ করেছেন সেবকের এই অতুলনীয় সেবার কথা। ইতিহাসের মৌন অরণ্যে এমনি কত দিন হয়তো হারিয়ে যেত, যদি না থাকতো মহাকালের মণি-স্বাক্ষর!

❖
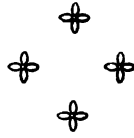
"দিদি, এক-পেটে জন্মেছি—আমাদের কী হবে?"—দিদি সারদার আদরে পালিত ভাই প্রসন্নকুমার করেন প্রশ্ন। জননী দেন উত্তর—"তা তো বটেই, তোদের ভয় কী?" সেদিন খবর এলো, মা'র আদরের ছোট্ট ভাই অভয় কলেরা-রোগে মুমূর্ষু। ছোট্ট শিশু থেকে বুক দিয়ে মানুষ-করা সেই অভয়চরণ। মা'র বুক যেন নিঙড়ে ওঠে—ছুটে আসেন অভয়ের পাশে, সোহাগ-ভরে কোলে তুলে নেন তার শিয়র। আর, অভয় আজ অভয়ার পায়ে সব সমর্পণ ক'রে পরম নিশ্চিন্তের আশ্বাসে শান্ত নির্ভীক—পরম নির্ভরতায় শুধু বলেন, "এদের তুমি দেখো।" মা'র চরণে অর্পিত হয়ে যায় চিরদিনের জন্য তাঁর পিছনের যত দায়। মায়ের শ্যামশীতল ক্রোড়েই মুক্তির নিশ্বাস ফেলে, তিনি নেন চিরদিনের ছুটী। অভয়ের প্রয়াণে স্নেহাতুর মা'র বুকে যেন বাজে আর-একটি গভীর ব্যথা—সে ব্যথা জড়িয়ে ধরে সুদৃঢ় বন্ধন হয়ে। মহামায়া আপন মায়ার বাঁধনে নিজেকে বেঁধে, সুরু করেন মাতৃলীলা—নরলীলা আর দেবলীলার দিব্য-সমন্বয়।

অভয়ের ছোট্ট শিশুকন্যা। শোকে উন্মাদগ্রস্তা জননীর অযত্নে পালিতা সেই শিশুকন্যা। সহসা জননী দিব্যদৃষ্টি মেলে চেয়ে দেখেন শ্রীঠাকুর চিন্ময় দেহে দণ্ডায়মান; ইঙ্গিতে যেন দেখিয়ে দিচ্ছেন: "ঐ তোমার ধরণীর বন্ধন, ওর মায়াপাশে আপনাকে জড়িয়ে পূর্ণ করো তোমার লীলা।" সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে, কিছুদিন পূর্ব্বের আর-একটি দর্শন। রুক্ষ কেশে, জীর্ণ-মলিন বেশে এক কুমারী-মূর্ত্তি যেন ফিরছে সঙ্গে সঙ্গে। মহামায়াকে বাঁধতে যোগমায়ার প্রকাশ। তার পরেই তো হ'ল অভয়ের এই একটুকরো মেয়ে। তার জন্মের আগেই শোক-দুঃখে জরাজীর্ণ অভয়ের সহধর্ম্মিণী সুরবালার মস্তিষ্কের ঘটলো

কিছু বিকৃতি, পরে সে-রোগ পৌঁছলো চরমে। তাই তার পক্ষে শিশুপালন হ'ল অসম্ভব। অদ্ভুত যোগাযোগ। কলকাতায় সুরবালাকে কিছুদিন নিজের কাছে রেখে, মা তাকে পাঠিয়ে দিলেন স্বদেশে; সঙ্গে সেই শিশুকন্যা রাধু। ভক্তদের আকূতিতে মায়ের হয়না যাওয়া। কিন্তু লীলার পরিকল্পনা যে হয়ে আছে আগে থেকেই। তাই সেদিন সন্ধ্যায় মা মৌন জপে সমাহিতা—সহসা চঞ্চল হয়ে উঠে দাঁড়ান: "ও যোগীন, আমার জয়রামবাটী না গেলে চলবেনি। পাগলীর হাতে মেয়েকে দিয়ে আমি কিছুতেই স্থির থাকতে পারবোনি।" ভাব-সমাহিত নেত্রের সম্মুখে সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে জয়রামবাটীর চিত্রখানি—অবোধ শিশুর প্রতি বিকৃত-মস্তিষ্ক জননীর অবাধ অত্যাচার, অযত্ন প্রতিপালন। নয়ন-মন প্লাবিত ক'রে নামে মমতার নির্ঝরিণী। আর কলকাতায় থাকা হয়না। শ্রীঠাকুরের ইঙ্গিতে লীলার পূর্ণতা-সাধনে, ভক্তের আকূতিকে পিছনে ফেলে, মা চলে এলেন জয়রামবাটীতে। অধরা মেয়ে এতদিনে যেন সাধ ক'রে প'রলো ধরার বাঁধন। সে কী যত্ন, সে কী স্নেহ! রাধু মানুষ হতে লাগলো, প্রতিপালিত হতে লাগলো জননীর স্নেহচ্ছায়ে। সকলে বিস্ময়ে আকুল। বিশ্বেশ্বরীর অনন্তমুখে উৎসারিত স্নেহকরুণা যখন বিশেষভাবে ঝ'রে পড়ে একটি আধারে, তখন তাতে ফুটে ওঠে আর-একটি রূপ—সে স্নেহ-ব্যাকুলতার গভীরতা হয় যেন অতল-ছোঁয়া, তার কোমল মাধুরী রাখবার ঠাঁই যেন হয়না ধরণীর পাত্রে। তবু দৃষ্টিভঙ্গীর বৈচিত্র্যে ফুটে ওঠে তার নব নব প্রকাশ। তাই রাধুর প্রতি মা'র সেই গভীর মমতা, মায়ের আকূতি নিয়ে যত্ন-প্রতিপালনকে কোন কোন ভক্ত ভাবে—মায়ের মায়াময়ী রূপের বিকাশ; মুখেও প্রকাশ করতে সঙ্কোচ জাগে না: "রাধুর উপর আপনার ভারি আসক্তি।" অবুঝ ছেলের ধৃষ্টতাপূর্ণ রূঢ় কথার উত্তর দেন মা: "কি ক'রবো, বাবা, আমরা মেয়েমানুষ, আমাদের এইরকমই।" সহজ পল্লীর সরল মায়ের কথা। কিন্তু শেষে একদিন এই কথায় জেগে ওঠে জননীর

মহিমময়ী মূর্ত্তি, তেজোদ্দীপ্ত কণ্ঠে বলেন সন্তানকে, "তুমি এসব কী বুঝবে? যখন বিদ্যুৎ চম্‌কায় তখন শার্সীতে চম্‌কায়, কিন্তু খড়খড়িতে কিছু হয় না। যাদের ঈশ্বর-চিন্তা ক'রে মন শুদ্ধ হয়ে যায়, তারা যখন যে-জিনিসটি ধরে, তাতেই ষোলো-আনা মন দেয়। তুমি আমার মতো একটি খুঁজে বার করো দেখি?" সন্তান নতমস্তকে শুধু জানায় নীরব নতি। আবার আর-এক দৃষ্টিতে জননীর এ লীলায় ধরা পড়ে বিরাট আসক্তির মাঝে এক গভীর অনাসক্তির আদর্শ—মহামায়া সাধ ক'রে মায়ার বাঁধনে থেকেও যেন বাঁধন-হারা, একান্ত উদাসীন।

এদিকে লীলার পাত্র ওঠে ভ'রে—মা'র কোলে ভিড়ে আসে বহু-যুগের মাতৃহারা সন্তানদল। আর দিনে দিনে রাতুল চরণ-দুটি ভ'রে ওঠে শত ভক্তের ফুল-গন্ধ-নিবেদনে। আবার ব্যথার কাঁটাও থাকে সে-ফুলে। কারণ নিত্য নব নব ভক্তের মেলায় যাদের সাধ গেছে মিটে—মা'র লীলার মাঝে যাদের প্রয়োজন হয়েছে সারা, তারা যে নেয় বিদায়। পুরানো দিনের ছোট্ট খেলাঘরের স্নেহের কাঙাল খুড়ো নীলমাধব, তিনিও একদিন নিলেন ছুটী। মহামায়ার সেদিন এক মায়াময়ী রূপ। আকুল হয়ে অবুঝ মেয়ের মতো চোখের পাহারা দিয়ে আগলে বসে আছেন খুল্লতাতের শেষ শয্যাখানি—বুঝি সেই ছোট্টবেলার 'সারু'র মতো। আজ মরণের কাছ থেকেও ছিনিয়ে নেবেন তাঁর আদরের খুল্লতাতকে—দুটি হাতে আকড়ে ধরবেন তাঁর পালিয়ে-যাওয়া প্রাণটিকে। ওদিকে মরণ এসে হানা দিয়েছে জীবনের দ্বারে। তার আগমনের সমস্ত আভাস ফুটে উঠতে লাগলো নীলমাধবের চোখে মুখে। মা কিন্তু তখনও অবোধ বালিকার মতো শুধু শুধাচ্ছেন নিকটস্থ সন্তানকে: "এখন কেমন দেখছ?" ভক্ত দেন সান্ত্বনা: "ভালো হয়ে যাবেন বোধ হয়। ভাবনা নেই।" আর, জননীকে সরিয়ে নিয়ে যাবার করেন চেষ্টা। কিন্তু নীলমাধবের স্নেহের সারুকে আর কোনমতেই তখন সরানো যায় না। কি জানি, স'রে গেলেই যদি নয়নের নিধি পালায়! এদিকে ভক্তেরা জানায়

আকৃতি—একটু কিছু খেয়ে আসতে ; ছোট্ট মেয়েটির মতো ভুলিয়ে, দেন আশ্বাস, দেন নীলমাধবের জীবনের আশা। বহুক্ষণ পরে একটু কিছু মুখে দিতে জননী এলেন বাইরে ; ওদিকে স্নেহের শিকল আলগা পেয়ে দেহপিঞ্জর ছেড়ে পাখীও দেয় ফাঁকি। একটি বাঁধনই তো বেঁধে রেখেছিল তাঁর সারাটি দেহ-মন। সেই ছোট্ট শ্যামার নন্দিনী, যাকে একদিন কোলে পিঠে ক'রে গ'ড়ে তুলেছেন—সে যে কত আদরে কত ব্যথায় তা কি বলা যায় ? আর আজ বৃদ্ধবয়সে পেলেন শিশুর সোহাগ তাঁরি স্নেহাঞ্চলে, সেই পাথেয়টুকু সম্বল ক'রেই নীলমাধব পাড়ি দিলেন অচিন দেশের পানে।

ওদিকে হৃদয়তন্ত্রীতে বাজে টান। কোনরকমে ভক্তের কথা রেখে, কিছু মুখে দিয়েই ছুটে আসেন জননী, তখন ক্ষীণ প্রদীপ গেছে নিভে। সেইটুকু আলোর অভাবেই যেন সারা ঘর আঁধারে থমথম ক'রে উঠছে : "তবে কি খুড়ো নেই ?" নীরব মৌন ভক্তের দল। আকুল হয়ে বলেন মা, "কী আমাকে ছাইপাঁশ খেতে পাঠালে, খাওয়াটাই কি বড় হ'ল ? খুড়োকে একবার শেষ দেখা দেখতে পেলুমনি…।" দেখতে দেখতে বিস্ফারিত হয়ে ওঠে আঁখি, রক্তিম শ্রীমুখ, উত্তেজনায় অধরোষ্ঠ বিকম্পিত—সে এক রুদ্রসুন্দর রূপ। এদিকে নয়ন হতে অবিরল ঝ'রে পড়ছে অশ্রুধারা। ভীত স্তম্ভিত ভক্ত আছেন নির্ব্বাক হয়ে বসে ! অবশেষে তাঁরি নীরব প্রার্থনায় বুঝি জননী ফিরে আসেন সহজাবস্থায়। তখন আর-এক রূপ। অশ্রুমুখী বালিকার মতো শান্ত হয়ে ক'রছেন পিতৃব্যের শেষকৃত্য যথোচিত নিয়মে। ভক্ত করেন ক্ষমা-প্রার্থনা : "দোষ যদি হয়ে থাকে, মা, সে কেবল আমারই।" ক্ষমাসুন্দর মুখে তখন রুদ্ররূপের কোন আভাসই নেই, শুধু অবুঝ আকুল কান্না ছাড়া। স্নেহের দুলালী-ই তো মমতাময়ী জননী !

তারপর বিদায়ের পালা এলো জননী শ্যামাসুন্দরীর। এখন শ্যামা-মা আদরিণী দুলালীর গরবে আনন্দে আত্মহারা। অসচ্ছল সংসারে সচ্ছলতা ফুটিয়ে তোলার আকুলতা এখন বেড়ে গেছে দশগুণ ;

টুকিটাকি প্রয়োজনীয় যা-কিছু সবই করেন সঞ্চয়—লক্ষ্মীর ঝাঁপির মতো সদাই ভ'রে রাখতে চান তাঁর একরত্তি ভাঁড়ারখানি! কেনই-বা না হবে? আজ তো শুধু নিজের সেই অবোধ অবুঝ শিশুগুলি নয়, আজ যে তাঁর 'সারু'র বিশ্বজোড়া ছেলের দল তাঁর ভাঙা কুঁড়ে ভ'রে ভিড় করেছে। তারা যে আরও অবুঝ, তাদের আবদার যে আরো বেশী। তাই গর্ব্বভরা কণ্ঠে বলেন, "আমার ভক্ত-ভগবানের সংসার। আমার সারদা (স্বামী ত্রিগুণাতীত) হয়তো কখন আসবে, যোগীন আসবে,—এসব দরকার।" বিশ্বের মানুষ, দেবতা সবাই এখন ঘরের জন। তাই বলছেন পুত্রবধূদের—"আমি যতক্ষণ আছি—ব্রহ্মা আছেন, বিষ্ণু আছেন, জগদম্বা আছেন, শিব আছেন, সব আছেন। আমিও যাব, এঁরাও সঙ্গে সঙ্গে যাবেন। তোরা কি যত্ন করতে পারবি? আমার ভক্ত-ভগবানের সংসার।" কত দরদ! মা'র চরণে প্রণাম জানিয়ে মা'র ছেলে শরৎ এসেছেন বিদায় নিতে, পাড়ি দেবেন সাগরপারে। ঠাকুরের নামের জয়ধ্বনি তুলতে হবে, তাই নরেন-ভাইয়ের ডাক এসেছে। তাঁর আদেশ মাথায় ক'রে তাই অনুগত গুরুভাইয়ের দল এক এক ক'রে ছুটে যাচ্ছে তাঁর পাশে। সন্তান শুভপথে চলেছেন, জননীর বুক-ভরা মঙ্গল-আশিস্ ঝ'রে পড়ে: "কোন ভয় নাই, ঠাকুর তোমাদের সর্ব্বদা রক্ষা করছেন—এইটুকুই তো সম্বল।" শরৎ-মহারাজ মহানন্দে করেন যাত্রা। মা পাঠালেন ছেলেকে, কিন্তু কোমলা ঠাকুমা শ্যামাসুন্দরী? তাঁর অন্তর সভয় স্নেহে ওঠে ভ'রে; অনুযোগের সুরে বলেন, "হ্যাঁ মা সারু, তুই মা হয়ে কোন্ প্রাণে শরৎকে সাত-সমুদ্র তেরো-নদী দূরে পাঠালি? তোর প্রাণ কী কঠিন!"

সেই শ্যামাসুন্দরীরও একদিন এলো ওপারের ডাক। সেদিন সকাল থেকেই তাঁর কেমন যেন একটা আনন্দ-চঞ্চল ভাব। আজ যেন সেই পূর্ব্বের ধীর গম্ভীর শ্যামাসুন্দরী রূপায়িত হয়েছেন শিশু-স্বভাব ঠাকুরমা-রূপে। বাড়ির জন্য কিনতে এসেছেন কিছু শাকসবজি। কিনে, পাড়ার যত চপল ছেলেদের নিয়ে সে কী

আনন্দ-কলরব! শিশু আর বৃদ্ধায় পার্থক্য যায় হারিয়ে। নৃত্যগীতে জয়রামবাটীর ভাঙা বাট হয়ে ওঠে আনন্দ-চঞ্চল। পড়শীদের লাগে বিস্ময়—বোঝেনা সহস। শ্যামাসুন্দরীর এ ভাবান্তর কেন। বহুক্ষণ নৃত্যগীত-রঙ্গ-দোলায় কাটিয়ে ঠাকুমা বাড়ি আসছেন—নাতিদের কিন্তু সাধ মেটেনি; আবার তাঁর উৎসাহ জাগাতে পিছনে পিছনে ছোটে আর ডাকে, "ঠাকুমা—ও ঠাকুমা—"। একটুখানি মৃদু হেসে রঙ্গ ক'রে বলেন শ্যামাসুন্দরী, "কী বলবি, বল্ না? আর আমার দাঁড়াবার সময় নাই। আমার বেহারা হ'বি?" স্পষ্টই বোঝা যায়, বুঝেছিলেন—সত্যই আর দাঁড়াবার সময় নাই, মহাসিন্ধুর ওপার থেকে এসেছে ডাক। এখন জগতে প্রয়োজন শুধু বেহারারই। যাই হোক, বাড়ি এসে অসমাপ্ত কাজে সাহায্য ক'রে সে-কাজ শেষ করেন। এইসঙ্গেই অবসান হয় তাঁর শান্ত অনাড়ম্বর দিব্যজীবনের। তার পরেই হয়ে পড়েন অসুস্থ, আর পূর্ণজ্ঞানে দেবকন্যার সঙ্গে শেষ দিব্যপ্রসঙ্গ ক'রে, তাঁরি হাতের ব্রহ্মবারি গঙ্গাজল পান ক'রে বিদায় নিলেন মরজগৎ থেকে; জেগে রইল শুধু দেবনন্দিনীর বুক-নিঙড়ানো ক্রন্দন—মাতৃঋণের পরিশোধ করতে অশ্রুর তর্পণ। মা'র জীবনে যেন "একে একে নিভিছে দেউটী"।

যুগে যুগে অধরাকে যাঁরা টেনে আনেন ধরণীর বুকে দীপান্বিতা আনতে—তাঁরাও যে, যুগের বহু সাধনার ধন, চিরবাঞ্ছিত চির-দুর্লভ। তাঁদের বিদায় যে আঁধারের বধির যবনিকা, তাঁরাই তো আলোর উৎস!

❖ ❖ ❖ ❖
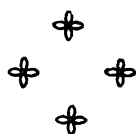
এরপর একটি বৎসর গেছে পার হয়ে। ১৩০৪ সালের বাদল-শেষে একরাশ অশ্রুহাসির মুক্তা ছড়িয়ে এসে দাঁড়ালো শরৎ, বলাকার পালকে তারি দিনলিপি, দূর আকাশে সোনার নান্দী। ধরার আঙিনায় বোধনতলায় কারো বাজে ব্যথার বাঁশী, কারো বা হাসির আলোয় আলো। তবু সবাই বরণ ক'রে নেয় বছরের পবে মায়ের পায়েব আলতা-রাঙা এই সোনার শরৎকে। ভক্তবর গিরিশচন্দ্র নিষ্ঠায় বিশ্বাসে একান্ত শ্রীরামকৃষ্ণের জন, চিরবিক্রীত শরণাগত দাস, আর যেন কিছু জানেন না শ্রীরামকৃষ্ণ ছাড়া, আর কিছু ভালো লাগে না। কিন্তু জানিনা লীলাময়ীর কী ইচ্ছা! সেদিন আকাশ-মাটিতে যখন রহস্যেব অনিদিশ অন্ধকাব, সেই অনবকাশের লগ্নে সুষুপ্তির দুয়াব ঠেলে নিদ্রাগত গিরিশচন্দ্রের সম্মুখে আবির্ভূতা বিশ্বজননী—দশপ্রহরণধারিণী, বিগলিত কাঞ্চনবর্ণা জ্যোতির্ম্ময়ী। দু'চোখের ত্রিকাল-স্তম্ভিত আলোয় দিক স্তম্ভিত ক'রে দেবীর প্রত্যাদেশ হ'ল গিরিশচন্দ্রের প্রতি—এ বৎসর যেন তাঁর পূজার আয়োজন করা হয়। তিনি আসবেন ভক্তের চণ্ডীমণ্ডপে—মনের মণিমণ্ডপে, কৃপা ক'রতে ধন্য ক'রতে। এদিকে গিরিশচন্দ্র ভৈরবের অবতার—শ্রীঠাকুরেরই শ্রীমুখের বাণী। বিশ্বেশ্বরীর এক কথায় তিনি তো রাজী হবার পাত্র নন। দুর্গাপূজার ইচ্ছা তাঁর মনের কোণে যে একটুও নেই, হয়তো নিষ্ঠার প্রাবল্যেই। কিন্তু সে-কথা কি শোনেন রঙ্গময়ী? সে অনিচ্ছায় কর্ণপাতও না ক'রে, আপনি দশ দিক আলোয় আলো ক'রে বসেন গিরিশচন্দ্রের চণ্ডীমণ্ডপে—অকালবোধনের মধু-মাঙ্গলিকে শিব-অনুচরকে ধন্য ক'রে। দুরন্ত শিশু মাকে দু'হাতে দেয় ঠেলে; মা কিন্তু তাকেই আঁকড়ে ধ'রে টেনে নেন বুকে। তা না হলে, মা কেন? ভক্ত-ভগবানের দ্বন্দ্বে ভগবানের হ'ল জয়। সেবার সত্য-সত্যই

গিরিশচন্দ্রের মন্দির ভ'রে ওঠে প্রতিমার দিব্য বিভায়। বিশ্বাসী প্রাণের পূজায় হেসে উঠেছেন প্রাণময়ী ঈশানী! কিন্তু নিষ্ঠার এতটুকু ত্রুটী হয় না, সাক্ষাৎ জীবন্ত-প্রতিমা জননী সারদার পূজাও চলে সমভাবে। নিকটেই বলরাম-মন্দিরে এসেছেন মা, আর এসেছেন গিরিশচন্দ্রেরই সাগ্রহ আহ্বানে।

কিন্তু আনন্দের মাঝে দুঃখের ছায়া একটু যেন থাকবেই। দেশ থেকে মা এসেছেন শরীরের অসুস্থতা নিয়ে। সে অসুস্থতা কাটেনি তখনও, তবু করুণাময়ী সাড়া দিয়ে এসেছেন ভক্তের আবাহনে। সপ্তমীর পূজা, অষ্টমীর পূজায় শ্রীচরণ ভ'রে গ্রহণ করেছেন শত ভক্তের ভক্তির অঞ্জলি, কিন্তু অষ্টমীর পূজা গ্রহণ করার পরে আবার মা'র শ্রীঅঙ্গে দেখা যায় জ্বরভাব, সন্ধ্যায় সন্ধিপূজায় আসার আশাটুকুও যায় চুকে। ভক্তদের প্রবল অনিচ্ছা: "না, মা, এই অবস্থায় কোনমতেই চলবেনা আপনার দেবদেহের পরিশ্রম।" ছোট্ট বালিকার মতো মা-ও মেনে নেন তাদের দরদী মনের অনুশাসনটুকু। এদিকে সন্ধিক্ষণ সমাগত, পুরাণের কল্পান্তরে নেমে এসেছে যেন বিরাম-স্তম্ভিত লগ্ন। অনাদি গায়ত্রী-মন্ত্রে থরথর ক'রে কাঁপছে সপ্তর্ষির জ্যোতির্ম্ময় ওষ্ঠ। ভীত-সন্ত্রস্ত ভক্তদল শ্রদ্ধায় আকূতিতে বদ্ধাঞ্জলি হয়ে দণ্ডায়মান—মন্দির পরিপূর্ণ। বেদ-মন্থিত উজ্জ্বল গাম্ভীর্য্যে দেবীমূর্ত্তি এক অপূর্ব্ব মহিমায় মহিমান্বিত। সকলেই উপস্থিত, অনুপস্থিত শুধু গৃহকর্ত্তা। তাঁর দুর্জ্জয় অভিমান—বিশেষ প্রকাশের সন্ধিক্ষণেই যদি এলেননা চিন্ময়ী দেবী, তবে কিসের সন্ধিক্ষণ? একপাশে জ্বলে ওঠে ১০৮ ঘিয়ের প্রদীপ, তন্ত্রধারকের উন্মুক্ত কণ্ঠে মহাচণ্ডিকার আবাহন-ছন্দ: "জাগো মা, জাগো! মহাজীবনের অমৃত-সঙ্গমে সার্থক হোক তোমার পুণ্য-আবির্ভাব—জাগো চৈতন্যরূপিণী চেতনের চেতয়িতা, হে জননী!" সহসা খিড়কির দুয়ারে চকিত করাঘাত: "আমি এসেছি।" সকলে ওঠে চম্‌কে—যাগদীপের আলোয় বুঝি জাগে লক্ষদীপের ঝলক, দেখা যায়, ধীর পদক্ষেপে মৃন্ময়ীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন চিন্ময়ী সচল-প্রতিমা

জননী সারদেশ্বরী। সন্ধিক্ষণের সে স্তব্ধ মৌনতা যেন আনন্দের জয়নাদে পড়ে ভেঙেঃ "ওরে, মা এসেছেন—মা এসেছেন!" সাড়া পড়ে যায় দিগ্‌দিগন্তে। সমাধির সাধন মঙ্গলরূপে জননীর সে-আবির্ভাব যেন সপ্তশতীর একটি স্বর্ণ-অধ্যায়। শুধু কানে বাজে না, এ সাড়া গিরিশচন্দ্রের প্রাণেও বাজে—গহিন অভিমানের দ্বার ঠেলে বাজেঃ "ওরে, মা এসেছেন!" অভিমানী শিশুর অভিমান হয় আনন্দে রূপায়িত—ছুটে আসেন নেমে। তখন পূজা হয়ে গেছে সুরু—রাশি রাশি পুষ্প-বিল্বদলের মাঝে মা সারদা দণ্ডায়মান, মৃন্ময়ীর নয়নে চিন্ময়ীর নয়ন—করুণানিবিড় সে-দৃষ্টি; স্ফুরিত সে-অধরে অলকার সুষমা। কে বলবে জ্বরকাতর দেবতনু? সমাধি-সায়রে যেন স্বর্ণ-শতদল! গিরিশচন্দ্র অঞ্জলি ভ'রে দেন পুষ্প, আর দেন অশ্রুর চন্দন—অভিমানে না আনন্দ, কে জানে! পরে বলেন ভাব-বিকম্পিত গদগদ-কণ্ঠে, "আমি ভাবলুম, বুঝি আমার পূজাই হ'ল না—এমন সময়ে দরজায় ধাক্কা দিয়ে বলছেন 'আমি এসেছি'।" ভগবান ঈশামসীর বাণীঃ "দুয়ারে ধাক্কা দাও, দুয়ার যাবে খুলে"। এ যুগে এ-বাণীর যেন হয়েছে রূপ-পরিবর্ত্তন। সে যুগে হয়তো ভগবানের দুয়ারে কর হানতো ভক্ত, আর এখন ভগবানকেই নেমে এসে ঘা দিতে হয় ভক্তের দুয়ারে। শোনা যায়, গিরিশচন্দ্রের অভিমান-ভরা আকূতি বেজেছিল মা'র অন্তরে, তাই সন্ধিপূজার একটু আগেই বলরাম-ভবনে হয়ে উঠেছিলেন চঞ্চল—ছেলে যে কাতর হয়ে ডাকছে, আর কি থাকা যায়? তাই একান্ত ক্লান্ত দেহ নিয়েও, সঙ্গিনীর সাথে পায়ে হেঁটে এসে দাঁড়ালেন ভক্ত-ভবনে। শাস্ত্রবাণী হ'ল সত্য—সন্ধিক্ষণ যে দেবীর বিশেষ প্রকাশের ক্ষণ, তাইতো বিশেষ প্রকাশ-ভঙ্গীতে স্থূলে এসে দাঁড়ালেন চিন্ময়ী মা।

* * *

কালের অচিহ্নিত পথে এরপর আরো দুটি বছর হয় উত্তীর্ণ। কুন্তলে বসন্ত-হিন্দোলের আকুলতা নিয়ে এলো বাসন্তিকা। ১৩১৫ সালের সেই ফাল্গুনে, মা'র শুভ অবস্থিতিতে আনন্দ-তীর্থ

কামারপুকুরে হ'ল শ্রীঠাকুরের জন্মস্মরণিকা-পালন। সুষ্ঠু সুচারু হর্ষ-পুলকেই সমাপ্ত হ'ল সেই মহোৎসব-লগ্ন। তারো এক বছর পরের কথা। ১৩১৬ সালের ৯ই জ্যৈষ্ঠ কলিকাতায় বাগবাজারে জননীর শ্রীমন্দির 'উদ্বোধন'-এর হ'ল শুভ উদ্বোধনী। বিশ্বের সপ্তস্বরায় সেদিন মঙ্গল-বৈজয়ন্তী; অধরার প্রাণপ্রতিমা প্রতিষ্ঠিত হলেন ধরার মন্দিরে। এই মন্দিরের অণুতে অণুতে জড়িয়ে রইলো মাতৃগতপ্রাণ স্বামী সারদানন্দের তিল তিল ক'রে আত্মদানের সাধনা। অপার মাতৃভক্তির মূর্ত্তরূপ এই উদ্বোধন-মন্দির। এগারো হাজার টাকা হ'ল ব্যয়; রিক্ত সন্ন্যাসী আপনি বহন করলেন সে-ব্যয়ভার। ঠাকুরের অদর্শনের পরে সুদীর্ঘ তেইশটি বছর ধ'রে কলকাতায় জননীর হয়নি একটি স্থায়ী মন্দির। কত অসচ্ছলতায় কত অসুবিধায় গেছে দিন, একদিকে মা'র অসীম তিতিক্ষা আর অন্যদিকে সন্তানের বুকের গভীর ব্যথা। পুরো তেইশটি বছরের মৌন সাধনায় গড়ে উঠেছিল মা'র এই 'উদ্বোধন', মা সারদার ক্ষুদ্র দেবায়তন। আজ যাঁদের নামে বিলাসের লীলাভূমি আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্যের নানা স্থানে এবং প্রাচ্যের দিগ্‌দেশান্তে গড়ে উঠেছে লক্ষ লক্ষ মুদ্রার বিনিময়ে দিব্যসম্ভারে সমৃদ্ধ গগনচুম্বী দেবায়তন, একদিন তাঁরাই গভীর তপস্যায় মাটীর মন্দিরে কাটিয়েছিলেন দীর্ঘদিন, আর সে তপস্যার অমৃত-ফল লাভ ক'রলো, ধন্য হ'ল তাঁদের ভবিষ্যতের সন্তান-গোষ্ঠী।

জননীকে দেবালয়ে প্রতিষ্ঠিত ক'রে সারদানন্দের আনন্দ যেন ধরে না! আপন উপাধি আপনিই গ্রহণ করেন: "আমি মা'র বাড়ির দারোয়ান।" তাইতো বলেন মা, "শরৎ আমার দ্বারী।" শুধু কি মা, শরৎ-মহারাজকে মা'র সাথে নিতে হয় তাঁর বিপুল ভক্ত-গোষ্ঠীরও ভার, নিতে হয় মা'র ঝঞ্ঝাটের অংশ। মায়ের সেবায়, মায়ের অংশস্বরূপ স্বামিপাদ যেন লাভ ক'রেছিলেন মাতৃসত্তা। তদাকারকারিত। মায়ের চিন্তায়, মায়ের সেবায় মাতৃময়—ধৈর্য্যে, গাম্ভীর্য্যে, সহিষ্ণুতায়, কোমলতায়, স্নেহে—

সর্ব্বপ্রকারে। তাই মা ও ছেলে উভয়েই উভয়কে মর্য্যাদা দিতে সম-সচেষ্ট। ··দীক্ষা নিতে এসেছে ভক্ত। মা'র শরীর অসুস্থ—ভক্ত কিন্তু ছাড়বে না; মা নিরুপায় হয়ে বলেন, "আচ্ছা, শরতের কাছে যাও। সে যা ব্যবস্থা ক'রবে, তাই হবে।" বলেন ভক্ত, "আমরা আর কাকেও জানি না।" মা বলেন, "বলো কি? শরৎ আমার মাথাব মণি! সে যা ক'ববে, তাই হবে।"

নির্ব্বাক স্থৈর্য্যে সব শোনেন শরৎ-মহারাজ। কী বলবেন, মূক হয়ে গেছে ভাষা করুণাময়ীর এই অপার করুণায়; শুধু বলেন, "মা এই কথা বলেছেন?" তারপর দেন দীক্ষা-দিবসের একটি নির্দ্দেশ।

আবার আর-একদিকে দেখি তাঁর অপূর্ব্ব দৈন্যের চিত্র; বসে আছেন 'উদ্বোধন'-এর কার্য্যালয়ে, প্রধানের গৌরব-আসনে—সম্মুখে 'লীলা-প্রসঙ্গ'র পাণ্ডুলিপি। ভক্ত এসে জানায় সাষ্টাঙ্গ নতি। স্বভাব-শান্ত ধীর সন্ন্যাসী স্থির দৃষ্টিনিক্ষেপে শুধু জিজ্ঞাসা করেন, "আমাকে যে এতবড় প্রণামটা ক'রছো, এর মানে কী বলো তো?" ভক্ত বিস্মিত হয়ে বলে, "সেকি মহারাজ! আপনাকে ক'রবোনা তো, কাকে ক'রবো?" মাতৃসেবক দীন কণ্ঠে বলেন, "তুমি যাঁর কাছে যাও ও যাঁর কৃপা পেয়েছ, আমিও তাঁরই মুখ চেয়ে বসে আছি। তিনি ইচ্ছা করলে, তোমাকে এখনই আমার এই আসনে বসিয়ে দিতে পারেন।" এ শুধু একটি দিনের মুখের কথা নয়, সারা জীবনে প্রতি পদক্ষেপে চলেছিল এরই মহাসাধনা।

দিনরাত্রির মধুসঙ্গমে কেটে চলে দিন ··· ১৩১৮ সালের কথা। হুগলি জেলার তীর ছুঁয়ে চলে গেছে তৃণাস্তীর্ণ পথ জয়রামবাটীর পানে। মাঝে মাঝে সবুজের-হর্ষে-ঢাকা ছোট ছোট গ্রামগুলি যেন লীলাতীর্থের পান্থশালা। ঠিক তেমনি একটি গ্রাম, নাম—কোয়ালপাড়া।

সেদিন তারই বুকে জেগে উঠলো একটি সুন্দর দেবারাম, আর তার প্রাণ-সঞ্চার হ'ল ১৩১৮ সালের হৈমন্তিক অগ্রহায়ণে, মা'র স্বীয় হাতে। শ্রীঠাকুরের চিন্ময়-চিত্র-প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ধন্য হ'ল

কোয়ালপাড়া। তার কুহেলি-স্বিন্ন দিক্‌চক্রে সেদিন জ্বললো যে দীপশিখা, ভাবী কালের গৈরিক শহীদের পথরেখায় আজও আছে তার শুভ ইঙ্গিত।

এর পূর্ব্বে ১৩১৩ সালেই হয়েছিল এর সূচনা। মনে পড়ে সেদিনের কথা—পাশ্চাত্ত্য হতে প্রত্যাগত স্বামী নির্ম্মলানন্দ, স্বামী ধীরানন্দ চলেছেন জয়রামবাটী—মাতৃদর্শনে। মাঝে পড়লো এই ছোট্ট গ্রামখানি। পথে দেখা হ'ল স্থানীয় স্কুল-শিক্ষকের সঙ্গে, নাম কেদার দত্ত। পথের প্রথম পরিচয়সূত্রে তিনি আবদ্ধ হলেন সন্ন্যাসী-বৃন্দের সাথে। কিন্তু অলক্ষ্যে হাসলেন অন্তরদেবতা; বুঝলেন—কলমীলতার আর-একটি এসে জুটলো কলমীলতার দলে। কেদার দত্ত অন্তর্ভুক্ত হলেন মা'র সন্তানগোষ্ঠীর মাঝে। মা'র অজস্র কৃপা—মা'র চরণাশ্রয়-লাভে হলেন ধন্য। সেদিন বিদায়-কালে জননী দিলেন উপহার শ্রীঠাকুরের আর স্বামীজীর দুটি প্রতিকৃতি—এ যেন সর্ব্বজয়ার নিজের-হাতে-দেওয়া জয়পত্রিকা। সেদিন হতেই লোক-কল্যাণ-ব্রতে কেদার দত্ত পেলেন দীক্ষা।

তাঁর সঙ্গে যোগ দিলো একদল উৎসাহী তরুণ, যাদের চোখে উদয়-উষার স্বপ্ন, বুকে এগিয়ে-চলার ভাষা। কেদার দত্ত রইলেন তাদের পুরোভাগে। তাদের সকলের সমপ্রচেষ্টায় তিনি প্রথমেই গ'ড়ে তুললেন একটি ক্ষুদ্র তাঁতশালা। ক্রমে এই সূত্র ধ'রেই ধীরে ধীরে এলো মঠের পরিকল্পনা, যার অপূর্ব্ব পরিণতি বর্ত্তমান কোয়ালপাড়া মঠ। সেই কুশলী কর্ম্মীদের মধ্যে কেদার দত্ত এবং আরও অনেকে নিলেন বেদ-নির্ণীত পথ—সন্ন্যাস-মার্গ। সর্ব্বত্যাগের পথ-অবলম্বনে সকলেই হয়ে রইলেন ঠাকুরের চিহ্নিত সেবক। এই কেদার দত্তই পরবর্ত্তী কালের স্বামী কেশবানন্দ মহারাজ।

মনে পড়ে মা'র প্রতি ঠাকুরের অভিনব দর্শনের কথা, আর বাণী: "একটি ছেলে চাচ্ছ, এইসব রত্নছেলে তোমায় দিয়ে গেলুম।" তার সঙ্গে আরো বললেন, "কালে কত লোকে তোমাকে 'মা' 'মা' ব'লে ডাকবে।" ডাকলোও তাই। বিশ্বের ছেলে এসে ডাক দিলো

মায়ের আঙিনায়—এলো শান্ত, অশান্ত-অবুঝের দল—বুক-ভরা ক্ষুধা নিয়ে এসে দাঁড়ালো মায়ের দ্বারে।

এ তো হু'দিনের মা নয়, এ যে চিরদিনের মা। তাই গিরিশচন্দ্র যখন জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কিরকম মা ?" সঙ্গে সঙ্গে মা'র কণ্ঠে জেগে ওঠে চিরদিনের উত্তর: "আমি সত্যি-মা। গুরুপত্নী নয়, পাতানো-মা নয়, কথার-কথা মা নয়,—আমি সত্যি-জননী।" মা না হলে, এমন কথা বলো কে বলে।

তাই যেদিন ভক্তবর গিরিশ গোপনে স্বচক্ষে দেখলেন, তাঁর ব্যবহৃত শয্যাদ্রব্য মা নিজে নিয়ে যাচ্ছেন সেগুলি পরিচ্ছন্ন ক'রে তুলতে—সেদিন দরদী ছেলের ব্যথাও যেমন জেগে উঠেছিল হু'চোখ ভ'রে, তেমনি অন্তরও ভেসে গিয়েছিল অপার আনন্দের প্লাবনে। স্নেহের পরিচয় সে যে বড় মধুর, গহন হতেও গহিন: "আমি সত্যি-মা"।

কোন ভক্ত ছেলে বহুদূর হতে ছুটে এসেছে—বুকে ব্যাকুলতা, পথক্লান্ত দেহ ঘর্ম্মাক্ত; ছুটে এলেন মা, হাতে পাখা,—স্নেহানিলে জুড়িয়ে দিলেন দেহ। তার সঙ্গে জুড়ালো ছেলের মন। সন্তানের শত নিষেধ তাঁকে রোধ করতে পারে না। শুধু কি তাই ? কোনও ছেলেকে খেতে দিলেন প্রসাদী হুধ-ভাত। সহসা আজন্ম মাতৃস্নেহে বঞ্চিত সেই সন্তানের হৃদয়ে স্নেহের বুভুক্ষা ওঠে জেগে; আবদার-ভরা কণ্ঠে ছোট্ট শিশুর মতো সে বলে, "নাঃ—খাইয়ে না দিলে, খাব না; ঠিক মায়ের মতোই খাওয়াতে হবে কিন্তু।" হুটি প্রার্থনাই ভক্ত করে আকূতি দিয়ে। সে আকূতি হয় পূর্ণ। অবগুণ্ঠনের আড়াল ঠেলে, মা খাওয়াতে বসেন ঠিক মায়েরই মতো পিঁড়িখানি পেতে।

আবার সন্ত-দীক্ষিত সন্তান খেতে বসেছে মায়ের সাথে। অপরূপ স্নেহ, শ্রীমুখে যেটি ভালো লাগে সেইটি তুলে দেন ছেলের হাতে। আহার-শেষে, গুরুস্থান-জ্ঞানে সন্তান আপন উচ্ছিষ্ট তুলে নিতে হয় উন্তত, তখন মায়ের মতো হাত ধ'রে দেন বাধা স্নেহের তিরস্কারে: "ও কী ক'রছো ?" গুরুজ্ঞানে ভক্ত জানায়, "আপনি এঁটো নিলে যে,

আমার অকল্যাণ হবে।" মমতায় গলিত কণ্ঠে বলেন জননী, "মা'র কোল ছেলে কত অপরিষ্কার করে, আমি তোমাদের কী ক'রতে পেরেছি, বাছা ?" আবার কোন ভক্তকে হয়তো বলেছেন, "তোমরা তো সব বড় হয়ে আমার কাছে এসেছ—আমি কী দোষ করেছি যে, তোমাদের এই সামান্য যত্নটুকুও করতে পারব না।" এ পাতানো-মা নয়, গুরুপত্নী নয়—এ যে চিরদিনের আপন-মা। এখানে শুধু মা আর ছেলে, আর সব সম্বন্ধের হয়েছে এখানে অবসান। উঁচু-নীচু, জাতি-কুল এখানে সবই যে যায় হারিয়ে। তাই যখন জাতির বাধাকে দূরে সরিয়ে রেখে, মা ভক্ত ছেলের সেবায় রত তখন অন্যান্য ভক্ত স্বজনের দিক থেকে আসে প্রবল আপত্তিঃ "তুমি বামুনের মেয়ে—গুরু, তুমি এদের এঁটো নাও কেন ? এতে যে ওদের অমঙ্গল হবে।" স্মিত অভয় হাস্যে অভয়ার মুখ ওঠে ভ'রেঃ "আমি যে মা গো, মায়ে ছেলের ক'রবে না তো, কে ক'রবে ?" "আমি যে মা গো" —এ তো শুধু কথার পরিচয় নয়, এ যেন অবুঝ শিশুর মুখে জননীর একমুঠো শিশির-ঝরা চুমা। অথচ সামাজিকতার নিয়মটুকুও নিয়েছেন মেনে। কিন্তু ভক্ত-ভগবান, জননী আর সন্তানের রাজ্যে সবই যে ভিন্ন আইনঃ "ভক্তের তো জাতি নাই"।

কোন নিম্নজাতি ভক্তের হয়তো জেগে উঠেছে সঙ্কোচ, কেমন ক'রে তিনি অপর উচ্চবর্ণের ভক্তদের সাথে ক'রবেন একত্র প্রসাদ-গ্রহণ। জননীর মুখে ফুটে ওঠে অভয়, দেন আশ্বাসঃ "তুমি কি যুগী ব'লে সঙ্কোচ বোধ করো ? তাতে কি বাছা, তুমি যে ঠাকুরের গণ—ঘরের ছেলে ঘরে এসেছ।" জানিনা কোন্ স্বর্গ-সান্ত্বনায় আর মায়ের গরবে ছেলের বুক কতখানি উঠেছিল ভ'রে!

শত শত দীক্ষিত সন্তানের শ্রীগুরুর আসনে অধিষ্ঠিতা জননীর গুরুভাবকে অতিক্রম ক'রে যেন বিকশিত হয়েছিল শত মাধুরীর মাধুর্য্য-মথিত এই মাতৃভাব, মাতৃরূপ!

দীক্ষাদান সমাপ্ত ক'রেই ত্রস্ত ব্যস্তে সন্তানের আহারের আয়োজনে হন রত। মধ্যাহ্নে আপন হাতে মূর্ত্তিমতী কমলার

মতো যখন পরিবেশন করছেন প্রসাদ—অপার্থিব করুণার পরসাদে শ্রীমুখ অরুণায়িত। মৌনমুখে সকলেই প্রসাদ-গ্রহণে রত, কিন্তু আনন্দে বিস্ময়ে সকলেই লক্ষ্য ক'রছে প্রত্যেকেরই প্রিয়বস্তুটি প্রত্যেকেই লাভ ক'রছে অপ্রত্যাশিতভাবে। শুধু তাই নয়, এমন অপূর্ব্ব-অনুভূতি-ভরা দিনও গেছে, যেদিন প্রত্যেকটি সন্তান অন্তরে অন্তবে করেছে অনুভব, যেন জননীব বিপুল স্নেহের অধিকারী সে-ই সবচাইতে বেশী—তাকেই মা অধিক স্নেহে দিচ্ছেন কৃপার পরসাদ। তাই প্রত্যেক সন্তানের মনেই জাগে সঙ্কোচ-ভরা লজ্জা যে, অপর ভাইগুলি হয়তো লক্ষ্য ক'বছে মা'র এই পক্ষপাতিত্ব। কিন্তু পবস্পরের আলাপে হয় প্রকাশ যে, ঐ একই অনুভূতিতে সকলেরই চিত্ত উঠেছিল ভ'বে আনন্দে ও সঙ্কোচে। এমনি মহামায়ার মায়া! মহামায়ার এই বিবাট মানসসত্তাই তো এককালে সৃষ্টির সমস্ত জড়ের বুকে এনেছিল চৈতন্যের অনুভূতি।·· ভক্ত নিয়ে এসেছেন দীন উপচাব, কিন্তু সেটুকুও কেবল ভক্তের মনস্তুষ্টির জন্য একটু গ্রহণ ক'রে, বাকী সবটুকুই বিলিয়ে দিয়েছেন ভক্ত ছেলেব সেবায়। অনুযোগ ক'রলে, বলেছেন, "তোমরা না খেলে কি আমি খেতে পারি?" কেউ হয়তো সামান্য চিঁড়ে ক'রে নিয়ে এসেছে, কিন্তু সে না খেয়েই চলে গেছে; জননীর হয় দুঃখ—চিঁড়ে তুলে রাখেন সন্তানের উদ্দেশ্যে। শুধু কি তাই—পাছে স্বজনকুল হয় বিরক্ত, তার জন্য বলেছেন বারবার, "আমার ছেলেদের কোন জ্বালা নেই।" সময়ে অসময়ে ভক্ত-আগমনে উত্ত্যক্ত অন্তরঙ্গ মেয়ে করেন বিরক্তি-প্রকাশ। তাকেও জননী করেন নিরুত্তর; বলেন—"ওরাই আমার সব। এমন ছেলে যেন আমার জন্মে-জন্মে হয়।" কত সহজ ক'রে দিয়েছেন সন্তানের চলার পথকে। গতিই প্রাণধর্ম্ম, কিন্তু সে-গতির মাঝে যদি থাকে একটি নির্ব্বাধ সারল্য, তবেই চলা হয়—সহজ চলা। দীক্ষান্তে ভক্ত জিজ্ঞাসা করেন নিজের অক্ষমতা জানিয়ে, "মা, আমার যে ঘুম থেকে উঠেই চা খাওয়ার অভ্যাস,—কী হবে?"

বোঝেন জননী সন্তানের কোথায় অক্ষমতা; স্নেহপূরিত কণ্ঠে

বলেন, "বাবা, মা কি কখনও সৎমা হয়? তোমার যেমন খুশী। আগে খেয়ে নিয়ে, তারপরে জপ-ধ্যান করবে।" শুধু কি তাই, ছেলেদের চায়ের অভ্যাসটুকু পূরণ ক'রতে, ভোরের আলো ফুটতে-না-ফুটতেই বেরিয়েছেন একটুখানি দুধের খোঁজে। আবার, দূরাগত সন্তান এসে দাঁড়িয়েছে, ধূলা-পায়েই সে ক'রবে মা'র শ্রীচরণ-পূজা। তাই কর্ম্মমন্দির থেকে ছুটে এসে দাঁড়াতে হয় দেবীর আসনে। তখন কে বলবে সেই কর্ম্মচঞ্চলা কমলা—ধীর সমাহিত দেবীমূর্ত্তি স্বর্ণপ্রতিমার মতো দণ্ডায়মান পিঁড়ির উপর, আর শ্রীচরণে ভক্তের অশ্রুসিক্ত ভক্তি-অর্ঘ্য! তারপর আবার চঞ্চলা মা ছুটলেন সেই ছেলেরই আহার যোগাতে। পূজ্যের আসনে দাঁড়িয়ে নিচ্ছেন যাঁদের পূজা, তাঁদেরই আহারের জন্য ঝুড়ি মাথায় যাচ্ছেন হাটে-বাজারে। "যোগক্ষেমং বহাম্যহম্" শাস্ত্রবাণীকে অতিক্রম ক'রে যায় জননীর এই তিল তিল ক'রে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার লীলা, প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত্তে!
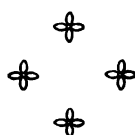
দূর-দিগন্তে গিয়ে মিলিয়ে গেছে অনির্দিশার পথরেখা। সেই পথ বেয়ে বহুদূর থেকে আসছেন ভক্ত—জগজ্জননীর দর্শন-মানসে, জননীকে কোন সংবাদ না দিয়েই। তিন দিনের পথ। পথের দিশা অজানা, শুধু ব্যাকুলতার ধ্রুব আশাটুকু সম্বল ক'রে ভক্ত যাত্রা ক'রেছে অদিশ-পথে। কিন্তু অন্তরদেবতা? তিনি তো অন্তরেই। তিনি যে নিয়ে যাচ্ছেন ঠিকই—দিশারীর আনন্দে। শুধু সবটুকু ভার তাঁর হাতে ছেড়ে দেওয়ারই অপেক্ষা। এক্ষেত্রেও ঘটলো তাই। ভক্তটি যাত্রা ক'রেছিল নিতান্তই একা, অসহায়। কিন্তু আনন্দ-বিস্ময়ে সে ছাখে, অজানা রহস্যের মতোই একজন-না-

একজন পথিক-সঙ্গী এসে তার সঙ্গ নেয়, আর অচিন পথ দেয় চিনিয়ে। দেব-প্রেরিতের মতো অপূর্ব্ব স্নেহ-যত্নে তারা তাকে নিয়ে চলে সঙ্গে : রেঁধে খাওয়ায় তৃপ্ত ক'রে। অবশেষে পথের প্রান্তে শ্রান্ত বালক এসে দাঁড়ায় মা'র দ্বারে ; দর্শনও মেলে, আর মেলে জননীর অসীম করুণা। ছেলের দু'চোখের অশ্রুতে মৌন ভাষা : "এসেছি মা, তুলে নাও তোমার কোলে !" যেন মা'র কত দিনের চেনা, তাই জাগে কত ব্যথা সন্তানের এতদূর ছুটে আসায় ; বলেন জননী—"এই কাঠ-ফাটা রোদে এত পথ এলে, বাবা, অসুখ হতে পারে যে।" তারপর যত্নের কথা আর না বললেও চলে ; শীতল ব্যজনে, প্রসাদের প্রাচুর্য্যে, তারপর মা'র কুটীর-প্রাঙ্গণে ছিন্ন ছায়াতলে বিশ্রামের মগ্নতায় ভক্তের সব-চাওয়াই হয় পরিপূর্ণ। এই চির-পরিচিতের ব্যবহার মা'র যেন ছিল সাধা। তাইতো বলেছেন "আমি আপন-মা"। তাইতো বিশ্বের ছেলে সবাই তাঁর চির-চেনা। তাদের আগমনের পূর্ব্বেই পেরেছেন জানতে তাদের আগমন-বার্ত্তা। তাদের পথের ব্যথা নিয়েছেন আপন অঙ্গে—ব্যবস্থা ক'রেছেন স্নেহভরা আপ্যায়নের। মনে পড়ে, পূর্ব্বোক্ত সন্তানই সেদিন বিদায় নিলেন মা'র শ্রীচরণ-বন্দনান্তে, চললেন স্বদেশাভিমুখে। কিন্তু হায়, অর্দ্ধপথ অতিক্রম ক'রতে-না-ক'রতে ঘটলো তাঁর ভাবান্তর, অদর্শন-ব্যাকুলতা যেন ছেয়ে ফেলে অন্তরের অন্তস্তল ! আর দেশের পথে পা চলে না ; চলার গতি ফিরে যায় মা'র লীলাতীর্থের পানে। ভক্ত আবার ছুটে চলে। গ্রীষ্মের পিঙ্গল চোখে তখন রৌদ্রবহ্নি। এদিকে অন্তর্য্যামিনী দেবী পারেন জানতে, ছেলে আসছে ফিরে। সহসা দিব্যতনু জ্বলে ওঠে অসহ দাবদাহে। আকুল হয়ে ওঠেন জননী : "আহা, বাছার আমার কত কষ্ট হচ্ছে !" ভক্ত-অঙ্গে লেগেছে তাপ—শতগুণ হয়ে সে-তাপ এসে স্পর্শ ক'রেছে মা'র কোমল অঙ্গে। এমন সময়ে অশ্রু-মলিন চোখে দাঁড়ায় এসে ভক্ত। ছুটে আসে মা'র অন্তরঙ্গ সন্তান ; বলে, "তুমি মাকে বড় কষ্ট দিয়েছ। রোদে রোদে আসছ ব'লে, মা আগে থেকেই বলছেন, তাঁর শরীর তাপে জ্বলে যাচ্ছে।"

শীতল ব্যজনে কেউ বা করে ভক্ত-অঙ্গ শীতল। তা না হলে, মা'র জ্বালা তো জুড়াবে না। ভক্ত শুনলেন, তাঁরই অপেক্ষায় সকলে এখনও পর্য্যন্ত প্রসাদ-গ্রহণে বিরত আছেন। কিন্তু উপায় কি! অন্তরের জ্বালা অসহ্য হয়ে ওঠে। মাতৃদর্শনের পূর্ব্বে খেতে কোন-মতেই মন ওঠে না। সে কথা প্রকাশও করে, কিন্তু সকলের সাগ্রহ অনুরোধে বসতে হয় প্রসাদ পেতে; কিন্তু মন বলে: 'মা, তুই তো জানিস মনের কথা'। এমন সময়ে আবির্ভূতা জননী। সত্যিই তো, মা তো জানে, ছেলে কী চায়। তাই বলেন, "ভয় কি, তোমার চিন্তা নেই। খাও। তুমি শান্তি পাবে।" এতক্ষণ যে অশ্রু চাপা ছিল হৃদয়ের মরুবালুতে, সে যেন পথ পায় স্নেহের পরশে—তার উচ্ছ্বাস আর থামে না। কোনরকমে তখনকার মতো শান্ত ক'রলেন মা অবুঝ ছেলেকে। অপরাহ্নে আবার নিজের কাছে ডেকে সে কত কথা, কত আশ্বাস, সান্ত্বনা! স্বর্গ যেন এ-পথ দিয়ে যেতে, পথ ভুলে দাঁড়ায় থম্‌কে। পরদিন রাত্রির তৃতীয় প্রহরে ভক্ত নেবে বিদায়—ভাবে, দূর হতে প্রণাম ক'রেই যাই চলে—মা'র যে কষ্ট হবে। ভাবতেই দেখেন, করুণাময়ী দুয়ার ধ'রে আছেন দাঁড়িয়ে, চরণধূলি দিতে। লুটিয়ে পড়ে ভক্ত—বিদায়-অশ্রুর নিবেদনে সিক্ত হয়ে ওঠে মা'র চরণ। আবার যেদিন চাকরির গোলমালে কারাবাসের সম্ভাবনা হয়ে ওঠে নিশ্চিত, সেদিনও ভক্ত আকুল ক্রন্দনে জানায় সব কথা মা'র চরণপ্রান্তে। অভয়া তখনও অভয়দানে সন্তানকে করেন রক্ষা: "ভয় নাই, কোন চিন্তা ক'রো না।" মাতৃবলে বলীয়ান ভক্তের হৃদয় হতে ভয় যেন দূরে পালায়, বিপদেরও হয় অবসান। কৃপা যে দুকূল-ভাঙা, তাতে আবার জগজ্জননীর কৃপা!

পরিব্রাজকের বেশে কোন সন্ন্যাসী-ছেলে নিতে এসেছেন মা'র আশিস্-ভরা অনুমতি—নিজের উদ্ধত ব্যবহারে নিজেই অনুতপ্ত হয়ে তিনি আজ যেতে চান সঙ্ঘের বাইরে, কপর্দ্দকহীন অবস্থায়। ছেলের অনুতাপ-ভরা ব্যথা মা'র প্রাণে বাজে; বলেন—"আমি মা, আমি কি ক'রে বলি, বাবা—তুমি যাও। আবার শুনছি, তোমার

হাতে পয়সা নেই, খিদে পেলে কে খেতে দেবে, বাবা?" বৈরাগ্যের উপল ভেঙে নামে অশ্রু-ভাগীরথী সন্ন্যাসীর চোখে। এ যে আপন মায়ের কথা! স্নেহের আকৃতি দু'হাত দিয়ে দেয় বাধা—ঘরের ছেলে ঘরেই র'য়ে যায়, যাওয়া আর হয় না।

আবার প্রয়োজন-বোধে অনুমতিও যে দেন নাই, তাও নয়—অশ্রু-সজল চোখেই দিয়েছেন বিদায়ঃ "হেসে নেচে চলে যাও—আমি আছি।" বলেছেন, "আমায় ভুলো না, বাবা!" তারপর আশ্বাসের নিবিড়তায় গভীর হয়েছে কণ্ঠঃ "আমি মা, মা কি ভুলতে পারে ছেলেকে?" সন্তান পদে পদে পেয়েছেন তার প্রমাণ। কোন ছেলেকে হয়তো পাঠিয়েছেন প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় ক'রে আনতে। মাতৃ-আদেশ শিরোধার্য্য ক'রেই এসেছেন ভক্ত। আদেশমতো সমস্ত দ্রব্য ক্রয় করবার পর, এক মণ হয় সেই ক্রীত দ্রব্যের গুরুভার। মাতৃ-আদেশ অক্ষরে অক্ষরে করতে চান পালন, তাই কারও মাথায় তুলে দেননা সে-বোঝা। মা তো দেননি আদেশ কোন কুলী নিতে, তাই সন্তান আপন মাথেই তুলে নেন সে-বোঝা। এদিকে দেহ গুরুভার বহন ক'রতে অনভ্যস্ত, তবু মাতৃ-আদেশ তো হবেনা ব্যর্থ। সন্তান চলেছে এগিয়ে মাথায় গুরুভার নিয়ে—একটি অটল স্থৈর্য্যে প্রসন্ন তার মুখ। কিন্তু হায়, বাদ সাধে দেহ। কিছুদূর যেতেই মাথায় সুরু হয় অসহ্য জ্বালা আর ব্যথা। শুধু কি তাই, দেখতে-দেখতে রুদ্রের প্রলয়-নৃত্য হয় সুরু—আকাশ ভেঙে নামে বাদল-ধারা। এক হাতে ছাতা ঝুড়ির ওপর ধরা আছে। এদিকে পিচ্ছিল কর্দ্দমাবিল হয়ে উঠেছে পল্লীর পথ। কোনরকমে স্খলিত পদে ভক্ত অতিক্রম করেন সে-পথ অনাবিল বিশ্বাসে। কিন্তু বিস্ময় জেগে উঠলো তখন, যখন বর্ষার মেঘসম্পাতে ভেঙে-পড়া একটি নীচু, সংকীর্ণ জলপূর্ণ প্রান্তর পার হয়ে যেতেই তাঁর মাথার বোঝা গেল সম্পূর্ণ হালকা হয়ে—তখন গভীর বিস্ময় ছাড়া কোন কারণই গেলনা পাওয়া। দেখতে দেখতে স্বচ্ছন্দগতিতে সন্তান এসে উপনীত হলেন মা'র দ্বারে। কিন্তু মন্দির-অঙ্গনে প্রবেশ ক'রেই নেত্র হয়ে

যায় স্তম্ভিত স্থির। চেয়ে দেখেন মা'র এক অদ্ভুত রূপ—তীব্র বেগে বারান্দার এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্তে ক্রমাগত বেড়াচ্ছেন ছুটে, শ্রীমুখে অগ্নির রক্ত আভা, বিস্ফারিত চঞ্চল আঁখি, যেন উত্তেজনায় ফেটে পড়তে চায় ; বলছেন, "ওগো, আমি কেন একটা কুলী নিতে বললুম না—আমি কেন একটা কুলী নিতে বললুম না!" সন্তানের চোখে জাগে অপার্থিব স্তব্ধতা, যার ভাষা মেলেনা এ জগতের বাণী-মন্দিরে। এতক্ষণে মেলে দিশা—মধ্যপথে সহসা কে তুলে নিয়েছিলেন সে-গুরুভার! যাই হোক, ভক্তের মাথার সে-বোঝা নামলে, মা'র সেই উত্তেজনাময় ভাবেরও হ'ল উপশম। শান্ত তিরস্কারে শুধু বললেন, "একটা কুলী নিতে হয়। আমি বলি নাই, তাতে কি হয়েছে? এরকম ক'রে কি আসতে হয়?" ইহ-পরকালের সকল ভার যিনি নিয়েছেন মাথার মণি ক'রে, সন্তানের মাথায় এই বোঝাটুকু তুলে দিয়েও বুঝি তিনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন না, তাই সে ব্যথাটিও নিতে হয় আপন দেহে।

মাতৃদর্শন-মানসে পল্লীর মাটীতে এসে কোন ছেলে হয়তো হয়ে পড়েছে জ্বরাতুর—চিন্তা-ভারাক্রান্ত হয় জননীর অন্তর পুত্রের অসুস্থতায়। কিন্তু সেই রাত্রে তাঁর দেহেও দেখা যায় জ্বরভাব। পরদিন ছেলে সম্পূর্ণ জ্বরমুক্ত হয়ে উঠে বসে। মা এসে কুশল প্রশ্ন ক'রে ব্যবস্থা করলেন তার পথ্যের। এমনি কতবার কত দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত সন্তানের আকূতিতে সর্ব্বমঙ্গলা আশ্বাস দিয়েছেন, "ভয় নাই, ভালো হয়ে যাবে।" তারপর সেই জন্মজন্মার্জ্জিত দুস্তর ভোগরাশি আকর্ষিত হয়েছে সেই করুণার জাহ্নবীতে।

মানস-তনয়া গৌরীমা—মায়ের সমর্থী কর্ম্মী মেয়ে, তাই তাঁর দেহটি যেন মোহরের ঝাঁপি ব'লেই মনে হয় মা'র। সে-বার কলকাতায় সংক্রামক ব্যাধি এলো তার মরণবীজ ছড়িয়ে দিতে। ঘরে ঘরে বসন্তের প্রাদুর্ভাবে মৃত্যুসংখ্যা কম হ'ল না। সে কী দুর্দ্দিন! গৌরীমা তখন বলরাম-মন্দিরে। সেদিন মধ্যাহ্নের রক্ত-আঁখি যখন প্রকৃতির বুকে আগুন ছড়িয়ে দিচ্ছে—দ্বিপ্রহরের

মন্থরতায় জীবনের ক্লান্ত নিশ্বাস, ঠিক এমনি মুহূর্ত্তে সহসা দেখেন গৌরীমা, ঝড়ের বেগে ঢুকলেন জননী। স্থূলে? না সূক্ষ্মে? কে জানে! চোখ দিয়ে তা যেন ধরা যায় না। এসেই, গৌরীমার সমস্ত অঙ্গ যেন কল্যাণ-হস্তে ঝেড়ে দিলেন। তারপর যেমন এসেছিলেন পাগ্‌লা ঝোড়ো-হাওয়ার মতো, ঠিক তেমনি ক'রেই গেলেন চ'লে। শুধু একটি নীরব প্রতিধ্বনির মতোই মনে হ'ল এই আসা আর চ'লে-যাওয়া। দু'দিন যেতে-না-যেতে দেখা গেল—একদিকে 'উদ্বোধন'-এর একটি গৃহকোণে মা হয়েছেন শয্যালীন, নিষ্ঠুর বসন্ত এসে আশ্রয় নিয়েছে তাঁর অঙ্গে; আর-একদিকে বলরাম-মন্দিরে গৌরীমা বসন্তের তীব্র জ্বালায় শয়নলীন। সেবার তাঁর জীবনের আশাই ছিল না। কিন্তু মায়ের মেয়ের কাজ যে এখনো অনেক বাকী, তাই হয়না যাওয়া। মা তাঁর দেহস্থিত ভোগরাশির খানিক অংশ নিলেন আপন দেহে আকর্ষণ ক'রে। নীলকণ্ঠেব এই বিষ-মন্থনই তো এ-যুগের বিশেষত্ব। মনে পড়ে, বেদন-সুন্দর এক প্রভাত—দূর পাশ্চাত্ত্যের অধিবাসিনী এসে সেদিন জানালো প্রার্থনা: "মা, আমি বড় কাতর আছি। আমার একটি মেয়ে, বড় ভালো মেয়ে, তাহার কঠিন পীড়া হইয়াছে। তাই মা, আপনার করুণা ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি। আপনি দয়া করিবেন, মেয়েটি যেন ভালো হয়।" বিলাসের লীলাভূমি হতে পাশ্চাত্ত্য-বাসিনী এসে দাঁড়িয়েছে ভারতলক্ষ্মী জননীর চরণান্তিকে, দীন আকৃতি নিয়ে; তাঁর করুণা-ভিক্ষায় পূর্ণ ক'রে নিয়ে যাচ্ছে রিক্ত ঝুলি, এ দৃশ্য বুঝি জগৎ দেখলো এই প্রথম—বিশ্বজননীর নব আবির্ভাবে। ভারত বুঝলো, তার প্রাচীমূলে জেগেছে যে উদয়-আলোর' আশা, তার ডাক পৌঁছেছে ওপারের প্রতীচীতে। জননীর আশীর্ব্বাণী হয় স্বতঃস্ফূর্ত্ত: "আমি প্রার্থনা ক'রবো তোমার মেয়ের জন্য; ভালো হবে।" আর কী ভাবনা—আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে বিদেশিনী। বেথেলহেমের একটি আনন্দ-মন্থর লগ্ন যেন ভিড় করে তার চোখে; বলে, "আপনি যখন বলিতেছেন ভালো হইবে, তখন

ভালো হইবেই নিশ্চয়—নিশ্চয়—নিশ্চয়।" বিশ্বাসের তড়িৎশিখায় দীপ্ত হয়ে ওঠে তার মুখ, তার কণ্ঠ।

সদয়া জননী গোলাপ-মাকে করেন আদেশঃ "ঠাকুরের ফুল একটি একে দাও।" একটি পদ্ম এনে গোলাপ-মা দিলেন জননীর হাতে। ফুলটি হাতে ক'রে ফিরে চাইলেন মা ঠাকুরের পানে; মনে-মনে কী-যে কথা হ'ল, বাইরে তা বুঝলোনা কেউই। তারপর সেই প্রসাদী কমলদল তুলে দিলেন আর্ত্ত মেয়ের হাতে; বললেন—"তোমার মেয়ের মাথায় বুলিয়ে দেবে।" বিদেশিনীর সে কী আর্ত্তিভাঙা রূপ—কৃতজ্ঞতার ভারে সে যেন লুটিয়ে পড়বে মা'র চরণধুলায়! জোড়হাতে বলে, "ফুলটি লইয়া কী করিব?" "কেন, কী আর ক'রবে, শুকিয়ে গেলে গঙ্গায় ফেলে দেবে।" চিরন্তন রীতিই দেখান গোলাপ-মা। কিন্তু বিদেশিনীর কাছে এ যে পরম-পাওয়ার ধন! একান্ত প্রতিবাদের ভঙ্গীতে তাই সে ব'লে ওঠে, "না, না, এ ভগবানের জিনিস। ফেলিয়া দিব? একটি নূতন কাপড়ের থলে করিয়া রাখিয়া দিব। সেই থলেটি মেয়ের গায়ে রোজ বুলাইয়া দিব।" সস্নেহ সম্মতি পান তিনি মা'র মুখেঃ "হ্যাঁ, তাই ক'রো।" কী জ্বলন্ত বিশ্বাস! বিদেশিনী বলে, তার অতীত জীবনের কাহিনী। তার আরও একটি সন্তানের শৈশবে ঘটেছিল যে ঘটনা। একদিন সে-সন্তানটিও হয়েছিল রোগকাতর। সেদিন বিদেশিনী ঠিক এমনি আকুতিই জানিয়েছিল তাদের অলখ-দেবতা ঈশামসীর চরণতলে—সরস অশ্রুসিক্ত একটি রুমাল দিয়েছিল বিছিয়ে, যেমন ক'রে কাঙাল পাতে তার ভিক্ষার ঝুলি। কতক্ষণ চেয়েছিল জানি না। পরে সে যখন প্রার্থনা-অন্তে চোখ মেলে চাইলো, দেখলো তিনটি কাঠি র'য়েছে সেই রুমালের ভিতর। কী যে পেল, সেই জানে। ছুটে নিয়ে এলো তার রুগ্ন শিশুর শয্যাপাশে, বুলিয়ে দিলো সেই তিনটি কাঠি তার অঙ্গে। কৃপার জিয়ন-কাঠির পরশ পেয়ে মৃত্যুমুখে এসে পড়লো নবজীবনের আলো! বলতে বলতে আর হয়না বলা—চোখ ভ'রে তার নামে অশ্রুগঙ্গা। তারপর

আবার অন্তরের আকূতিটুকু জানিয়ে সে নেয় বিদায়। সম্বল ক'রে নিয়ে যায় মায়ের প্রসন্ন আশিস্ আর কৃপার আমন্ত্রণ: "তুমি মঙ্গলবারে এসো।" ঠাকুরের কী মহিমা! এবারেও সে পেলো বিশ্বাসের পুরস্কার। কন্যারত্ন তার উঠে বসলো নীরোগ হয়ে, আর মঙ্গলবারে এসে সেও পেলো মা'র করুণার দান—ইষ্টমন্ত্র। সীমা-অসীমার মিলন-মাঙ্গলিকে গড়া এ-যুগের এই মাতৃভাব-লীলা!

সন্তানের কুশল-চিন্তায় কত তন্দ্রাহীন রজনী যেত পার হয়ে। একদিন নয়, দিনের পর দিন। তাই গভীর রাতেও ভক্ত এসে পেয়েছে সমান আদর-আপ্যায়ন। গভীর রাতে সন্তানের স্মৃতির তীর্থে মা'র স্নেহের পরশ হয়ে থাকে অম্লান; সে ভুলতে পারেনা সে-মমতা-মথিত কণ্ঠ: "তোমাদের আসতে এত দেরি হ'ল? এসো, আগে ঠাকুরের প্রসাদ পাবে এসো—আমি তোমাদের জন্য সব তুলে রেখে দিয়েছি।" স্নেহমুগ্ধ সন্তান বলে, আবেশ-বিজড়িত কণ্ঠে: "আমরা যে আসবো, আপনি কি ক'রে জানলেন?" বলেন মা, "ঠাকুরকে ভোগ দেবার পরই বুঝতে পেরেছি, তোমরা আসছ।" তারপর সন্তানকে তৃপ্ত ক'রে তবে মা'র শান্তি।

ছেলে এসে ধরে আবদার: "মা, তোমার প্রসাদ শুকিয়ে নিয়ে যাব আমার দেশে, দূরেদেশে গিয়েও তোমার প্রসাদ হতে বঞ্চিত হতে মন যেন কেমন করে।" সস্মিত মুখে সম্মতি দেন জননী: "বেশ তো, বাবা, নিয়ে যেও।" ভোগ-শেষে ছেলের হাতে দিলেন প্রসাদ। ছোট্ট একটি থালায় সে-প্রসাদ রোদ্দুরে শুষ্ক করতে দেওয়াও হ'ল। কিন্তু ছেলে ধ'রে রাখতে পারেনা সে-আকূতি। জয়ী হয় মায়ের করুণা। দেখা যায়, প্রসাদের কথা ভক্ত হয়েছে সম্পূর্ণ বিস্মৃত, আর সারাটি দ্বিপ্রহর করুণাময়ী ক্ষণিক বিশ্রামের অবকাশটুকুতে ব'সে প্রহর গুনছেন, ভক্ত সন্তানের প্রসাদী অন্ন পাছে কেউ নষ্ট ক'রে ফেলে। অপরাহ্নে স্মরণে জাগতেই, ছুটে আসে ভক্ত, ছাখে—মা তেমনিভাবেই আছেন উপবিষ্টা। বিস্মিত ভক্ত বলে, "মা, তুমি বিশ্রাম করনি?" সহজ শান্তকণ্ঠে আসে উত্তর: "বাবা,

তোমার ওটি পাছে নষ্ট হয়, তাই বসে আছি।" লেখনী-বন্ধনীতে হয়তো ধরা আছে এমনি ছোট্ট দু'-একটি চিত্র, কিন্তু এমনি ক'রে অলখ-করুণার আলোয় তাঁকে প্রতিক্ষণে দেখেছিল তাঁর বিশ্বের ছেলেমেয়ে—অবহেলার পরিবর্ত্তে তারা হয়েছিল মা'র স্নেহের উত্তরাধিকারী। যখন যেমনভাবে চেয়েছে, তেমনিভাবে পেয়েছে মা'র অনন্ত-উৎসারিত কৃপার ধারা। শোনা যায়, পথে চলেছে দুটি ভক্ত, মনে-মনে তাদের অভিলাষ—আর কিছু নয়, শুধু একটুখানি সেবার অধিকার যদি আজ পাই, ধন্য হবে জীবন, পূর্ণ হবে আশা। কিন্তু দুজনের মনের কথা দুজনের মনেই থাকে গোপন; প্রকাশ আর হয় না। এদিকে মুখে অবিরত মাতৃনামের জয়ধ্বনি দিতে দিতে, মাতৃসকাশে পৌঁছে ছাখে ভক্তদ্বয়—প্রসারিত শ্রীচরণে উপবিষ্টা অন্তর্য্যামিনী, প্রতীক্ষারত দুটি আঁখি; স্নানে যাবেন তাই নিকটে ছোট্ট একটি বাটিতে তেল। কুশল-প্রশ্নাদি সমাপনে, ভক্তদ্বয় চরণ-দুটি টেনে নিয়ে মাখিয়ে দেয় তেল। এতক্ষণে তাদের সাধ মিটলো। প্রসন্ন নয়নে বলেন মা—"এবার হয়েছে তো?" কৃপা নিত্য, শুধু আমাদের চাওয়াই হয়ে পড়ে অনিত্য, তাই বুঝি গৌরসুন্দরের অশ্রুর নিবেদন মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে আমাদেরই ভাব-ছন্দে—

> এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্ মমাপি
> দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনিনানুরাগঃ।
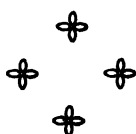
চৈত্রের বৈরাগ্যে ঝরা পাতার রিক্ততাই বুঝি আনে মাটীর মায়ের বুকে স্নেহের সংবেদন, ভীরু অশ্রুর এক-ফোঁটা নিবেদনেই বুঝি লুকিয়ে থাকে সাগরতৃষার অনেক কথা!

• সেদিন দীন দরিদ্র এক ব্রাহ্মণ এসেছেন বিশ্বেশ্বরীর মন্দিরে—চোখে মুখে তাঁর দীনতার আকুলতা। তবু একদিকে মাতৃদর্শনের আনন্দ-উল্লাস, আর-একদিকে রিক্ত প্রাণের ব্যর্থতায় যেন তাঁর মনের অকূল কূলে চলে জোয়ার-ভাটার হাসিকান্না। কপর্দ্দক-হীন অবস্থা, কিন্তু মাতৃদর্শনে রিক্ত হাতে আসতে ঠেকে বাধা, তাই সঙ্গে এনেছেন এক পয়সার বাতাসা কয়েকখানি—অতি-সঙ্গোপনে চুপি চুপি একান্ত রিক্ত প্রাণের নৈবেদ্য। কিন্তু হায়, মন যেন কোনমতেই পারেনা এই বেদন-দৈন্যকে অস্বীকার ক'রতে; অশ্রুভারে দু'চোখ হয়ে ওঠে আকুল। মৌন নতশিরে ভাবেনঃ কেমন ক'রে তুলে দেবো, মা, তোমার হাতে এই সামান্য নৈবেদ্য ?

তবু তুলে দিতে হয়—দ্বিধা-বিজড়িত কম্পিত হাতে। দীনের নিবেদন-আকুলতায় মা-ও যেন আকুল; পরমানন্দময়ী পরমানন্দে তখনি ছোট্ট বালিকাব মতো মুখে দেন সেই বাতাসা। মনে পড়ে, মথুরাধিপতি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের ক ছে লজ্জিত সুদামার সেই সামান্য নিবেদন, আর সুদামা-সখার তাই মহানন্দে ভক্ষণ; আর, তারপর শ্রীমুখচ্যুত প্রসাদকণায় পরিতৃপ্ত কৃষ্ণমহিষী রুক্মিণী। যুগে যুগে একই লীলা নবরূপায়ণে !

আর একদিনের কথা। বসন্তের আবীর-হিন্দোলে তখন আরক্তিম ধরায় আনন্দলোক! জননী তখন কোয়ালপাড়া আশ্রমে। পল্লীর ছায়াপটে আঁকা সেই তীর্থদেউলের চারপাশেও জেগেছে ফাল্গুনের মধুবন্তী। সুদূর উড়িষ্যা-দেশের অধিবাসী জনৈক ভক্ত এসেছে ফাল্গুনীপূর্ণিমায় দোল-উৎসবে; সাধ—মাতৃচরণ রঞ্জিত ক'রে দেবে আবীরে কুমকুমে। কিন্তু দর্শনের আকুলতায় উদ্বেগে সেই আবীরটুকু নিতেই হ'ল ভুল। যোজন-পথ পার হয়ে দোল-উৎসবের প্রভাতেই যখন মিললো মাতৃচরণ-দর্শন, তখন শূন্যহাতের প্রণামটুকু ছাড়া, আর কোন সম্বলই তার নেই। বৈকালে আবার এলো ডাক, কিন্তু এ ডাক তার জন্যে নয়। আগন্তুক দর্শনার্থী, যারা নাকি সকালে মা'র দর্শন পায় নাই, কেবলমাত্র তাদেরই মাতৃদর্শনে

যাবার এই আদেশ। বহুদিনের অতৃপ্ত আশা যেন নির্ম্মম আঘাতে পড়ে ভেঙে, তবু ভক্ত এগিয়ে যায়; কিন্তু অপর দিক থেকে আসে নিষেধ-বাণী: "আপনার যাবার হুকুম নেই।" বহুদূর থেকে বহন ক'রে আনা আশা হয় ব্যথাহত—ফিরে যাবার পথও নয়নপথে যায় হারিয়ে, নির্ব্বাক নিশ্চল চোখে দাঁড়িয়ে থাকে ভক্ত। এমন সময়ে আসে ডাক: "মা ডাকছেন।" নয়নজলে ভক্ত এসে দাঁড়ায় মা'র দ্বারে। অপরূপা তখন বসে আছেন ছোট্ট বালিকার মতো—সামনে আবীর-পরিপূরিত থালা। আনন্দময়ী ফুল্লকুসুমিত মুখে বলেন—"ওরে, আজ যে দোলপূর্ণিমা, ফাগ দিতে হয়।" নয়ন-জলের কুমকুমে বুঝি আরো রাঙা হয়ে ওঠে আবীর; অশ্রু-আবেগে ভক্ত মাখিয়ে দেয় মা'র এলিয়ে-পড়া চরণ-দুটিতে। সে ফাগের রাগে রেঙে ওঠে গোধূলি-আকাশ—রেঙে ওঠে ভক্তের হৃদয়-বৃন্দাবন। এমনি আরও কত লীলা! কোন ভক্ত হয়তো মনে-মনে অন্ন নিবেদন করছে—সহসা মা হয়ে পড়েন আবিষ্ট দিব্যভাবে। আপনি তুলে নেন সে অন্ন; বলেন, "এ তো ঠাকুরের প্রসাদ—এই ছ্যাখো, আমি নিজেও প্রসাদ ক'রে দিচ্ছি।" ভক্ত হয় ধন্য। সেদিন মা'র হাতের জলটুকুও যেন লাগে সুধার মতো। একদিকে ভক্ত অফুরান তৃষ্ণায় পান ক'রেই চলেছে কমলার সুধার কলস উজাড় ক'রে, আর জননী দিয়েই চলেছেন অকৃপণ হাতে—আর শ্রীঅধরে ফুটে উঠেছে অলকার আনন্দশ্রী। বিস্মিত ভক্ত বলে—"মা গো, এ যে সুধা!" তেমনি হাসি-ভরা মুখেই বলেন মা—"তা হবে।"
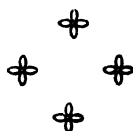
বাদল-শেষের শরৎ-সোনার দিন। পল্লীর পথে আকুল হয়ে লুটিয়ে পড়েছে পুষ্পিত সপ্তপর্ণের বেলা। ভক্ত আসছে কলিকাতা

হতে জয়রামবাটী, সঙ্গে শরৎমহারাজের দেওয়া কিছু উপহার—তাঁর আদেশ, সেগুলি পৌঁছে দিতে হবে মাতৃমন্দিরে। সহসা বেজে ওঠে মেঘডম্বরু। হায়, আলোর পথে আঁধারের পরীক্ষা—একি চিরন্তন! তারপর আকাশ মাটী মুখর ক'রে সুরু হয় প্রলয়-ঝঞ্ঝা আর প্রবল ধারাসার, আকুল হয়ে ওঠে ভক্ত—বুকে চেপে ধরে উপচারগুলি; ভাবে: হায়, বুঝি স্বামিপাদের আদেশ হয় লঙ্ঘন, বুঝি অক্ষমতার অপরাধে অপরাধী হতে হয় মাতৃচরণে! এদিকে সন্তানের আগমন-বার্ত্তা বেজে ওঠে নাড়ীর টানে। শুধু কি তাই, তার পথের ব্যথাটুকুও এসে ঘা দেয় মা'র হৃদয়-দ্বারে। নিকটস্থ ভক্তদল বোঝে না, কেন জননী চকিত চরণে দণ্ডে দণ্ডে আসছেন ঘরের বাইরে, আর তৃষিত নয়নে চাইছেন মেঠো পথের পানে; বলছেন, "বাছার আমার ঝড়-বৃষ্টিতে না জানি কত কষ্টই হয়েছে!" মহামায়ার ইচ্ছায় শেষে পরাভূত হয় প্রকৃতির সেই রুদ্ররূপ। অশান্ত মেয়ে হ'ল শান্ত, ভক্তও পৌঁছলো নির্ব্বিঘ্নে মাতৃচরণে—প্রণাম-নিবেদনের দেরিটুকুও যেন হয় অসহ্য। বলেন জননী, আপনার ভুক্তাবশিষ্ট পাত্রে প্রসাদী অন্নব্যঞ্জন সজ্জিত ক'রে—"ব'সে পড়ো, বাবা, এ পাতে আমি খেয়েছি।" মূক-বিস্ময়ে ভাবে ভক্ত: "তুমি কি মা শুনতে পাও সন্তানের মানসবাণী—তার শত অভিলাষে পূরিত মর্ম্মব্যথা? আমার যে বহুদিনের সঞ্চিত আশা, তোমার ভোগ-শেষে তোমার প্রসাদী পাত্রের প্রসাদে যেন অধিকারী হই—সে সাধ আমার এমন ক'রে পূর্ণ ক'রলে জননী!"
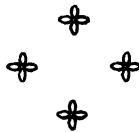
কোয়ালপাড়ার মঠে এসেছেন মা, কলিকাতা-যাত্রার পথে। একমুঠো আলোর মতো যেন মুহূর্ত্তে সে-সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে

সারা গ্রামখানিতেঃ মা এসেছেন, ওরে, মা এসেছেন! হোক-না সে যত চকিতের অবসর, তবু এক-ফোঁটা স্বাতীর অমৃতই যে পারে সাত-সাগরের তিয়াস মিটাতে! দলে দলে আসে অগণিত ভক্ত—পাবে একটু-ক্ষণের জন্য মায়ের করুণা-ভরা সঙ্গ, শুনবে স্নেহের সাগরে দোল-জাগা দুটি কথা; প্রসাদে প্রসন্নতায় হবে ধন্য। যতটুকুই হোক না, তাই বা কী কম! সুদুর্লভ সেই মুহূর্ত্তটুকু হারাতে চায়না কেউই। আনন্দের কলগুঞ্জনে ভ'রে উঠেছে ছোট্ট মঠবাড়িখানি। সকলের মুখে হাসি, কিন্তু দেউলের বাইরে একটি ভিখারী বুকের কান্না ছাড়া বুঝি বাজেনা মা'র পূজার বাঁশী। তাই দূর মাঠে নীরবে অশ্রু ফেলে মা'র একটি কৃষক-ভক্ত। কাজ সে ক'রছে, কিন্তু কাজে তার মন লাগে না; অশান্ত ব্যথিত মন তার মঠভূমির ধুলায় ধুলায় বুঝি আছড়ে কেঁদে ফিরছে। কোন কারণে সে বিতাড়িত হয়েছে মঠ থেকে—মঠের প্রবেশ-দ্বার নাকি তার জন্য চিররুদ্ধ। বেদনায় মর্ম্মাহত হয়ে সে কাঁদছে, এমন সময়ে কানে আসে কার ডাকঃ "পদো, মঠে আয়।" চেয়ে ছাখে ভক্ত—জনৈক মঠবাসী সন্ন্যাসী তাকে ডাকছেন। বিস্মিত হয়ে সে জানায়, "কেমন ক'রে যাব? সেখানে যে যেতে প্রধানের নিষেধ আছে।" "তিনিই ডাকছেন"—জানান সন্ন্যাসী। দীন রাখাল-ছেলে ছুটে আসে; এসে শোনে—মঠাধ্যক্ষ নন, ডেকেছেন মঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবী স্বয়ং—ডাক দিয়েছেন মা-জননী। মা ডেকেছেন? —মা? আনন্দে অশ্রু টলটল ক'রে ওঠে ছেলের চোখে। দেহযষ্টি ভেঙে পড়ে জননীর শ্রীচরণপ্রান্তে। সব ব্যথার বাণী হয়ে যায় শান্তির অতলে খেইহারা। তারপর মা'র হাতে একটুখানি প্রসাদ আর স্নেহসিঞ্চিত সান্ত্বনাঃ "বাবা, বাসনা পূর্ণ হয়েছে তো?" দীন সন্তানের মনে ব্যথা আর ঠাঁই পায়না, অথৈ লাগে সুখের সায়র। চোখের জলে মায়ের সোহাগ, সে যে কত মধুর—সে যে পেয়েছে, সেই জানে।

* * *

তুমি যে, মা, অশরণের শরণ—তাইতো দীনের তরে নিত্য খোলা তোমার করুণার দেউলখানি! মঠের সামান্য চাকর চুরি করার অপরাধে হয়েছে অপরাধী—মঠে তার স্থান হয় না; চোখের জলে সেও যখন জানায় তার ব্যথা, জননীর চরণপ্রান্তে—জানায় অভাবের তাড়নায় তার স্বভাব হয়েছে নষ্ট, তখনও দেখি শতস্ফুরিত করুণায় বিগলিতা মাতৃমূর্ত্তি তাকে আপন মন্দিরে স্থান দিয়ে স্নানাহারে পরিতৃপ্ত ক'রছেন সযত্নে। অপরাহ্নে যখন দরদী ছেলে বাবুরাম এসেছে মাতৃদর্শনে, তখন অপরাধীর দিক নিয়েই তার প্রতি গভীর সহানুভূতিতেই মা সর্ব্বত্যাগী সন্তানকেও করেছেন আঘাত; বলেছেন, "তোমরা সন্ন্যাসী; সংসারের কত জ্বালা, তোমরা তো তার কিছু বোঝ না। লোকটিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাও।" সভয়ে জানান বাবুরাম-মহারাজ, "ফিরিয়ে নিয়ে গেলে, নরেন-ভাই যে হবে বিরক্ত।" দীপ্তকণ্ঠে ধ্বনিত হয় মা'র আদেশ: "আমি বলছি, নিয়ে যাও।" মাতৃ-আদেশ হয় শিরোধার্য্য—মা'র দুঃখী সন্তান আবার মঠে আসে ফিরে। প্রথম-দর্শন-মাত্র বিরক্ত হয়ে ওঠেন স্বামীজী, কিন্তু যে মুহূর্ত্তে শোনেন স্বয়ং সংঘজননীর আজ্ঞা, নম্রমাথা ফণীর মতো নরেন মেনে নেন মা'র সেই আদেশ—মা'র একান্ত অনুগত বালক ছাড়া আর কী?

* * *

কৈশোরে পাতানো ডাকাত-বাবার মতো এমনি কত ডাকাত-বাবার কলুষিত চিত্ত যে হয়েছে নিকষিত কাঞ্চন—স্নেহের পরশমণিতে, তার তো হিসাব মেলেনা ইতিহাসের পাতায়। মায়ের একদিকে যেমন কোল-আলো-করা ছিল শুদ্ধসত্ত্ব সুপুত্রের দল, তেমনি কুপুত্রেরও ছিলনা অভাব। কিন্তু তারাও বঞ্চিত হয়নি। বিতাড়িত হয়নি মা'র মমতার প্রাঙ্গণ হ'তে। সে প্রাঙ্গণে সকলেই পেয়েছে শান্তি পাবার মতো, জুড়োবার মতো একটুখানি ঠাঁই। উপরন্তু যে নাকি সকলেরই হ'ত একান্ত উপেক্ষার পাত্র, মা'র সোহাগ-ভরা পক্ষপাতিত্ব তাকে যেন শত বাহু মেলে রাখতো ঘিরে,

আর তারই অপরূপ ফলস্বরূপ দেখ। যেত তার অসৎ প্রবৃত্তির স্থানে এসে ঠাঁই নিয়েছে এক বিচিত্র পরিবর্ত্তন।

মুসলমান ডাকাত আমজাদ শিরোমণিপুরের বাসিন্দা, দস্যু-বৃত্তিতে খ্যাতি তার ছিল বেশই। শুধু সে কেন, ঐ শিরোমণি পুরের বহু মুসলমানেরই এই হিংস্রবৃত্তিই ছিল উপজীব্য। গ্রামবাসীর কাছে তারা ছিল ভয়ের বস্তু। দিন-মজুরির কাজে তাই তারা কোনদিনই কোন গৃহ হতে ডাক পেত না। কিন্তু তাতে কি আসে যায়, অসীম করুণার প্রতিমা দয়াময়ী মা যে আছেন সবার তরে। তাই দেখি, সেই দুর্দ্ধর্ষ মুসলমান আমজাদের যখন হ'ল কারাদণ্ড, তখন তার সম্বলহীন স্ত্রীপুত্রের ভরণপোষণের ভার নিয়েছেন অশ্রুজলে বিগলিতা মা—সাহায্য ক'রছেন চুপি চুপি, সান্ত্বনা দিচ্ছেন গভীর অনুকম্পায়। এরপর আমজাদ প্রভৃতি ডাকাতেরা অনেকে মা'র দেবকুটীরেই পায় প্রথম কাজ, এমনকি মা'র আপন ঘরের বারান্দায় ঘরের ছেলের মতোই বসে খেতে। কিন্তু বিজাতীয়কে গৃহাঙ্গনে ঠাঁই দিয়ে, তাকে আহার দিতে গৃহবাসীদের মন হয়ে ওঠে অপ্রসন্ন; শুধু মাতৃ-আদেশে দিতে হয় এই ঠাঁই। তাই যখন তাদের ব্যবহারে ফুটে ওঠে অবহেলা-ভরা অযত্নের ভাব, তখন মা'র সূক্ষ্মদৃষ্টিতে সেটুকুও ধরা পড়ে; মৃদু তিরস্কারে বলেন, "অমন ক'রে খেতে দিলে কি লোকের তৃপ্তি হয়? তোরা না পারিস, আমি দিচ্ছি।" তারপর পরম যত্নে পরিতোষে খাওয়ান, সকলের উপেক্ষিত সন্তানকে। তা না হলে, বিশ্বজননী নামে যে কলঙ্ক লাগবে। এ বুকের দরদ ছিল আকাশ-ছোঁওয়া—সারা বিশ্ব তাইতো পড়েছিল ধরা। কিন্তু ধরাই পড়েছিল—পারেনি ধরতে, বিশেষ ক'রে যারা ছিল লীলাপীঠের নিত্যবাসী—চর্ম্মচক্ষে নিত্য দেখেছে দেবীর নর্ম্মলীলা। অথচ ছোট্ট আমোদরের মতো তাদের গ্রামখানিকে ঘিরে ব'য়েছিল জননীর কৃপার সুরধুনী, তবু বুঝেও যেন পারেনি বুঝতে। হয়তো লীলার এও একটি দিক। তাই বুঝি শ্রীবৃন্দাবনের রাখাল ও গোপীরা ব্রজরাজের মথুরার

ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত সত্তার প্রতি ছিল চিরবিমুখ। তারা চেয়েছিল তাদের প্রাণকমলে রাখাল-কৃষ্ণকে, আর মান-মিলনের রাসমঞ্চে কৃষ্ণ-প্রেমময়ী শ্রীরাধিকাকে—তাদের নিত্যদিনের গোষ্ঠ-মিলনের কুঞ্জ-কুটীরে। তাই যখন নিত্যসঙ্গলাভে ধন্য ভক্ত মাকে করেছে প্রশ্ন ঃ "তোমায় দেখতে দূরাগত ভক্তের দল এসে নিত্য ভিড় করেছে তোমার দ্বারে, আর আমরা তোমায় দেখছি ঘরেরই একজন অতি সাধারণ রূপে ? মা গো ! তোমায় চিনতে কেন পারি না ?" বলেন জননী, "তোমার আমায় চিনে কাজ নেই, বাবা, তুমি বেশ আছ।"

আবার গ্রামবাসী কোন ভক্তের এমনিতর প্রশ্নেই দিয়েছেন ভাবমধুর উত্তর ঃ "তা নাই-বা বুঝলি ; তোরা আমার সখা, আমার সখী।"

তারা যেন সত্যিই ছিল মায়ের ঘরের আপনজন—সুখে দুঃখে তারাও আসতো ছুটে জগজ্জননী ব'লে নয়, তাদের মাটীর ঘরের মা ব'লে। সেবার হ'ল অনাবৃষ্টি। রুদ্রের নেত্রবহ্নির মতো জ্বলে উঠলো গগন-ললাট—ছোট্ট গ্রামখানির সরস বক্ষ পারেনা সে-জ্বালা সইতে, তাই জ্বলে গেল সমস্ত শ্যামশস্য। পল্লীচাষীর দল চিন্তায় আকুল হয়ে ছুটে আসে মা'র কাছে ঃ "মা গো, আর তো উপায় নাই, ছেলেপুলে নিয়ে এবার না-খেয়ে হবে মরতে।" দুলে ওঠে করুণাবিগলিত হৃদয়খানি—ছুটে আসেন কিষাণ-ছেলেদের সঙ্গে। তাদের দুঃখে দুঃখ মিলিয়ে এসে দাঁড়ান সেই দাবদগ্ধ রুক্ষ প্রকৃতির মাঝে, যেন পল্লীছেলের মাঝে মূর্ত্তিমতী পল্লীলক্ষ্মী। 'চৌদ্দ-ভুবন সুখে ভাসে, শ্যামা যদি ফিরে চায়'—ভক্তকবির কাব্য হ'ল মূর্ত্ত। ওপরে বৃষ্টিবিহীন অনাবৃত আকাশ, দারুণ অগ্নিবাণে নির্ম্মম। নীচে মৃতকল্প বসুন্ধরা। শুষ্ক ওষ্ঠে আকুল হয়ে উঠেছে শুধু একটি চাওয়া : 'জল ! ওগো, এক-ফোঁটা জল !' সেই নিরাবরণ রিক্ততার পানে করুণ দৃষ্টি মেলে ব'লে ওঠেন জননী, "হায় ঠাকুর, এ কী করলে ? শেষটায় কি এরা না-খেয়ে মরবে !"

কেটে গেল দিন—পাণ্ডুর লজ্জায় মুদে এলো গোধূলির আঁখি। কেটে গেল সন্ধ্যা—একটা তপ্ত নিশ্বাস বুকে চেপে। সহসা রাতের গভীরে থমথম ক'রে উঠলো আকাশ। দাতুরীর দল ডেকে ওঠে আকুল হয়ে। রুদ্ধ নিশ্বাসে উগ্রদীব আশায় চাষীর দল শোনে গভীর রাতের আঁধারে সুরু হয়েছে মেঘের নাচন। সে কী বৃষ্টি—কী আকুল উছল তার ধারা! কত বৎসর যেন বৃষ্টির মাঝে ছিলনা এমন প্রাণ-উচ্ছলতা। মাঠ ভ'রে ওঠে সেবার সোনার ফসলে। লক্ষ্মীর চরণ-তুটি এমনি সোনার হাসি হেসেই সেবার সারা বাঁকুড়ার তুঃখ নিয়েছিল হরণ ক'রে। মনে পড়ে মা'র নিজ মুখের আশ্বাস ঃ

ন তেষাং তুষ্কৃতং কিঞ্চিৎ তুষ্কৃতোত্থানচাপদঃ
ভবিষ্যতি ন দারিদ্র্যং ন চৈবেষ্ট বিয়োজনম্॥ (চণ্ডীমাহাত্ম্য)

শুধু কি নিজের দেশের জন্য ? কোথায় দূর পূর্ব্ববঙ্গ, কোথায় সুদূর পাঞ্জাব—সাধারণ একটি পল্লীজননীর যার সম্বন্ধে কোন ধারণাই থাকে না, সেই দূরের বিদেশগুলিকেও জড়িয়ে ধরে মায়ের দরদ, মায়ের ব্যথা ; বলেন, "শুনছি পাঞ্জাবে নাকি এবার ফসল হয়নি—আর-আর জায়গাতেও নাকি হয়নি। হায় ঠাকুর ! লোকের দশা কী হবে ?"
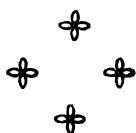
বিপ্লবের রক্ত-আকাশ যখন শিখাচ্ছন্ন—জীবন-মৃত্যুর মুখোমুখী বোঝাপড়ার মধ্যে যখন দিকে দিকে চলেছে স্বদেশী হাঙ্গামার অভিযান, তখন যেমন চিন্তা হয়েছে মা'র পরাধীন ভারত-সন্তানদের জন্য, কোমলা জননীর মতো ভয়ে হয়েছেন ব্যাকুল, পাছে তাদের ঘটে কোন বিপদ। তেমনি এ-কথাও তাঁর শ্রীমুখে উঠেছে ফুটে দূর

পাশ্চাত্ত্যের বিজয়ী সন্তানদের জন্য : "ওরাও তো, বাবা, আমারই ছেলে।" ..

বিশ্বেশ্বরী ত্বং পরিপাসি বিশ্বম্
বিশ্বাত্মিকা ধারয়সীতি বিশ্বম্!

চণ্ডী-গাথায় দেবতাদের সঙ্গে লুটিয়ে পড়ে আমাদেরও শরণ-নত শির। স্মরণের মন্দিরে চির-জাগরূক থাকে একটি শ্যামায়িত সন্ধ্যা। প্রাচী-প্রতীচীর আনন্দ-সম্মিলনে মাতৃমন্দিরে হয়েছে সেদিন একটি সুন্দর দৃশ্যের অবতারণা—ড্যাফোডিল-এর সুবাস নিয়ে যেন জেগে উঠেছে কুন্দফুলের বন। পাশ্চাত্ত্য হতে এসেছেন ডাঃ হ্যালক্ আর মিস্ গ্রে, আর একদিকে উপস্থিত নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্র, ডাক্তার কাঞ্জিলাল ও সিদ্ধুনাথ পাণ্ডা—বাংলার কয়েকটি উজ্জ্বল রত্ন। জননীর শ্রীচরণ ঘিরে সকলেই আছেন বসে, আর শুকতারার মতো আঁখি-দুটি মেলে বসে আছেন মা সারদেশ্বরী! সহসা পূর্ব্ব-পশ্চিমের মিলন-মোহনায় আনন্দ-উষার স্বপ্নে আনন্দিনী দুলালীর মতো উচ্ছল হয়ে ওঠেন মিস্ গ্রে : বলেন, "মা, আমি আপনার মেয়ে।" মায়ের পানে চেয়ে বুক ভ'রে গেছে বিদেশী মেয়ের, চোখে আনন্দের দীপ্ত শিখা। সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করেন ডাঃ হ্যালক্, "তুমি যে জগন্মাতা, কী ক'রে তা বুঝবো?" অধরা মেয়ের মুখে প্রসাদ-প্রসন্ন স্মিত হাস্যের বিকশিত করুণা—বলেন, "এখানে যখন এসেছ তখন বুঝতে পারবে।" তাইতো দূর পাশ্চাত্ত্য হতে আসে পত্র : "হে জননী, কে তুমি নিত্য আমার প্রার্থনার সময়ে এসে উদিত হও মেরীর স্থানে?" ও-দেশেরই একটি বাণী মনে পড়ে যায় : "ভগবান আমাদের প্রার্থনা শুনেন নিশ্চয়, কিন্তু সেটি পূর্ণ ক'রতে তিনি কিছু সময় নেন"। অতি সত্য এ-কথা।

খ্যাতনামা ডাক্তার কাঞ্জিলাল। তাঁর সহধর্ম্মিণী জানালেন প্রার্থনা : "মা, তোমার ছেলের যেন উপায় হয়।" বিস্মিতা মা বলেন তাঁর মুখের পানে চেয়ে—"এমন আশীর্ব্বাদ ক'রবো আমি, যে সকলের অসুখ হোক, কষ্ট পাক? আমি তো তা ক'রবো না,

মা। সকলে ভালো থাক্, জগতেব মঙ্গল হোক।” এমনি বিশ্বজোড়া ছেলের জন্য নাড়ীর টান – ক্ষুদ্রতার কোন স্থান নেই এখানে। এমন কথাও শুনি ভক্তমুখে যে, কোন কোন মাতৃহারা বালক-ভক্ত জননীকে দেখেছে তাব গর্ভধারিণী মায়ের রূপে, বিস্ময়ে অভিভূত পলকহীন দৃষ্টি মেলে দেখেছে—বুক ভ'রে পেয়েছে বঞ্চিত স্নেহের আস্বাদ, ভুলেছে সব ব্যথা। তবু সেদিন ছিল অবিশ্বাসে অন্ধ হৃদয়, বুঝেও অবুঝ হয়ে থাকা মন। লীলাচিত্রে তার দৃষ্টান্ত বহু। সেদিন মায়েরই কৃপাপ্রাপ্ত কোন সন্তান ক'রছেন মাতৃমন্দির-মার্জ্জনা। ক'রছেন সত্য, কিন্তু মনে জেগে উঠেছে একটা প্রবল ধিক্কার – এ আমি কার ঘর ঝাঁট দিচ্ছি? আর তার সঙ্গে জননীর প্রতি আসে আবরণেব মোহ। সহসা মোহের ঘন তমসার জাল ছিন্ন ক'রে আবির্ভূতা বিশ্বেশ্বরী, দিব্য বিভায় বিকশিত মাতৃমূর্ত্তি—আলুলায়িত কেশপাশ, শক্তি আর করুণায় মূর্ত্তিমতী, বেদবন্দিতা জ্ঞান-বিজ্ঞান-দায়িনী সারদা। সন্তানের অবিশ্বাসের ব্যথা বেজেছে বুকে, তাই এসেছেন ছুটে। ধীরে ধীরে মা শ্রীকরে তুলে নিলেন সন্তানের হাতখানি, তারপর আপনাকে নির্দ্দেশ ক'রে দিলেন স্বরূপ-পরিচয়ঃ “আমি মা, জগতের মা,—সকলের মা, বুঝবি বুঝবি, কালে বুঝবি।” ছেলের মুখে তবু আবার জাগে প্রশ্নঃ “তুমি সকলের মা কেমন ক'রে? তুমি কি পশুপাখী, কীটপতঙ্গ এদেরও মা?” ধীর গম্ভীর হয়ে ওঠে মা'র কণ্ঠস্বরঃ “হ্যাঁ, ওদের মায়ের ভিতর দিয়ে আমি ওদেরও মা। এ জন্মে ওরা এইভাবেই আমার স্নেহ-যত্ন পেয়েছে।” স্তম্ভিত ভক্ত, আনত চোখে জেগে ওঠে শ্রদ্ধা-ভক্তির দ্যুতি। মনে পড়ে জননীর বাণীঃ “ঠাকুর মাতৃভাব-বিকাশের জন্য এবার আমায় রেখে গেলেন।”

তাই চিরদিন নিত্য আকুল হয়ে জাগতো তাঁর প্রতীক্ষারত দুটি আঁখি, পথহারা ছেলেদের পথের পানে; বেদনা-মথিত কণ্ঠ হয়ে উঠতো আকুল উদ্বেলঃ “ছেলেরা, তোরা আয়—”

পথ-হারা ছেলের পথ যে চির-আঁধার, তাইতো অদিশ হয়ে পড়ে

তার পথ-চলা। ক্লান্ত ছেলের পথে দিতে আলোর দিশা, তার চোখে এঁকে দিতে দীপ্ত জ্ঞানের শিখাঞ্জন—বুঝি জননীর কান্ত-কম মাতৃরূপের মাঝে চিরবিকশিত ছিল জ্ঞানঘন গুরুরূপ। মোহময়ী মহামায়ার রূপে ছেলের চোখে যিনি এঁকেছেন মায়ার কাজল—'পাবকা সরস্বতী' রূপে তিনিই তো আবার আলোর চুমায় মুছিয়ে দেবেন ভুলো ছেলের ভুলের কালো। মা যে আমার জ্ঞান-বিজ্ঞান-দায়িনী সরস্বতী! শ্রীঠাকুরের শ্রীমুখে শুনি: "ওরে, ও সারদা-সরস্বতী—জ্ঞান দিতে এসেছে।"
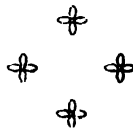
ভক্ত সুরেন্দ্রকুমার সেন—তারি জীবনের একটি স্বর্ণময় অধ্যায় ··· স্বামী বিবেকানন্দ তখন তরুণ ভারতের দিশারী—'উত্তিষ্ঠত' মন্ত্রে তুলেছেন নবজাগরণের ডমরু-নিনাদ, কালের তূর্য্যে তারি অনুরণন—সুরেন্দ্রকুমারের তরুণ মনে তারি সাড়া জাগে গভীর হয়ে, ছুটে আসেন স্বামিপাদের চরণপ্রান্তে জীবনের এক বীতনিদ্র লগ্নে; বলেন, "দাও তোমার ত্যাগের অমর-টীকা আমার ভালে, বৈরাগ্যের আগুনে জ্বালিয়ে দাও আমার জীবনের দীপখানি—আমি ধন্য হই, সার্থক হোক আমার জন্ম!" বহু আর্ত্তিতে স্বামীজী হন রাজী; কিন্তু বিধাতার পথ-নির্দ্দেশ হয় অন্যরূপ। দীক্ষার শুভলগ্ন উপস্থিত, অমৃতমন্থ সে-দিন—আকাশে অম্লান শুভ্রতা, বাতাস শুচিস্নাত। মন্দিরে স্বয়ং গুরুরূপী শিবসুন্দর আছেন ধ্যানলীন, ভক্ত করজোড়ে উপবিষ্ট—সহসা নিবাত-তনুতে জাগে স্পন্দন; ধ্যানোত্থিত শিবাবতার ব'লে ওঠেন, "বাবা, আমি তো তোমার গুরু নই; শ্রীঠাকুরের দেববাণী আমি শুনেছি—তোমার যিনি গুরু, তিনি আমার চেয়ে অনেক বড়।" হতাশায় ভ'রে ওঠে ভক্তচিত্ত—ভাবেন স্বামীজীর

চেয়ে বড় আর কে আছে এ-জগতে? সাগর-সুন্দর দুটি বিশাল নয়নে একটু চেয়ে থাকেন স্বামীজী, শ্রীকরে ফুটে ওঠে একটি অনিন্দ্যসুন্দর অভয়মুদ্রা; বলেন—"হতাশ হবার কারণ নেই, বাবা, সময়ে সব হবে।" নিরুপায় হয়ে ভক্ত আসেন ফিরে। দু'চোখের জলে ফিরে-আসার পথ গেছে মুছে, তবু ফিরে যেতেই হয়; শুধু অন্তরখানি পড়ে থাকে—অন্তরের অন্তরে বরণ-ক'রে-নেওয়া শ্রীগুরুর চরণান্তিকে। দিন কাটে আশা-নিরাশার দুই কূলে পথ খুঁজে: অবশেষে স্বামীজীর আশিস্‌পূত সেই শুভক্ষণ ধরা দিলো সেদিন সুষুপ্তির আনন্দলোকে। সে এক তিমিরাকুল গভীর রজনীর কথা। ভক্ত সুরেন্দ্রনাথ দেখেন স্বপ্ন—জ্যোতির্ময় দেবতনু গদাধর-সুন্দরের কোলে তিনি উপবিষ্ট; সম্মুখে আবির্ভূতা হলেন অনিন্দিতা এক দেবীমূর্ত্তি, আলোর শতদলের আনন্দ-দলমল তাঁর রূপকান্তি—দর্শনে ভক্ত হন স্তম্ভিত। দেবী প্রসন্নহাস্যে বললেন, "একটি মন্ত্র নাও।" শুধান সুরেন্দ্রনাথ—"কে তুমি?" বীণার ঝঙ্কারে বলেন মহাদেবী—"আমি সরস্বতী।" যুগের সকল অজ্ঞান-আঁধার যেন হয় ঝঙ্কৃতঃ "তুমি সরস্বতী?" বিস্ময়ের আবেগ কাটতে-না-কাটতে মন্ত্রোচ্চারণ ক'রে দেবী সন্তানকে করেন কৃপাধন্য। "কিন্তু কী হবে এতে?"—ভক্তের মনে জাগে প্রশ্ন; নেমে আসে স্বরের অলকানন্দাঃ "কেন, কবি হবি।" "কবি তো হতে আমি চাই না।" আবার সেই কল্যাণ-ঝঙ্কার। বলেন দেবী—"ওরে, কবি মানে যে জ্ঞানী।" স্বপ্নের মতো অন্তর্হিতা হন স্বপ্নময়ী··· ঘুম ভেঙে যায় সুরেন্দ্রনাথের, চোখের সামনে জেগে থাকে শুধু তিমিরায়িত রজনী, আর অন্তরীক্ষে বুঝি বেজে ওঠে বৈদিক ঋষির ধ্যানছন্দিত কণ্ঠেঃ "পাবকা নঃ সরস্বতী ··· চেতন্তী সুমতীনাম্"। তারপর একদিন ভক্ত সুরেন্দ্রনাথ ছুটে আসেন স্বামীজীর কাছে; খুলে বলেন তাঁর স্বপ্নবৃত্তান্ত। মায়ের বীর সন্তান আনন্দ-উদ্বেল কণ্ঠে বলেন, "এইটি জপ ক'রলেই তোর সব হয়ে যাবে। আর কিছু ক'রতে হবে না। শ্রীঠাকুর যে বলেছেন, দেব-স্বপ্ন সত্য।" "স্বপ্ন সে তো মানসকল্পনা। প্রতিচ্ছায়া

মাত্র। সে কেমন ক'রে হবে বাস্তব সত্যের মতো সত্য ?"—ভক্তের বালোচিত প্রশ্নে জ্ঞানমূর্ত্তি শঙ্করের নয়নপল্লব যেন হয়ে ওঠে বিদ্যুদ্‌বন্ত ; গম্ভীর কণ্ঠে বলেন, "এসব বুঝি বোধোদয় বইয়ে ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ প'ড়ে তোর ধারণা হয়েছে ? তা নয়। ধারণা ক'রে রাখ্, বাস্তবিক এটি সত্য। ঐ মন্ত্র জপ ক'রতে থাক্, পরে সশরীরে সেই মন্ত্রদাত্রী মূর্ত্তি দেখতে পাবি। তিনি বগলার অবতার, সরস্বতী-মূর্ত্তিতে বর্ত্তমানে আবির্ভূতা। সময়ে সব বুঝতে পারবি। যখন দেখতে পাবি, দেখবি উপরে মহা শান্তভাব, কিন্তু ভিতরে সংহার-মূর্ত্তি। সরস্বতী অতি শান্ত কিনা।" চির-রহস্যের জালে আবৃত এই দেববাণীর রহস্যাবরণ যখন হ'ল উন্মোচিত, তখন কালচক্রে সুদীর্ঘ নয়টি বৎসর পর পর গেছে কেটে। সেই সুদীর্ঘ দিবস অন্তে, জয়রামবাটীর মাতৃদেউলে সেদিন দেখা গেল শ্রীগুরুরূপিণী জননী সারদার চরণান্তিকে উপবিষ্ট ভক্ত সুরেন্দ্রকুমার। সেই পবিত্র দীক্ষালগ্নে অতীতের তিমির-যবনিকা ছিন্ন ক'রে সুরেন্দ্রকুমারের স্মরণে জাগে হারানো স্বপ্নস্মৃতি—বিস্মিত নয়নে চেয়ে দেখেন স্বপ্ন-লোকের সেই শ্বেত-শতদল-দলিত সরস্বতী-ই আজ জননী সারদা রূপে তাঁর সম্মুখে উপবিষ্টা, জ্ঞানাঞ্জনশলাকায় সন্তানের মোহ-অন্ধ-আঁখি খুলে দিতে। শরণস্তব্ধ ভক্ত, আহত অশ্রুতে নির্ব্বাক—অবিশ্বাসের আঁধারে শুধু খুঁজছেন বিশ্বাসের মণিদীপটি—আলো জ্বলবে কি ?

শ্রবণমূলে বেজে ওঠে স্বামীজীর মন্ত্রময় কণ্ঠ : "সময়ে সব বুঝতে পারবি, ওপরে মহা শান্তভাব কিন্তু ভিতরে সংহারমূর্ত্তি—সরস্বতী অতি শান্ত কিনা।"

মায়ের ঐ সংহার-রূপটিই বুঝি অশিবনাশিনী রূপ—স্বয়ং মহাকালও যে রূপ দেখলে হয়ে পড়েন ভীত-সন্ত্রস্ত। তবু অসুর-সন্তানের জন্য মাঝে মাঝে সে-রূপে আবির্ভূত হতে হয় বৈকি। শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলা-চিত্রেও জননী সারদেশ্বরীকে মাঝে মাঝে দেখি সেই রুদ্রমধুর রূপে।

ভক্ত হরিশের নাম আমরা পাই কথামৃতের বহু স্থানে। নিয়তির দুর্ব্বোধ্য বিধিতে সেই হরিশ একদিন হ'ল উন্মাদ। সদ্য-বিচ্ছেদ-ব্যথায় মা তখন শ্রীঠাকুরের ধ্যানে তন্ময়-আকুল—একান্ত একাকী বাস ক'রছেন লীলাপীঠের নিভৃত কুটীরে। স্মৃতির প্রান্তরে সেদিন নেমে এসেছে এক স্তব্ধ মধ্যাহ্ন। কেমন যেন শঙ্কা-আকুল দৃষ্টিতে চেয়ে আছে দূরের আকাশ, বাতাসেও নাই শান্তির স্নিগ্ধতা। বিশেষ কী কাজে জননী গিয়েছিলেন জনৈকা পল্লীজননীর গৃহে: কর্ম্ম-অন্তে একাকী আসছেন ফিরে—নির্জ্জনতায় গভীর সেই রৌদ্রক্লান্ত পথ বেয়ে। সহসা পিছনে কার উন্মত্ত পদক্ষেপ, থমকিত হয়ে ওঠে কোমল চরণ—সন্ত্রস্ত নয়নে চেয়ে দেখেন মা, উন্মাদ সন্তান হরিশ আসছে ছুটে—তাঁরই প্রতি তার তীব্র গতি। দুরন্ত ঝোড়ো হাওয়ার ঘূর্ণীতে বনের চোখ কি যাবে অন্ধ হয়ে? আঁধার ধূলায় কি ঢেকে যাবে আলোর আকাশ? বিশ্বেশ্বরীর চোখে জাগে যেন অসহায় আকুলতা—কেমন ক'রে পাগলের লোলুপ দৃষ্টি হতে ক'রবেন আত্মরক্ষা? আত্মগোপনের চেষ্টায় আকুল হয়ে ওঠেন সতী-সীমন্তিনী—ক্ষিপ্র বেগে ছুটে যান সম্মুখের একটি ধানের মরাইয়ের কাছে; তারপর তাকেই পরিবেষ্টন ক'রে চলে উন্মাদ সন্তানের কাছ হতে আপনাকে আড়াল করার আকুল প্রচেষ্টা। পাগলী মেয়ের এ যেন সাধ ক'রে ধরা না-দেবার খেলা। 'কিন্তু নাঃ, আর তো পারা যায় না—এমন করে উন্মাদ, কোনমতেই যে হয়না নিরস্ত!' সহসা বিক্ষুব্ধ মহাসাগরের মতো গর্জ্জন ক'রে ওঠে মা'র অসুরনাশিনী রূপ। দেবীর দলমল অঙ্গে হয় বিদ্যুৎস্ফুরণ, করুণ নয়নে জাগে রুদ্র ভ্রূকুটি। 'ভীষণং ভীষণানাং' সংহারময়ী, রুদ্রাতিরুদ্র—সেই রূপে ঘুরে দাঁড়ান জননী সারদা হরিশের দিকে, তারপর বজ্রকঠিন মুঠিতে কেশাকর্ষণ ক'রে তাকে আছড়ে ফেলেন ভূমিতে; সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় মহিষাসুরের মতো দেবী সারদেশ্বরীর জানুতলে পিষ্ট হ'চ্ছে উন্মাদ হরিশের বক্ষ—জননী একহস্তে তার জিহ্বা টেনে, অপর হস্তে বিস্রস্ত করাঘাতে তাকে ক'রে তুলেছেন অতিষ্ঠ। মূর্ত্ত হয়ে ওঠে চিরপরিচিত

বগলার রুদ্রভীষণ রূপ। একদিন চণ্ডমুণ্ড-বধের জন্য পার্ব্বতীর ললাটফলক হতে আবির্ভূতা হয়েছিলেন কালী করালী, আর সেদিন উন্মত্ত সন্তানকে নিরস্ত ক'রতে আবির্ভূত হ'ল কল্যাণীর রুদ্রাণী রূপ—বাহিরে মা আমার বেদবন্দিতা ভারতী, শান্তির নির্ঝরিণী, আর ভিতরে বগলা! সে প্রকাশ শুধু একদিন নয়—হয়েছে একাধিকবার। সেদিন অপরাহ্নে জননী সহসা আহ্বান করেন ভক্ত নরেশচন্দ্রকে। চমকিত ভক্ত এসে দেখেন, মা বিশেষভাবে ভাবিতা। শ্বেত শুভ্রবাস, আকুলকুন্তলা, ধ্যানমথিত গাম্ভীর্য্যে শ্রীমুখ তরঙ্গ-প্রতিহত মহাসাগরের মতো থমথম করছে--দক্ষিণপাণিতে অভয়মুদ্রা নিয়ে আছেন দাঁড়িয়ে। ভক্তের মনে জাগে প্রশ্ন: "কী ফুলে হবে, মা, তোমার এই রূপের পূজা? আমরা যে তোমার অবোধ ছেলে।" ভাবমুখে বলেন জননী, "সাদা ফুল, হলদে ফুল—দুই-ই আনতে বল্। সাদা ফুল ঠাকুর ভালবাসেন, হলদে ফুল আমি ভালবাসি।" জননীর আদেশ হয় প্রতিপালিত। ছুটে নিয়ে এলেন ভক্ত পুষ্পসম্ভার—কম্পিত করে অঞ্জলি ভ'রে শ্রীচরণ-দুটি সাজিয়ে দিতে হলেন উদ্যত। আবার জননীর প্রত্যাদেশ: "সাদা ফুল দিয়ে সাজিয়ে দাও দক্ষিণ-চরণ।" তাই হ'ল। সাদা ফুলের অর্ঘ্য দক্ষিণ-চরণে দিয়ে, বাম-চরণে নিবেদিত ক'রলেন ভক্ত পীত-পুষ্পের ডালি। একি শুধু বগলা-রূপের প্রকাশ? মনে হয়, জননী সর্ব্বদেবীস্বরূপিণী। একাধারে কমলদলবাসিনী কমলা আর রণরঙ্গিণী বগলার রূপে নিলেন ভক্তের পুষ্পাঞ্জলি। তা না হলে, দক্ষিণ-চরণে নিলেন কেন নারায়ণের অভিলষিত শ্বেতপুষ্পের নিবেদন?

আবার করালীর ভীম-ভবানী প্রতিমূর্ত্তিও হয়েছে সময়ে-সময়ে প্রকটিত, ক্ষণিক ভাবান্তরের ছলে। রহস্যের ছলে কোন ভক্ত সেদিন বলেছেন, কোন একটি কারণ দেখিয়ে—যে, "কামারপুকুর শ্রীমন্দির যদি অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত হয়, তখন কি হবে?" সঙ্গে সঙ্গে হয় মা'র ভাবান্তর---অগ্নিলীলার কথায় বুঝি মনে পড়ে ধুধু-করা

শ্মশানচিতার স্মৃতি, সঙ্গে সঙ্গে জেগে ওঠে শ্মশানসুন্দরীর রুদ্রভাব। তাই বুঝি দুঃখ-বিরক্তির পরিবর্তে তীব্র হাস্যরেখা ফুটে ওঠে মা'র সেই কান্তকোমল মুখচন্দ্রে—যেন রৌদ্রময়ী নিরাতপা। সেই মমতা-মথিত কণ্ঠ হয়ে ওঠে অস্বাভাবিক তীব্র—যেন আঁধারের প্রতিধ্বনি। নিষ্কম্প্র নির্ম্মম স্বরে বলেন—"তাহলে বে—শ হবে, বে—শ হবে, ঠাকুর যেমনটি ভালবাসেন, তেমনি হবে—তিনি শ্মশা—ন ভালবাসেন, সব শ্মশা—ন হয়ে যাবে।" তারপরেই সুরু হ'ল এক ভয়াবহ অট্টহাসি ঃ 'হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ'। কম্পিত স্তম্ভিত ভক্ত—দুরু-দুরু বক্ষে চেয়ে থাকে, চোখে তার প্রকটিত শ্মশান-বাসিনীর প্রতিচ্ছায়া! সহসা বাণীহারা ছেলের পানে দৃষ্টি পড়ে মা'র; ধীরে ধীরে শান্ত হয় অশান্ত মেয়ের রুদ্ররূপ, জেগে ওঠে বরাভয়—ক্ষমাসুন্দর, ক্ষান্ত মুখে।

* * *

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের যুগ। নীলাকাশশায়ী রুদ্রের সৃজন-শান্তি যেন ভেঙে গেছে, জেগেছে প্রলয়-অশান্তি—পিঙ্গল চাহনিতে ক্ষমাহীন ভ্রূকুটী। দিকে দিকে চলেছে হত্যার দানবীয় লীলা। অজস্র লোকক্ষয়ের সংবাদে সংবাদপত্র ছেয়ে গেছে, ভক্ত নলিনবাবু তাই শোনাচ্ছেন মাকে। মনে হয়, এই বুঝি ফুটে উঠবে আয়ত দুটি নয়নপল্লবে করুণার দু'ফোঁটা অশ্রু, শত শত সন্তানের বিচ্ছেদ-ব্যথায় জেগে উঠবে মমতার দীর্ঘশ্বাস—সে করুণার সিঞ্চনে হয়তো আবার ফিরে আসবে বিশ্বশান্তি। কিন্তু কোথায় সে করুণাময়ী! তার পরিবর্তে একি রূপ? অশুভ শুম্ভের নিধনে জেগেছে কি কালী-কপালিনী ভীমা? তারি প্রতিচ্ছবি যে দীপ্ত হয়ে ওঠে মা'র হেম-বরদ অঙ্গে! আবার সেই হাসি। প্রথমে মৃদুস্বরে 'হোঃ হোঃ' শব্দে, তারপর সে-হাসির রূপান্তর হয় প্রলয়ঙ্কর করাল হাস্যে; 'সৌম্যাৎ সৌম্যতরা' সারদার আজ জেগে উঠেছে অসিপাশধারিণী রণচণ্ডিকার স্মৃতি। সেকি প্রচণ্ড প্রলয়-উল্লাস! সে অট্টনিনাদে বুঝি ভেঙে পড়বে আকাশ, স্তম্ভিত হবে দেবকুল! গৃহের অণু-

পরমাণুতে সেই অট্টহাসি হয়ে ওঠে প্রতিধ্বনিত। বিকম্পিত ভক্তকুল করজোড়ে জানায় স্তুতিঃ "হে জননী, সংবরণ করো তোমার এই ভীমা ভৈরবী আবির্ভাব—আমরা চাই তোমার সেই প্রসাদময়ী দ্বিভুজা রূপ!" ভক্তকণ্ঠা আকুল কণ্ঠে গললগ্নীকৃতবাসে বলেন—"সম্বর, সম্বর!" বিশ্বরূপ-দর্শনে ভীত অর্জ্জুনের মুখেও তো জেগে উঠেছিল এই প্রার্থনাঃ "প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস"। আজও ভক্তের আকূতিতে ধীরে ধীরে শান্ত সংহত হয় মহামায়ার সেই মৃত্যুময়ী রূপ। ভক্তের ভগবান যে অনন্ত-কল্যাণ-গুণসম্পন্ন, সন্তানের আকূতিতে যে জননীর ক্ষেমঙ্করী শুভদা সারদা-রূপই প্রাণময়ী ধ্যানময়ী রূপ—সেখানে কালীও কালো মনোরমা রূপময়ী শ্যামা।

* * *

আষাঢ়ের এক মেঘমেদুর রজনী—বিশ্বশিশু তন্দ্রায়িত, জননী-রাত্রির স্নেহাঞ্চলে। তুষ্ণীক আকাশের চোখেও সব জিজ্ঞাসাই যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। ঠিক এমনি এক সুপ্ত লগ্নে রাঁচি শহরের একপ্রান্তে ক্ষুদ্র গৃহকোণে শায়িত এক মর্ম্মী ভক্ত, নাম তার নিশিকান্ত। নিদ্রার গভীরতায় তার চোখে নেমে এসেছে সুষুপ্তির ছায়া। এই সুষুপ্তির স্তব্ধ ভূমিই তো ধরা-অধরার মিলনপ্রান্ত! তাই ঘুমো-ছেলের চোখেই আঁকা থাকে মায়ের মুখের চুমা। সহসা নিশিকান্তের স্বপ্নলোক স্নিগ্ধ জ্যোতির তরঙ্গায়িত ধারায় হয়ে ওঠে আলোয় আলো। ভক্ত দেখেন জগজ্জননী ভবভয়হারিণী শ্যামা এসে দাঁড়িয়েছেন দলমল-রূপে—আকুল স্নেহে তাঁকে টেনে নিয়েছেন বিশ্বের ভয়হরা অভয় কোলে; কণ্ঠের বাণীতে ঝ'রে পড়ছে যুগ-যুগ-মথিত সান্ত্বনার চুম্বন; ব'লছেন, "ভয় কি বাবা, আমি তো রয়েছি।" পলকের ব্যবধানে ঘটে গেল আর-এক অপরূপ রূপান্তর। কোথায় সে নীলচন্দ্রকান্ত জননী! তার পরিবর্ত্তে এসে দাঁড়িয়েছেন শুভ্রা হিমাদ্রিকান্তি এক অপরূপা—শ্রীঅঙ্গে সিতশুভ্র ক্ষৌমবাস, সুঠাম বাহুযুগলে বিজড়িত কনক-কঙ্কণ—শ্বেতপদ্ম-নিবাসিনী সারদা। দেবী উচ্চারণ ক'রলেন একটি প্রণবযুক্ত পবিত্র নাম; দিলেন নির্দ্দেশ—১০৮ বার ক'রবে এই

জপ। আর তার সঙ্গে যুগের আর্ত্তিহারিণী দিলেন গভীর আশ্বাস ঃ "তুমি শুধু এইটুকু ক'রে যাও, বাকী যা করবার তা আমিই ক'রবো।" সুখস্বপ্ন যায় ভেঙে। সদ্যোত্থিত শিশুর মতো কেঁদে ওঠেন নিশিকান্ত ঃ "মা! মা!" তারপর সাবাটি রজনী যাপিত হয় সুখস্মৃতি আর নাম-রস-আস্বাদনে।

অস্তযাত্রী মুহূর্ত্তের পথে দিন যায় কেটে। শীর্ণ পর্ণের পদচিহ্নই থাকে তার সাক্ষী। শ্রীরামকৃষ্ণ-যুগেব আলোয় বাঁচি শহর তখন সবে অরুণায়িত—একটি সর্ব্বজয়ী জীবনের চেতনা তখন ডাক দিয়েছে ঘুমন্ত নগরীটিকে। কথামৃত-পাঠ, নাম-সংকীর্ত্তনে দিক্-দিক্ অমৃতায়িত। মধুলোভী ভক্তগোষ্ঠী নিয়ে গ'ড়ে উঠেছে একটি ক্ষুদ্র মধুচক্র। ভক্ত নিশিকান্তও একদিন এসে যোগ দিলেন সেই আনন্দচক্রে। সেইখানেই তো মিললো পবম লগ্নের আশা, কৃপাধন্য কোন ভক্তমুখে শুনলেন নিশিকান্ত, জননী সাবদেশ্বরীব পুণ্যনাম; শুনলেন, এক অখ্যাত পল্লীবক্ষে আবির্ভূতা সেই করুণার জাহ্নবী সারা বিশ্বের মলিনতা ধুইয়ে দিতে যেন মমতার মূর্ত্তপ্রতিমা। শুনতে শুনতে শৈবালিত স্মৃতি যেন হয় উপল-আঘাতে চঞ্চল। ভাবেন নিশিকান্ত ঃ "তবে কি তুমিই জননী দাঁড়িয়েছিলে আমার স্বপ্নের প্রাঙ্গণে, দু'হাতে অপসারিত ক'রে অজ্ঞান-তিমির?" কিন্তু ক্ষণিকেই জাগে সংশয়—না, না, এও কি সম্ভব? চিত্ত হয়ে ওঠে অধীর—সর্ব্বদ্বন্দ্বের নিরসন হবে কেমন ক'রে? কে যেন চুপি চুপি বলে, একবার গিয়ে দেখেই আয়-না। মনের মাঝে একটা দ্বিধা তবু যেন গুমরে ওঠে, কিন্তু অকূল ডাকলে, কূল কি পারে বেঁধে রাখতে? তাই একদিন দেখা যায়, ভক্ত নিশিকান্ত অস্তমিত বেলায় এসে দাঁড়িয়েছেন জয়রামবাটীর দেউল-দ্বারে। গোধূলির আঁধারই তো জানে শুকতারার ভাষা! জননীর দর্শনমাত্র বাহ্যজগৎ যায় হারিয়ে—জাগ্রত চোখের অশ্রুতে নিবিড় হয়ে দাঁড়ায় স্বপ্নলোক; চেয়ে দেখেন নিশিকান্ত—সিতশুভ্র শ্রীমুখকান্তি,—সেই সিতবাসে সজ্জিতা আকুলকুন্তলা দেবীমূর্ত্তি, অধরে অভয় আর করুণার হাসি,

নয়নপল্লবে সেই চাহনি যেন পথভ্রান্ত সন্তানের একটি আনন্দ-আয়ত আশ্বাস। বিহ্বল ভক্ত অচল চরণে স্তম্ভিত হয়ে শুধু চেয়েই থাকেন নির্ব্বাক্-নিস্পন্দ। কখন যেন মায়েব হাতছানিতে এসে দাঁড়িয়েছেন মন্দির-অভ্যন্তরে কিছুই মনে নাই; একান্ত আবেশে শুধু শুনছেন, বলছেন মা—"হ্যাগা, তুমি আমায় চিনলে কি ক'রে?" আবেগরুদ্ধ কণ্ঠ অশ্রুবাষ্পে আচ্ছন্ন হয়ে ওঠে, বুক নিঙড়ে আর্ত্তনাদের মতো বলেন নিশিকান্ত, "মা গো! তোমায় চিনবার মতো সাধ্য কি আমার আছে?" হেসে ওঠেন লীলাময়ী। সে হাসির বিজলী-আলোয় সন্তানের সব জড়ত্ব যেন যায় দূরে। মা-হারা ছেলে মাকে পেয়ে যেন সোহাগে হয়ে ওঠে উছল। চরণ-দুটি আঁকড়ে ধ'রে লুটিয়ে পড়েন—যেন সব ব্যথা সব জ্বালা জুড়াবার ঠাঁই মিলেছে।

তারপর আসে দীক্ষালগ্ন। সে লগ্ন ভক্তের স্মৃতিপটে হয়ে থাকে অমৃতের দেয়ালী। ছোট্ট ঠাকুরঘর; ছোট্ট সিংহাসনে শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত, সম্মুখে জাগ্রতপ্রতিমা জননী সারদেশ্বরী! প্রভাতের প্রথম আলোর প্রসাদের মতো শ্রীমুখ উদ্ভাসিত, আর স্নানান্তে এসে দাঁড়িয়েছেন ভক্ত, মূর্ত্ত কৃপার লগ্নে নিজেকে নিবেদন করতে; হাতে শ্রদ্ধা আর ভক্তির অঞ্জলিস্বরূপ রাশীকৃত পদ্মফুল। "ঠাকুর-প্রণাম করো।"—জননীর আদেশ মোহাবিষ্টের মতো পালন করেন নিশিকান্ত। তারপর সম্মুখের চার-পাঁচটি জলপূর্ণ ঘটের শান্তি-বারিতে অভিষিক্ত ক'রে জননী উচ্চারণ করেন স্বস্তিবাণী; সর্ব্বাঙ্গে বরদহস্তের স্পর্শে পবিত্র ক'রে বলেন, "এখন মনে ভাবো—তোমার জন্মজন্মান্তরীণ পাপ ভস্ম হয়ে গেল। তুমি শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তাত্মা।" স্বয়ং দেবকুলকে যিনি দান করেছিলেন ব্রহ্মজ্ঞান, সেই ব্রহ্ম-বিজ্ঞান-দায়িনীর কণ্ঠে বেদান্তের বাণী যেন সন্তানের যুগসঞ্চিত অন্ধকারে জ্বেলে দেয় পবিত্রতার দীপশিখা—দেহে জেগে ওঠে আনন্দের শিহরন; সত্যই মনে হয়ঃ "আমি শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তাত্মা"। তারপর সর্ব্বান্তর্য্যামিনী স্মরণ করিয়ে দেন স্বপ্নের স্মৃতিঃ "তোমার তো হয়েই

গেছে—ঐ মন্ত্রই ১০৮ বার জপ করবে, আর তোমায় কিছুই ক'রতে হবে না; বাকী সব আমিই ক'রবো।" আবার সেই স্বপ্নের পুনরুক্তি—পুলক-বেপথু ভক্ত জানান মিনতি: "আমি তোমার শ্রীমুখে ঐ মন্ত্র আবার চাই শুনতে, মা!" দয়াময়ী সে-আশাও করেন পূর্ণ। তারপর সে কী অমৃতময়ী বাণী—বুক-জুড়ানো; তৃপ্তিতে আশ্বাসে ভ'রে ওঠে ভক্তহৃদয়। "ঠাকুরই সব, ঠাকুরই গুরু, ঠাকুরই ইষ্ট। ঠাকুরই ইহকাল, ঠাকুরই পরকাল। তুমি ঠাকুরের—ঠাকুর তোমার। আমাকে ও ঠাকুরকে অভিন্ন ভাববে।" আনন্দে আত্মহারা ভক্ত নিয়ে আসে কমল-অর্ঘ্য। সে অর্ঘ্যে কমলার কমলচরণ-দু'খানি পূর্ণ ক'রে, করে আত্মনিবেদন। মা'র মুখে তখন স্বর্গের সুষমা-সিক্ত অস্ফুট হাসি, আর অতৃপ্ত শ্রবণে চরণ-লুণ্ঠিত ভক্ত শোনে: "বাবা, কত জন্মজন্মান্তর ঘুরেছো, ঘুরতে-ঘুরতে এতদিনে ঘরের ছেলে ঘরে এসে পৌঁছেছো, আর ভাবনা কী?"

স্বপন-সেঁচা রতন না হলে কি এমন ক'রে স্বপন-দেউল করে আলোয় আলো? কোথায় দূর বরিশাল—তিমিরাচ্ছন্ন রজনীতে এসে ডাকছেন জননী সন্তানকে, নাম প্রেমানন্দ দাশগুপ্ত: "তুই এখনো ব'সে আছিস্? তোর তো বয়েস হয়েছে,—এখনও শুভ লগ্ন র'য়েছে। আমি কত কষ্ট ক'রে সাত-সমুদ্র তেরো-নদী পার হয়ে এসেছি। আয়, আমার সঙ্গে চলে আয়।" অকূলের ইসারায় কূলের মায়া থাকে পিছে প'ড়ে। হারিয়ে-পাওয়া মায়ের চুমোয় ছেলের চোখে জাগে জাগার বাণী—ছুটে আসেন ভক্ত প্রেমানন্দ জননীর চরণপ্রান্তে, যদিও সেই স্বপ্নের দুয়ারে দেখাই প্রথম দেখা; পূর্ব্বে দেহ-ঘটে, বিগ্রহ-পটে—কোথাও তো মেলেনি দর্শন! তবু মায়ের এত দয়া, এত নাড়ীর টান—আর কি দূরে থাকা যায়? শারদীয়ার অবকাশে নীড়ে-ফেরা পাখীর মতো যখন আপন-আপন গৃহের পানে চলে বিশ্বের যত ছেলে-মেয়ে, ভক্ত প্রেমানন্দও সেই মিলন-আসন্ন লগ্নে বিশ্বমায়ের ডাকে সাড়া না দিয়ে যেন পারলেন না। সে সাড়া যে আপনি ফুটে ওঠে অন্তরে আলোর প্রতিধ্বনির মতো। দর্শনও

মেলে আশাতীত মুহূর্তে—সেই মূর্ত্তি, স্বপ্নে-দেখা জননী সারদার মহিমময়ী সেই মূর্ত্তি। অপার বিস্ময়ের অঞ্জন চোখে মেখে ছাখে ভক্ত সেই করুণা-নিথর নয়নের দৃষ্টি—মায়া-ভরা ঢলঢল শ্রীমুখ, সেই কান্ত-করুণ কণ্ঠঃ "বাবা, এসেছ? আমি আজ তোমার জন্যে অপেক্ষা ক'রছিলুম। যাও, এখুনি স্নান ক'রে এই ঘরে এসো।"

বলা বাহুল্য, সেইদিনই প্রেমানন্দ হলেন মা'র আশ্রিত সন্তান। জীবনের অদূর সায়াহ্নে মনে হ'ল যেন তাঁর নবজন্মই হ'ল। সব সৃজনের মূলেই তো আছে মাটীর মায়ের প্রতীক্ষা!
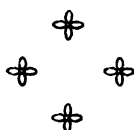
দর্শনের বাণী-মন্দিরে পাই—ঈশ্বর তাঁর অনিরাকরণীয় আকর্ষণে নিরন্তর টানছেন জগৎকে, অথচ সে আকর্ষণের গতিধর্ম্মে তাঁর স্থৈর্য্য হচ্ছেনা প্রতিহত। ভক্ত-ভগবানের ক্ষেত্রে এ-কথা কিন্তু অচল। তাঁর অবতারত্বই তার প্রমাণ। ভক্তের ভক্তির নিবিড়তায় সেই অসীম ঔদাস্যের ঘটে প্রলয়; নিবিড় টানে ছুটে আসতে হয় তাঁকেই ভক্তের পাশে।

মনে পড়ে যাত্রীমুখর বিষ্ণুপুর স্টেশন, যেন রুক্ষ মাটীর বুকে অকারণ হর্ষের মতো জেগে উঠেছে ঘাসফুলে ঢাকা একটুকরো প্রহর, যার বুকে অজস্র চলার চিহ্নে হারিয়ে যায়নি শুধু একটি চিহ্ন, যে চিহ্ন ধূলিকে করে তীর্থরেণু। চলেছেন মা ভক্তসঙ্গে কলিকাতা অভিমুখে। প্রতীক্ষা-উন্মুখ ভক্তের দল মাকে আছে ঘিরে। দেশান্তরের ডাক নিয়ে তখনো আসেনি গাড়ি। চারিদিকে ছড়ানো একটা আনমনা চঞ্চলতা। ঠিক এমনি সময়ে কোথা হতে এলো এক দীনা জননী—রুক্ষ-মলিন-বেশ, পশ্চিমা কুলী; নয়নের আকুল ভক্তি-প্লাবনে বুক ভেসে যাচ্ছে—প্রেম-উন্মাদিনীর মতো ছুটে এসে

অভিমান-ঢালা কণ্ঠে সে বলে—"তু মেরী জানকী, তুঝে মৈনে কিতনে দিনোঁসে খোজা থা—ইতনে রোজ তু কাঁহা থী?"—'সে যে কতদিন গো, মা—বুঝি-বা এক যুগই গেছে কেটে—পাইনি তোর দেখা! কেমন ক'রে ছিলি লুকিয়ে?' ব্যথা আর অভিমান আজ হয়ে ওঠে বুঝি অশান্ত-উচ্ছল—সে কী বাঁধ-ভাঙা কান্না, যেন পল্বল-বুকে সাগর-উছাস! স্নিগ্ধ কোমল হাতখানি দিয়ে জননী করেন শান্ত; ছোট্ট মেয়ের মতো আদর ক'রে কাছে টেনে, কানে দেন তার ইষ্টমন্ত্র। কিন্তু গুরুদক্ষিণা? কী দেবে সে? কী-ই বা আছে তার? সে যে দীন হতে দীন! অবশেষে ছোট একটি ফুলে আর চোখের জলের চন্দনেই হয় দক্ষিণান্ত। দক্ষিণা-মুখে নারায়ণী সেই পূজাই গ্রহণ করেন। দীনের পূজা কিনা! কোন্ স্বপ্নলোকের ডাকে, কোন্ গহিন ধ্যানের বুকে সে পেয়েছিল জননীর দিব্য প্রকাশ, কে জানে! কে তার খোঁজ রাখে? সেই থেকে হয়তো কত দিনের পর দিন তার কেটেছে প্রতীক্ষা-ভরা অন্বেষণে। তা না হলে, আসা-যাওয়ার ক্ষণিক পরিচয়ের মোহনা এই স্টেশনে, কত চেনা-অচেনা মুখেরই তো মেলে দেখা—কিন্তু কই, আর কেউ তো এলোনা এমনি ক'রে ছুটে? আর দীনার্ত্ত রমণীটিই বা কেমন ক'রে খুঁজে বের ক'রলো এমনি একখানি মুখ, যে মুখখানি বুঝি তার যুগ-যুগের চেনা—চিরপরিচয়ের বাঁধনে বাঁধা। সার্থক ঈশামশীর দেববাণী: "দীনার্ত্তরাই ধন্য, কারণ তারাই ভগবানকে পাবে।"

* * *

দুর্গম গিরিতীর্থের পথ ত্রিকালের স্তব্ধ আনন্দের মতো দাঁড়িয়ে আছে শৈলভূমি—অলকানন্দার উপলাহত উচ্ছ্বাসের পানে চেয়ে, সৃষ্টির নীরব অনুভূতিতে নিথর। হৃষীকেশে ধুম্রুরাজ গিরির আশ্রম থেকে ভ্রমণ-নিরত জনৈক পরিব্রাজক বেড়াচ্ছিলেন তীর্থ হতে তীর্থান্তরে। চেয়ে ছাখেন সন্ন্যাসী—কোথাও সমতল, কোথাও অসমতল ভূমির মাঝে মাঝে নীড়-বিরাগীদের বাঁধা ছোটখাটো নীড়গুলি, হৃষীকেশী ভাষায় যাকে বলে 'ঝাড়ি'। না জানি কত

দেশ-বিদেশেব সন্ত এসে ঠাঁই নিয়েছেন ঐ ছোট্ট ঝাড়িগুলিতে, না জানি কত তপস্থায় নিবিড় গভীর হয়ে উঠেছে তাঁদের দিনরাত্রির জীবন-পরিক্রমা! কত গভীর-অগভীর, জানা-অজানা উদ্দেশ্য তাঁদের আছে, কেই-বা জানে! সহসা ওকি! কানে ভেসে আসে যেন কার মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ? কোনো মাতৃকণ্ঠেরই আর্ত্তনাদ মনে হয়। আর, আসছে যেন সেই সম্মুখস্থ একটি ঝাড়ির বক্ষ ভেদ ক'রে। ছুটে আসেন পরিব্রাজক—ক্ষিপ্রবেগে দ্বার খুলে ভিতরে প্রবেশ ক'রে দেখেন, বিক্ত গোধূলিব মতো মুমূর্ষু এক নেপালী সন্ন্যাসিনী—জীবনের শেষপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছেন; দু'চোখের প্রতীক্ষায় নির্ম্মম নিবাশা—করুণ কণ্ঠে চীৎকাব কবছেন, "এ মাঈ, এ মাঈ, অভি তক নেহি ভেজি।" পাশে এসে দাঁড়ান পরিব্রাজক, চেয়ে ছাখেন সন্ন্যাসিনী। সহসা দু'চোখের নির্ব্বাণ-সন্ধ্যায় জ্বলে ওঠে আনন্দের ধ্রুবতারা। সন্ন্যাসী যেন তাঁর বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত; উৎফুল্ল কণ্ঠে সন্ন্যাসিনী ব'লে ওঠেন—"এসেছ, শীঘ্র এসো—কাছে ব'সো। যা বলি, তা করো। আমার দেরি নাই।" চম্‌কে ওঠেন পরিব্রাজক —একি অদ্ভুত রহস্য! সন্ন্যাসিনী যে তাঁর চির-অপরিচিতা, তবে কেন বলেন এমন কথা? সময়েব পদক্ষেপে রহস্য হয় আরো জটিল। তবু এ রহস্যের শেষ কোথায় দেখতে—কাছে এসে বসেন পরিব্রাজক। ব'লেই চলেন নেপালী সন্ন্যাসিনী—"সন্দেহ কোরোনা। মাকে জিজ্ঞাসা কোরো; তিনি একটি সন্তানকে আমার শেষসময়ে পাঠাতে প্রতিশ্রুত আছেন।" চম্‌কে ওঠেন পরিব্রাজক—'মা', এ-যে চির-চেনার বাণী! সত্যই তো, তিনি যে মায়ের সন্তান—মায়েরই সেবক। তবে তো নয় প্রলাপ-বাণী, এ-যে অতিবড় সত্য। অবশেষে সন্ন্যাসিনী-মা'র নির্দ্দেশে পরিব্রাজক তাঁর উপাধানের তল হতে উদ্ধার করেন একটি দেবনাগরী পুঁথি, আর কিছু অর্থ। বিস্মিত হয়ে ভাবেন, কী হবে এতে? বলেন সাধু-মাঈ, "আমার মৃত্যু হলে, এ শরীর যেন সাধুদের দ্বারা নিক্ষিপ্ত হয় পবিত্র জাহ্নবীর বক্ষে, আর চতুর্থ দিবসে ঐ অর্থে যেন হয় সাধুদের ভাণ্ডারার ব্যবস্থা।"

"আর এই পুঁথি ?" "এই পুঁথি মুখস্থ করতে হবে তিন দিনের মধ্যে। তৃতীয় দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে ঐ পুঁথি দিতে হবে গঙ্গায় বিসর্জ্জন, এবং পুঁথিগত মন্ত্র কেবলমাত্র যেন লোক-কল্যাণ-অনুষ্ঠানেই হয় প্রযোজ্য।"

কর্ত্তব্য-অন্তে শান্তির শেষনিশ্বাস ফেললেন সন্ন্যাসিনী—'এ মাঈ' 'এ মাঈ' এই মহানাম-ই হ'ল তাঁর জীবনের পরিনির্ব্বাণ-মন্ত্র। সেই স্তিমিত কণ্ঠ প্রতিধ্বনিত-অনুরণিত হ'ল শৈলপ্রান্তরের গুহায় গুহায়। দিবস হ'ল অতিক্রান্ত—আঁধার টানলো একটি দীর্ঘ পরিচ্ছেদ। ··· সন্ন্যাসিনীর নির্দ্দিষ্ট সমস্ত কাজ শেষ ক'রে পরিব্রাজক ফিরে এলেন শ্রীশ্রীমা'র চরণপ্রান্তে; সাগ্রহে সানন্দে নিবেদন ক'রলেন পরিব্রাজক-জীবনের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত। হাসিমুখে শুনলেন মা, তারপর বললেন, "হ্যাঁ, আমাকে দিয়ে বলিয়ে নিয়েছিল, শেষসময়ে একটি-না-একটি ছেলেকে পাঠাতে। মেয়েটা খুব ভালো। অনেক-রকম অনুষ্ঠান জানতো। কাশীতে আমার কাছে আসতো।" পরিব্রাজক শুধান, "ঐ অনুষ্ঠান কি ক'রবো মা ?" মা বলেন, "ক'রবে বইকি। যাতে লোকের উপকার হয়, তা ক'রতে হয়। তবে নিজের মন সায় দিলে ক'রবে, নইলে নয়।" নিগূঢ় রহস্যময় এ লীলা কে বুঝবে ? কোন্ সুদূর অতীতের বুকে মিলিয়ে-যাওয়া অখ্যাত এক সন্ন্যাসিনীর দীন প্রার্থনা পূর্ণ করতে, এমনি অভাবনীয় প্রেরণায় জননী অনুপ্রাণিত ক'রবেন তাঁর একটি সেবককে, কেউ কি তা ভেবেছিল ? সত্যের প্রতিষ্ঠাই যে যুগের ঠাকুরের বাণী : "সত্য-ই কলির তপস্যা"। ঘন অপরিচয়ের মোহজাল ঠেলে, এমনি ক'রে কতবার কত চোখের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন স্বপ্নময়ী, কে জানে ! ··· ভক্ত সুরেন—তাঁর ধারণার বাইরে ছিল শ্রীঠাকুরের লীলাসঙ্গিনী ব'লে কেউ আছেন কিনা। বুঝি ভেবেছিলেন, যুগাবতার এবার একাই এসেছিলেন লীলার রসাস্বাদন ক'রতে; কিন্তু স্বপ্নলোকের কোলে কেন এসে দাঁড়ায় এক অচিন দুলালী, শ্রীঠাকুরের পাশে পাশে প্রতিটি বার ? ঠাকুর ক'ন কত কথা—

দেন কত উপদেশ, আর লীলাময়ীর সোনার মুখখানি ভ'রে শুধু জেগে-থাকে কনকচাঁপার কনক-গলা একটুখানি হাসি! মৌন-মুখের সে দিব্যহাসিতে যেন যুগের আঁধার হয় আলোয় আকুল। কে এই জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী? তাঁকে তো কই ছাখেননি কখনও, শোনেননি তাঁর নাম কারো মুখে! রহস্যের গভীরে মন মাঝে মাঝে দেয় ডুব—আবার মিলিয়ে যায় প্রশ্ন অবচেতনের অতল তলে।

তারপর একদিন মেলে দিশা—শ্রীঠাকুর একা নন, সাথে এসেছেন জননী যুগার্ত্তিহারিণী সারদা। আনন্দে-উদ্বেল ভক্ত সুরেন লেখেন ব্যথার লিপি—মা ছাড়া ছেলের ব্যথা কে বুঝবে? কিন্তু দিতে গিয়ে হ'ল এক ভাবান্তর। খেয়ালী ভক্ত ভাবেন—গোপন হিয়ায় নিত্য যিনি আছেন কান পেতে, তাঁকে অন্তরের ব্যথা জানাতে হবে কিনা লিপিকার মাধ্যমে—কী প্রয়োজন? তাঁর জানবার হলে, আপনিই জানবেন। নাড়ীর টানেই মা বুঝুক ছেলের দরদ। তাই হ'ল। কত রঙ্গই যে জানো জননী! তাই সহজ পথে জানানো হবেনা আপন মহিমা। ভক্ত দুর্গেশচন্দ্র—তাঁর স্বপ্নাবেশের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ান অশ্রুমুখী জননী, করুণায়িত চোখে অশ্রু যেন পদ্মপলাশে শিশির-চুম্বন। "ছাখ্ বাবা, আমার ভক্ত শিলং থেকে লিখেছে পত্র, প'ড়ে ছাখ্।" স্বপ্নের মাঝে সে-আদেশ হ'ল প্রতিপালিত। প'ড়ে ছাখেন, কী আশ্চর্য্য, এ যে তাঁরি বন্ধুবরের লেখা পত্র। কান্না-গলা কণ্ঠে বলেন জননী, "ওরে, আমি এখুনি যাব তার কাছে।" "শিলং সে যে অনেকদূর—কোথায় এত অর্থ, মা?" "আমার কি টাকার অভাব?" নিদ্রাজাল যায় ছিঁড়ে। দেবস্বপ্ন-প্রকাশের আছে বাধা—অথচ নীরব বিস্ময়ের মাঝে স্বপ্ন-রহস্যের সমাধান ক'রতে গিয়ে হয়ে পড়ে আরও রহস্যাবৃত। তার কূল যেন মেলেনা। বাধ্য হয়ে ছুটে যান বন্ধুবরের কাছে। "বল্ ভাই, একি সত্যি? সত্যিই কি মা এসেছিলেন আমার কাছে তোমার চিঠিখানি নিয়ে?" নীরবে মৌনমুখে বন্ধু লিখে-রাখা চিঠিখানি মেলে ধরেন দুর্গেশচন্দ্রের চোখের সামনে।

সে মুখে আর সেই শ্রদ্ধানত চোখে তখন ফুটে উঠেছে এক গভীর বিশ্বাস আর সান্ত্বনার দিব্যদ্যুতি।
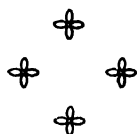
দূর-বিসর্পিত দিগ্বলয়ের একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে বিক্রমপুর-কাঁঠালতলীর এক প্রাচীন দেবালয়, নাম তার 'বনদুর্গার বাড়ি'। সর্ব্বাঙ্গে অতীতের নামাবলী চিহ্নিত ক'রে চেয়ে আছে যেন এক অনামী দ্রষ্টার মতো। শাল-নীপ-তিনিসের নিবিড় আড়ালে হারিয়ে গেছে ওর নতুন পরিচয়। কোন্ সুদূর যুগ হতে দাঁড়িয়ে আছে, কে জানে! ওই-যে পুরানো বটের শেকড়গুলি জড়িয়ে ধরেছে ওর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ—ও দেউল যেন ওদেরও জন্মদ্রষ্টা।

১৩১২ সালের রৌদ্রমগ্ন এক নিদাঘ-মধ্যাহ্ন। সেই গহিন বনতীর্থে সেদিন জেগে ওঠে কার যেন বুক-চাপা কান্না। সেই অশ্রুল আবেদনে দেব-প্রাঙ্গণ যেন গুমরে ওঠে। কাঁদছে এক দীনার্ত্ত ভক্ত। ভাবের রুদ্র অভিশাপে সে আজ অসহায়, গৃহ-বিতাড়িত—তাই কাঁদছে আকুল হয়ে বিশ্বার্ত্তিহারিণীর দেউল-দ্বারে: "মা, মা গো—কোথায় তোর দক্ষিণ-পাণি? তুই দশভুজে জগৎকে বিলাচ্ছিস্ বরাভয়ের পরসাদ, তবে আমি কেন রই, মা গো, উপবাসী? কোন্ অপরাধে?" ধ্যানময় তন্দ্রা আসে নেমে—ঘন পত্রজালে সমাচ্ছন্ন বনাঙ্গনে যেন জাগে তপোবনের হোম-গন্ধ। কে ঐ দেবী? মূর্ত্ত হয়ে ওঠে চণ্ডীর অষ্টকুমারীর রূপের মাঝে দেবীর মাহেশ্বরী-যোগিনী রূপ: "ত্রিশূলচন্দ্রাহিধরে মহাবৃষভবাহিনী, মাহেশ্বরী-স্বরূপেণ নারায়ণি নমোঽস্তুতে"—ধ্বনিত হয় ঋষিকণ্ঠের দেবস্তুতি। আলুলায়িত জটাভার উদ্ধত ফণিনীর সর্পিল ছন্দে এসেছে নেমে, বাম হস্তের ত্রিশূল-ফলকে চন্দ্রদ্যুতি, অঙ্গের গৈরিক বাসে যেন নেমে

এসেছে বিদ্যুদ্বন্যা।—বনদুর্গার বাড়িতে বনবাসিনী বনদুর্গারই বুঝি হ'ল প্রকাশ! মমতা-বিগলিত কণ্ঠে আর বরদহস্তের সস্নেহ সঞ্চালনে ভক্ত পায় পরম আশ্বাস: "আর কাঁদিস্‌নি, তোর চাকরির যোগাড় হচ্ছে।" সচকিত হয়ে ওঠে ভক্ত, ধ্যানাবেশ যায় টুটে—কোথায় বা কে! সামনে দৃষ্টি-বাধিত-করা ঘন বৃক্ষের মোহজাল, আর আছে শুধু সারা অঙ্গে অভয়াব অভয়-হাতের অমৃত-স্পর্শের শিহরন—সত্যই একদিন দারিদ্র্যের করাল গ্রাস হতে মুক্ত হ'ল ভক্ত। যোগনিদ্রায় ক্ষণিক দর্শন—পরিণত হ'ল বাস্তবে। জননী সারদার দর্শনমাত্র খুঁজে পেলেন ভক্ত—ধ্যানলোকে বনদুর্গার ক্ষণিক-দেখা শ্রীমুখখানি। কণ্ঠে পেলেন বনদুর্গারই কণ্ঠধ্বনি। চরণ-দুটি আঁকড়ে ধ'রে অশ্রুজলের নৈবেদ্যে আপনাকে ক'রলেন সমর্পণ, আর পরিবর্তে পেলেন অগাধ কৃপা আর আশ্বাস-বাণী: "সব সময়ে মনে রেখো, ঠাকুর আর আমি সঙ্গে সঙ্গে আছি।" কিন্তু হায়, মায়ের এত বুক-ভরা দরদ, তবু তাঁর ভুলো ছেলেদের অভিমান যায় না! মায়ের দরদ পেয়ে বুক যেন আর ভরে না। কোন ছেলে হয়তো অভিমান-রুষ্ট কণ্ঠে ব'লেই বসে, "তুই যদি মা ভববন্ধনহারিণী, তবে কেন কাটিস্‌না আমার ভবের বাঁধন? না যদি কাটিস্, তবে দূরেই থাকবো প'ড়ে! ফিরিয়ে নে তোর মন্ত্র-তন্ত্র। চাই না—কিছুই চাই না আমি।" শিশুর অভিমানে সে-ভক্ত ধুলায় দেয় গড়াগড়ি, আর মায়ের বুকের ব্যথা ততই যেন তাকে টেনে আনে কোলের কাছে; কাছে ডেকে মা বলেন, "দ্যাখ্ বাবা, সূর্য্য থাকে আকাশে আর জল থাকে নদীতে, জলকে কি ডেকে বলতে হয় 'ওগো সূর্য্য, তুমি আমাকে উপরে তুলে নাও'? সূর্য্য আপনার স্বভাব থেকে জলকে বাষ্প ক'রে উপরে তুলে নেয়। তোমাকে কিছু ক'রতে হবে না।"

✤

✤ ✤

✤
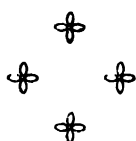
শুধু দুটি ফোঁটা অশ্রু। আবার কখনও বা তাও নয়, শুধু অহেতুক করুণা। তাই হ'ল যুগের পথিকদের পাথেয়। যুগের দিশারীর হাতছানির পালা সুরু হয়ে গেছে, আর ভাবনা কি? খেয়াঘাটের কাছে তাই জমে উঠেছে ভিড়,—স্বপ্নে জাগরণে, আব্ছা আভাসে, আধো তন্দ্রায়, ধ্যানবিলাসে ইসারায়—ডাক-দিয়ে-যাওয়া আর ফুরায় না: "আয়, ওরে আয়, পারে যাবি তো আয়! আমরা যে ব'সে আছি তোদেরি পথ চেয়ে।" ··· কোন ভক্ত-সন্তানকে স্বপ্নলোকে অগ্নির আখরে ঠাকুর দিলের ইষ্টনাম। আর, স্বপ্নাদিষ্ট মন্ত্র না জেনেই, তাকে পরিপূর্ণতা দিলেন মা বাস্তবে—সেই নামই বীজ-সংযুক্ত ক'রে। বিস্মিত ভক্ত অন্তর্য্যামিনীর ধ্যান-সমাহিতা মূর্ত্তির পানে শুধু চেয়েই থাকে। চিনতে গিয়েও যেন পারেনা চিনতে। শুধু মনে হয়, অবিশ্বাসের আঁধারেই কি লুকিয়ে থাকে বিশ্বাসের পরশমণি! তা না হলে, অচেনা রাতের শেষে হঠাৎ চির-চেনার প্রভাতটি দেখা দেয় কেমন ক'রে? আর তার সাড়া পেয়ে কুঁড়ির আড়াল ভেঙে কেমন ক'রেই বা ভাঙে হাজার ফুলের ঘুম! মায়ের করুণামুগ্ধ ভক্ত কখন যেন লুটিয়ে পড়ে মা'র চরণে—শুধু আবেগ-আকুল শ্রবণে পশে জননীর চিরন্তনী আশ্বাস-বাণী: "কিছুই যদি করতে না পারো, আমি আছি।" কৃপাধন্য ভক্তের মৌন অন্তর শুধু বলে: "তা জানি, মা।" অফুরান কৃপা—অকৃপণ হাতে বিলিয়ে দিয়েছেন অন্নপূর্ণারূপে করুণার পরসাদ। কখনও পূজার আসনে বিধি-নিয়মের চিরাচরিত পথে দিচ্ছেন সন্তানকে ইষ্টনাম, আবার কখনও অনুরাগের বন্যায় ভেসে গেছে নিয়মের দুর্লঙ্ঘ্য বাধা; অশ্রুজলে বিগলিত ভক্ত জড়িয়ে ধরেছেন রাতুলচরণ, আর বরাভয়া কর্ণপুটে দিচ্ছেন সুধামাখা রামকৃষ্ণ

নাম—হয়তো মধ্যপথে, উন্মুক্ত প্রান্তরে, খড়ের আসনে ব'সে কিংবা গৃহাঙ্গনের ছাঁচতলাতেই সমাধা হচ্ছে পবিত্র দীক্ষাদান-ব্রত—আলুলায়িত কুন্তলে, প্রসন্ন-গম্ভীর বদনে। অধিকাংশ সন্তানই দেখেছে দীক্ষালগ্নে জননীর এই মহীয়সী দেবীমূর্ত্তি। মুক্ত কেশপাশেই বুঝি মুক্তিদাত্রীকে মানায় ভালো। শুধু কি তাই, সময়ে সময়ে দেখা গেছে কৃপায় হয়ে উঠেছেন আকুল—বিশ্বের ছেলের ব্যথার ধুলা অঙ্গে মেখে দেহ হয়ে গেছে ভোরের ম্লান জ্যোৎস্নার মতো ক্ষীণকান্তি। তাদের ভোগরাশি প্রকটিত হয়ে উঠেছে দেবতনুর রোগরূপে—তখনও হয়তো শয্যালীনা, কিন্তু চরণে দীক্ষাপ্রার্থী ভক্তের বেদন-নিবেদনের অশ্রু-অর্ঘ্য ঝ'রে পড়তেই, আকুল হয়ে উঠে বসেছেন মা; আর, চরণায়িত ভক্তকে করেছেন অভয়মন্ত্রে দীক্ষিত। ক্বচিৎ কখনও যদি জেগে উঠেছে শান্ত-সজল চোখে বিরক্তির ভ্রূকুটি, হয়তো কোন ভক্ত মেয়ের প্রতি পরীক্ষা-ছলেই করুণকান্ত অধরে ফুটে উঠেছে উষ্মার কঠোর বাণীঃ "না, আর আমি পেরে উঠছি না!" কিন্তু মর্ম্মাহত কন্যা অশ্রুজলে দেউলতল সিক্ত ক'রে যেই গেয়ে উঠেছে—

"যে হয় পাষাণের মেয়ে
তার হৃদে কি দয়া থাকে"

—সঙ্গে সঙ্গে কোথায় যায় সেই কঠোর রুদ্রাণীরূপ, এ যেন দ্রবময়ী জাহ্নবী করুণারসে টলমল, ভাব-বেপথু অঙ্গ; বিগলিত কণ্ঠে বলেন, "আর একটি গান গা', মা—আর একটি গান গা'।" ভক্ত মেয়ে সুললিত কণ্ঠে গানে-গানে জানায় তার প্রাণের কথা। আর মা? পূজার আসনে বসে স্তব্ধ স্থির, পূজাঞ্জলি হাতের মুঠায় থাকে প'ড়ে—গোপনতার আড়াল গেছে খ'সে, দুটি চোখের আয়ত মমতায় ফুটে উঠেছেঃ "আমি যে মা গো!" কান পেতে এখন শুনছেন মরমীর মনের কথা,—আর্ত্তের ডাক। তারপর এই হৃদয়-ঢালা গানের টানেই বাঁধা পড়েন—চিরদিনের বাঁধন-হারা। চোখের জল আর বুকের ব্যথা—সুরের সাধনের সঙ্গে যেন তাদের

আছে এক অচিন্ত্য যোগাযোগ। কেন? তার কারণ বুঝি কেউই পায়না খুঁজে!

তা না হলে, সমাজের চক্ষে যারা হীন, আপন আদর্শকে পদলাঞ্ছিত ক'রে যারা দাঁড়িয়েছে সমাজের বহু নিম্নস্তরে, তাদের সুরেও যদি নেমে এসেছে ক্ষণিক ভক্তির নির্ঝরিণী অশ্রুজলের ধারায়, করুণায় বিহ্বলা জননী হয়ে উঠেছেন আকুল। ··· সেদিন বাগবাজারে মাতৃমন্দির মুখরিত হয়ে উঠলো একটি কণ্ঠের গুমরে-ওঠা সুরের মূর্চ্ছনায়ঃ

"আমায় নিয়ে বেড়ায়
হাত ধ'রে ···"

—এ-যে গিরিশচন্দ্রের 'বিল্বমঙ্গল'-এর সেই পাগলীর কণ্ঠ—কে গায়? সুরের মোহ সকলের হাত থেকে ছিনিয়ে নেয় কাজ, টেনে নিয়ে আসে সেখানে, যেখানে চলেছে ভাব ও সুরের মিলন-মেলা। ছুটে আসে গৃহবাসী, দ্যাখে চরণ-দুটি মেলে বসে আছেন জননী, সবেমাত্র তখন পূজা হয়েছে সারা। আলুলায়িত-কুন্তলা, নয়ন-দুটি অর্দ্ধ-নিমীলিত, একবার ক'রে ত্রিনয়নী চাইছেন আরাধ্য দেবতার মুখচন্দ্রের পানে—সে আঁখি প্রেমাশ্রুতে উঠেছে ভ'রে, আর গায়িকার কণ্ঠে তখন নেমেছে নবানুরাগের বন্যা—গেয়ে চলেছেঃ

"মুখখানি সে যতনে মুছায়
আমার মুখের পানে চায়
আমি হাসলে হাসে, কাঁদলে কাঁদে,
কতই রাখে আদরে ··· "

ফেনিয়ে ওঠে ভাবের সাগর। স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন জননী। দৃষ্টি হয়ে গেছে স্থির—জাগ্রত কুণ্ডলিনী-শক্তি যেন গানের বাঁশীতে হয়ে গেছেন আবিষ্ট, সদাশিবের নয়নে নয়ন রেখে স্থির হয়ে আছেন ব'সে, আর ভাবের ঘোরে মাঝে মাঝে উঠছেন দুলে; বলছেন "আহা! আহা!!"। সুরের খেলায় কাটে বহুক্ষণ। ধীরে ধীরে থেমে যায় গান, কিন্তু তার মিলিয়ে-যাওয়া আকুল

রেশখানি যেন তখনও কেঁদে ফেরে পূজাশেষের ধূপসুরভির মতো। অনেকক্ষণ পরে নয়নপল্লবে ফিরে আসে নর্ম্মলীলার কাঁপন, মা মোছেন প্রেমাশ্রু—গায়িকা পায় জীবনের পরম পাথেয়, মায়ের বুক-জুড়ানো প্রসন্নতাঃ "আজ কী গানই শোনালি, মা!"
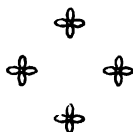
মনে পড়ে, সেদিন নেমে এসেছে তিমির-ঘেরা মায়াবিনী রাত্রি—ঘুমের কাঠি ছুঁইয়ে দিয়েছে যেন মহানগরীর কর্ম্মচঞ্চল অঙ্গে—চপল শিশু হঠাৎ যেন খেলতে খেলতে গেছে ঘুমিয়ে যাদুকরীর ঘুমের যাদুতে ·· অন্ধকারের ভীরু আলিঙ্গনে নিঃশব্দে কাঁপছে একটা অচঞ্চল মুহূর্ত্ত—হাজার-তারার-প্রদীপ-চোখে স্বপ্নহীন জাগরণ। হঠাৎ বাগবাজারে মাতৃদেউলের দ্বারে কে যেন জড়িত বিস্রস্ত কণ্ঠে ডাকেঃ "দোস্ত্—দোস্ত্!" ঘুম ভেঙে যায় সকলেরই। অবচেতনের নির্ম্মম রিক্ততায় ভরা সে ডাক, মূর্ত্ত নিশাচরের ডাকের মতোই বুঝি লাগে গৃহবাসীর কর্ণে। শিউরে ওঠে সকলে, ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে। কেউ দেয়না সাড়া, শুধু বোঝেন মা'র সেবক শরৎ-মহারাজ—পথিক আর কেউ নয়, গিরিশচন্দ্রের নাটকের জনৈক অভিনেতা পদ্মবিনোদ তাঁকেই ডাকছে। কিন্তু প্রকৃতিস্থ অবস্থায় নয়, অত্যধিক মদ্যপানের ফলে বিকৃত-মস্তিষ্ক। তাই নীরব রইলেন শরৎ-মহারাজ। শুধু মনে-মনে বললেনঃ "এই রে, পাগলা মায়ের বিশ্রামের ব্যাঘাত না ঘটায়!" এদিকে নিরুত্তর অন্ধকারে হতাশার ব্যর্থতা নিয়ে সেদিন ফিরে গেল পদ্মবিনোদ; শুধু জড়িত কণ্ঠে ব'লে গেল, "ডাকলুম, সাড়া দিলিনি।" তবু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলো গৃহবাসী; ভেবেছিল, না জানি কী অঘটনই ঘটাবে ঐ অপ্রকৃতিস্থ মানুষটি! অলক্ষ্যে হাসলেন অন্তর্য্যামী।

পরের দিন ঠিক তেমনি সময়ে তপস্বিনী শর্ব্বরীর অন্ধকারকে দীর্ণ ক'রে জাগে সেই আর্ত্ত আহ্বান: "দোস্ত্, দোস্ত্!" চম্‌কে ওঠে গৃহবাসী। সেদিনও কেউ দেয়না সাড়া। সভয়ে বলেন শরৎ-মহারাজ, "এই রে, পাগল এবার এক কাণ্ড ক'রে না বসে!" বোঝেন তিনি আজকের আকুলতা যেন আরও নিবিড় আরও গভীর। পথহীন একটা কালো ছায়ার মাঝে সে-ডাক যেন খুঁজছে একটুখানি আলো—আর কিছু নয়। কিন্তু উপায় কী? পাগল কিন্তু আজ মরিয়া হয়ে উঠেছে, বুঝি বাসনার জতুগৃহে সুরু হয়েছে আত্মার দহন-লীলা। কী বোঝে সে, কে জানে! হয়তো বোঝে, সে-আঁধার-রাতে সাড়া দিতে আর কেউ থাকেনা জেগে; থাকেন শুধু একজন। তাই বেদন-মত্ত সুরে সহসা আহ্বান করে তাঁকেই। কণ্ঠ হতে জড়তা তখন গেছে মুছে—অশ্রুতে আকুল হয়ে উঠেছে হু'চোখের দৃষ্টি; গাইছে—

"ওঠো গো করুণাময়ী,
খোলো গো কুটীর-দ্বার—
আঁধারে হেরিতে নারি, হৃদি কাঁপে
অনিবার॥

সন্তানে রাখি বাহিরে আছ সুখে অন্তঃপুরে—
ডাকিতেছি মা মা ব'লে, নিদ্রা কি
ভাঙে না তোমার?"

আকুল হয়ে কেঁদে ওঠে রাতের অশ্রুমন্থর আকাশ ··· খুলে যায় মাতৃদেউলের বাতায়ন-দ্বার, আর তার মাঝে ফুটে ওঠে করুণা-আয়ত হুটি নিশীথতারা! আর, পাগল—আনন্দে উন্মত্ত হয়ে ব'লে ওঠে, "উঠেছ, মা? সন্তানের ডাক কানে গেছে? উঠেছ তো, পেন্নাম নাও।" তারপর আর কি, সাষ্টাঙ্গ হয়ে ধুলায় গড়াগড়ি! আনন্দাশ্রুতে ভিজে ওঠে পথ। সেই অশ্রুসিক্ত রাঙা ধূলি খানিক

মাথায় তুলে নিয়ে সেদিনকার মতো পাগল যায় চ'লে—শুধু দূর হ'তে ভেসে আসে তার হারানো মনের সুর :

"যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে
মন তুমি ছাখো আর আমি দেখি আর যেন কেউ নাহি ছাখে
—দোস্ত্‌ যেন নাহি ছাখে।"

নিদীপ রাত্রির আঁধারে তখন একটি তারাই প্রদীপ ধ'রে ছিল পূব আকাশের প্রান্তে ···

এমনি ঘটে প্রায় প্রতিদিন। পদ্মবিনোদ আসে—গান শোনায়, দর্শন করে, আর চ'লে যায়। ভাষা-ভরা কান্নার মতো সে-গান শুধু আছড়ে পড়ে অন্তর-বাহিরের মোহনায়। কোনদিন সে গায় :

"শ্মশান ভালবাসিস্‌ ব'লে
শ্মশান ক'রেছি হৃদি
শ্মশানবাসিনী শ্যামা
নাচবি ব'লে নিরবধি"

—আর গানের টানে, নামের টানে আর প্রাণের টানে আকুল হয়ে ছুটে আসেন জননী—দর্শন দেন বাতায়ন খুলে। ভক্তদের বলেন—"দেখছো বাবা, জ্ঞান কী টনটনে ?" ভক্তরা করে অনুযোগ : "কিন্তু মা, আপনার যে ঘুমের ব্যাঘাত করে।" বলেন মা, "তা হোকগে, বাবা—ওর ডাকে যে থাকতে পারিনে, তাই দেখা দিই।" কী অপরূপ দৃশ্য—কোথায় পাগল ছেলে সারাদিন পথের ধুলায় মাটী মেখে এসে ডাকছে কেঁদে, আর তার জন্য মায়ের বুক উঠছে নিঙড়ে! গভীর রজনীতে ভুলো ছেলের মায়ের সাথে বোঝাপড়া, এই দিব্য-লীলার প্রদীপ-আলোই তো দেবে ধরার ছেলের পথের দিশা। তা না হলে, সে পথ চলবে কেমন ক'রে ?

দেখতে দেখতে আশা-নিরাশার স্বপ্নের মতো কেটে যায় ক'টি দীর্ঘ দিন, দীর্ঘতর রাত। হঠাৎ সেদিন আসে সংবাদ পদ্মবিনোদ

অসুস্থ ; উদরী-রোগে আক্রান্ত। ছুটে আসেন ভক্তদল—সেবাভার তুলে নেন নিজেদের হাতে ; চলে প্রাণপাতী চেষ্টা পদ্মবিনোদকে বাঁচিয়ে তুলতে। দিন যায়—জীবন যুঝে চলে মরণের সাথে, কিন্তু মনে হয় মৃত্যুই যেন হতে চলেছে জয়ী। কারণ ভক্তদের সব চেষ্টাকেই বিফল ক'রে দেয় পদ্মবিনোদ নিজে। সে তার বহুদিনের সংস্কার মত্ততার অভ্যাস ছাড়তে পারেনা কোনমতেই। ধীরে ধীরে ঘনিয়ে আসে জীবনের পরাজয়ের লগ্ন—সেদিনের রাত একটা বিনিদ্র আশঙ্কায় ক'রছে থমথম—শয্যালীন পদ্মবিনোদ ক্ষত-বিক্ষত জীবনের বেদনার অন্তে যেন দেখতে চাচ্ছে একটা শেষ আশ্বাসের স্বপ্ন। হঠাৎ সে ব'লে ওঠে, "আর বাঁচব না, একটা আঙুর চেয়েছিলুম, দিলিনি ? তা না দিয়েছিস, বেশ করেছিস—আর চাইব না। এখন একটা কাজ কর্, দোস্ত্, ঠাকুরের কথা শোনা—আমার শেষ হয়ে এসেছে ."

সুরু হ'ল কথামৃত-পাঠ। খোলার সঙ্গে সঙ্গে উঠলো তাঁর পবিত্র রামকৃষ্ণনাম—শুনছে পদ্মবিনোদ, তন্ময় হয়ে শুনছে ; দু'চোখের পাণ্ডুর ছায়ায় যেন কিসের আলো, আর সমস্ত চিন্তা গেছে তার হারিয়ে। সে কি মৃত্যুর মুখোমুখী দাঁড়িয়েছে ? না, দাঁড়িয়েছে জীবন-মরণের পারে আলোর দেশের মোহনায় ? কে জানে, কাকে সে দেখলো একটিবার ; মুখ দিয়ে উচ্চারিত হ'ল 'রামকৃষ্ণ', আর নয়ন হতে পড়লো ঝ'রে দুটি ফোঁটা অশ্রু, তারপর সব শেষ ! যে গভীর রজনীতে সে চোখের জলে আর নামের টানে পেয়েছে পরম-পাওয়া, শেষের দিনেও ঠিক সেই রজনীর গভীরে চোখের জলে আর নামে সে পেলো আত্মার পরমাত্মীয়টিকে—আর তেমনি ক'রে বুঝি লুটিয়ে দিলো ধুলার দেহ ধুলার বুকে ! বলেন জননী, "ঠাকুরের ছেলে যে—কাদা মেখেছিল, তা হয়েছে কী ? যাঁর ছেলে তাঁরই কোলে গেছে।"

চির-অচিন ভগবান। চির-অচিন তাঁর ভক্ত। তাই চিরকালের রহস্য দিয়ে গড়া ভক্ত-ভগবানের নিত্যলীলার বৃন্দাবন।

এমনি কত বার হয়েছে। ··· সেদিন কোথা হতে এলো দিব্য এক উন্মাদিনী—শতচ্ছিন্ন মলিনবাস, রুক্ষ-জটিল কেশ, ধূলি-ধূসরিত বেশ। কে চিনবে—কেমন পাগল? অনুমতির অপেক্ষা সে করে না—স্বচ্ছন্দ পায়ে, চির-চেনার ভঙ্গীতে সে চলে মাতৃ-সন্নিধানে। ত্রস্ত হয়ে ওঠেন মায়ের দ্বারী—সারদানন্দ-মহারাজ: "ওরে ছাখ্ ছাখ্, কে একটা পাগলী উপরে গেল।" দেখতে দেখতে সে তখন পৌঁছে গেছে যথাস্থানে, আর মা পরম আদরে তাকে নিয়েছেন আহ্বান ক'রে, "এসো মা, এসো!" তার কিন্তু ভ্রূক্ষেপও নাই। হাতের মন্দিরাতে ছন্দ তুলে সে গাইছে: "দে দে আমায় সাজায়ে দে, তোরা সাজায়ে দে—আমি যোগিনী হবো, প্রাণকানু লাগি যোগিনী হবো ···"। মন্দিরের দ্বারে দাঁড়িয়ে সে কী নিবেদনের আকুল ভঙ্গী, দেখলে চোখ ফেরে না! বাইরের রূপ-ঐশ্বর্য্য বিধাতা তাকে দেন নাই, তাতে কি? ভিতরে যে তার অগাধ সম্পদ—অন্তরের সব রস নিঙড়ে সে আজ দিচ্ছে তার পাষাণ-দেবতাকে; কখনো হাত-দুটি জোড় ক'রে নতজানু হয়ে, কখনো-বা বাহু প্রসারিত ক'রে দাঁড়িয়ে—কত ভাবে, কত ভঙ্গীতে। তার ভাবোন্মত্ততায় উদ্দীপন হয় মহাভাবময়ী জননীর—স্তব্ধ হয়ে শোনেন সেই দিব্যকণ্ঠের সুর। উন্মাদিনী চলে যেতে চায়। পাগলী মেয়ের ছিন্নবাস দেখে, করুণাময়ী দিতে চাইলেন নববস্ত্র, ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য প্রসাদ, কিন্তু পাগলী যে কিছুই চায়না নিতে। তার চাওয়া যে পরম-চাওয়া! যেমন এসেছিল তেমনি ক'রেই সকলকে বিস্মিত ক'রে চলে যায় আকস্মিকা —শুধু রেখে যায় একটি অনামী জীবনের নিবেদন। পরম স্নেহে ব'লে ওঠেন মা, "জোর বৈরাগ্য—ও নেবে না, খাবে না, শরীর ত্যাগ ক'রবে।" মনে পড়ে, শ্রীঠাকুরের সাধন-লীলাতেও এসে জুটেছিল এমনি এক গোপন মহাপুরুষ জ্ঞানোন্মাদের বেশে। সেদিন মূর্ত্ত ভৈরবের মতো উন্মাদের ভীমকণ্ঠনাদে কেঁপে উঠেছিল ভবতারিণীর পাষাণ-দেউল, আর আজ প্রেমোন্মাদিনীর কণ্ঠ-লাবণ্যে যেন গঙ্গাতরঙ্গ ব'য়ে গেল শ্রীঠাকুরের এই ক্ষুদ্র দেবায়তনে।

ঠিক এমনি ঘটনাই ঘটলো আরেক দিন। কালীঘাট হতে চলেছেন মা নকুলেশ্বরের পথে—রাঙা রোদের বেলা পথের বুকে বিছিয়ে দিয়েছে একটি স্নিগ্ধ অলসতা। চলেছেন জননী, উদাসীন আনমনা, তৃণস্তরে চরণের নিবিড় চিহ্ন এঁকে।

সহসা চলার পথখানি আগলে দাঁড়ালো এক অচেনা নামগোত্রহীনা ভৈরবী—অঙ্গে দীপ্ত গৈরিকবাস, হাতে মহাভৈরবের নির্ভীক প্রতীক—ত্রিশূল। অপলক দৃষ্টিতে সারদাগৌরীর মুখের পানে চেয়ে সে কী দেখলো কী বুঝলো, সেই জানে; গেয়ে উঠলো :

কেমন ক'রে পরের ঘরে ছিলি উমা বল্ গো তাই—
কত লোকে কত বলে শুনে প্রাণে ম'রে যাই।

ভাবে বিভোর হয়ে সে গেয়ে চলে—চার পাশে জ'মে ওঠে ভিড়। সুরের মোহ এমনি মোহ। আর আমাদের উমামহেশ্বরী মা সারদা? হারিয়ে-যাওয়া কল্পলোকে তাঁর রূপখানি তখন নিথর নিস্পন্দ—কোন্ শিবদ্রুমের পত্রচ্ছায়ে মন হারিয়ে গেছে, কে জানে! হয়তো বা তাও নয়। বরষ-পরে ফিরে এসেছেন শিবগেহ হতে মা মেনকার আঁধার কোলে; মায়ের চোখের জলে ধুয়ে গেছে বুঝি ঘন ভ্রূলতার মাঝে ভস্মাঙ্কিত ত্রিপুণ্ডক-চিহ্ন—নিবিড় বাহুবন্ধনের মাঝে শুনছেন গিরিজায়ার আনন্দ-বিলাপ :

মায়ের প্রাণ কি ধৈর্য্য ধরে
জামাই নাকি ভিক্ষা করে;
এবার নিতে এলে হরে,
ব'লবো উমা ঘরে নাই॥

গান শেষ হয়, তবু ভাবের নেশা যেন জড়িয়ে আছে সবার মনে। একটু সম্বিৎ ফিরে আসতেই, ইঙ্গিতে মা জানান ভৈরবীর হাতে কিছু তুলে দিতে। সেই উন্মাদিনীর মতোই ভৈরবী নারাজ; বলে, "যার কাছে যা নেবার তাই নিতে হয়, মা, তুই যেখানে যাচ্ছিস্, যা।" পথ ছেড়ে সে স'রে দাঁড়ায়। ভাববিহ্বলতার আবেশ-জড়ানো

চরণে চ'লে যান জননী—নীরব-প্রেমান্বিত আননে জাগে এক দিব্য দ্যুতি। আর ভৈরবী ? মা'র চলে-যাওয়া পথের পানে ক্ষণিক চেয়ে, তুলে নেয় সেই চরণ-রঙে-রাঙা পথের ধূলি, আর রাখে মাথায় তুলে ; অতি যতন ক'রে যেমন রাখে, হারা মনের মানিক।

চিরদিনই সুরের মোহে মা এমনি হয়ে পড়তেন বিহ্বল। মনে পড়ে, স্বভাবসিদ্ধ লজ্জার আড়ালে থেকেও, দখিনাপুরে নহবতের ছোট্ট কোণটি মুখর ক'রে কোন একদিন মা সুরের মূর্চ্ছনায় আকুল হয়ে উঠেছিলেন—সে কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়েছিলেন লক্ষ্মীদিদি। বকুল-তলার ঘাটে বাটে তার নিবিড় আবেদন যেন গুমরে ফিরছিল। জানিনা আর কেউ শুনেছিল কিনা, কিন্তু শুনেছিলেন তিনি—সেই দখিনাপুরের দেবতা। এ সুরের মালা তাঁর উদ্দেশেই তো ভাসিয়ে-দেওয়া। তারার আলো-ঢালা রাতের আঙিনায় ব'সে, ভাবে তন্ময় হয়ে শ্রীঠাকুর শুনেছিলেন সে-গান, আর পরদিন অনিন্দ্য উদ্বেল-কণ্ঠে বলেছিলেন মাকে, সঙ্গীত-রসিকের ভাষায় ঃ "কাল তোমাদের গান যে খুব জমেছিল।"

খুবই প্রিয় ছিল মা'র সঙ্গীতকলা। যে গানটি ভালো লেগেছে, সেইটিই লিখে নিয়েছেন। পরেও কোন কোন মর্ম্মী ভক্তের সাক্ষাতে গেয়েছেন গান, মৃদু-মধুর লাজুক কণ্ঠে। কিন্তু সেও ক্বচিৎ-কখনও। সে-যুগের পল্লীসমাজের মেয়ে আমাদের জননী সারদা, তাই কোনদিন ভাঙেননি তার কোন রীতি কোন বিধি-ব্যবস্থা।
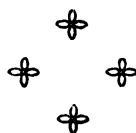
গগন-তট-নিষণ্ণ পাণ্ডুর সন্ধ্যায় কি সব বেলারই সমাপ্তি! দিনে-দিনে মা'র দেবতনু হয়ে পড়ে অসুস্থ, তবু দহন-ব্রতের পালা হয়না শেষ। কত যুগের জমিয়ে-তোলা সংস্কারের বোঝা সারাজীবন

বহন ক'রে সেদিন শ্রান্ত দুটি ছেলে এসেছে জননীর দেউল-দ্বারে ঃ "মা গো, আর তো পারি না—এবার আশ্রয় দাও তোমার চরণে!" গৃহবাসীকে বিস্মিত সচকিত ক'রে সহসা কেমন যেন বিরূপ হয়ে ওঠেন মা—করুণ দুটি চোখে জাগে কেমন যেন নির্ম্মম বৈরাগ্য। ধুলার ছেলের ধুলা মুছিয়ে, কোলে তুলে-নেওয়া তো মায়ের নিত্য-দিনের কাজ, কিন্তু আজ যেন দেবতনু একান্ত ব্যথাহত, সে তনু আর বুঝি পারেনা সাধের কালি মাখতে ; বিরূপ মন ব'লে ওঠে ঃ "অনেক হয়েছে, আর পারছি না"। এদিকে নিরুপায় সন্তান ধুলায় প'ড়ে কাঁদছে অসহায়ের মতো। হায়, সব চোখের জল বুঝি ফুল হয়ে ফোটে না, বাজে কাঁটা হয়ে! তার কান্না দেখে অপর ভক্তের জাগে সহানুভূতি, তাই জানায় করুণ মিনতি ঃ "তুমি কৃপা না ক'রলে, কে কৃপা ক'রবে মা?" শুদ্ধসত্ত্বময়ী জননীর কণ্ঠ যেন নীরব উদাস ; শুধু বলেন, "ওদের দেহ যে অশুদ্ধ।" ভক্তটির মন তখন আকুল হয়ে উঠেছে সমবেদনায় ; বলে, "তবে উপায়? বড় যে কাঁদছে, মা!" চকিতে সব আপত্তি, সব বাধা গেল যেন মমতার বন্যায় ভেসে। রুদ্রাণী মা'র দুই চোখে জাগলো ক্ষমার দাক্ষিণ্য ; বললেন—"উপায় আছে, বাবা, ওদের এখানে তিন রাত্রি বাস করতে বলো। এখানে তিন রাত্রি বাস করলে, দেহ শুদ্ধ হয়ে যাবে। এটা শিবের পুরী কিনা।" শিবজায়া স্বয়ং যেখানে অধিষ্ঠাত্রী, শিবশঙ্করও যে সেখানে নিত্য বিরাজমান—নিত্যতীর্থ সেই তো আমাদের স্বর্ণ-কৈলাস। তাই বুঝি কোন ভক্ত যখন প্রশ্ন ক'রেছেন, "ঠাকুর যদি স্বয়ং ভগবান, তুমি তবে কে, মা?" সহজ প্রাণের প্রশ্নের আসে সহজ উত্তর ঃ "আমি আর কে? ভগবতী।"

* * *

মনে পড়ে এক আনন্দ-তন্ময় লগ্ন, পাখির রোমাঞ্চ-আঁকা আকাশ তাকিয়ে আছে মাটীর পানে—দেখছে ধুলার রোমে রোমে কার চরণের শিহরন। কোয়ালপাড়া জগদম্বা-আশ্রমের বহির্ভবনে মা আর ছেলেতে হচ্ছে কথা। ছেলের কথা আর ফুরায় না। সহসা

পল্লীর স্তব্ধ-অলস মধ্যাহ্ন হয়ে ওঠে মুখর—ঢাকের গুরুগম্ভীর নিনাদে। পল্লব-মেদুর বটের ছায়ে জ'মে উঠেছে পূজার্থীদের ভিড়। বাঙালীর দেবদেবীপূজার অতি প্রাচীন পূজা ষষ্ঠীপূজা। সেই আনন্দেই মেতেছে আজ পল্লীবাসী। কলরবের আঘাতে কথায় পড়ে বাধা, কোলাহলমুখর জনতাকে লক্ষ্য ক'রে ব'লে ওঠেন ভক্ত কেদার-দাদা, "আঃ, থাম্-না রে বাপু।" কণ্ঠস্বরে গভীর বিরক্তি। স্থির নয়নে তাকান মা সন্তানের দিকে। এ কী ভুল হয়ে গেল কেদার-দাদার! তিনি বুঝলেন না, যাঁর সঙ্গে তিনি কথায় মগ্ন, এ পূজাও যে তাঁরি পূজা। তাই এ বিরক্তি তাঁর একান্ত অনুচিত ভুল। বলেন জননী—"ওকি কেদার, সবই যে আমি। তুমি বিরক্ত হ'চ্ছ কেন?" ভুলের জাল যায় কেটে, কেদার-দাদা সন্ত্রস্ত হয়ে জানান শ্রদ্ধানত প্রণাম।

হে জননি! চণ্ডীমুখে তো বারবারই বলতে হয়েছে সে-কথা: "একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা"। হে সর্ব্বস্বরূপিণী, তোমায় প্রণাম! মনে পড়ে শ্রীঠাকুরের বাণী: "যা-কিছু সৃষ্ট পদার্থ দেখছি, সব এর ভেতর দিয়ে। ব্রহ্ম শক্তি যে অভেদ।" চির-অভেদ-তত্ত্ব শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা-তত্ত্ব। তাই তো বলেছেন স্বামী প্রেমানন্দ—ঠাকুরের দরদী ছেলে, "ঠাকুর ও মাকে যে ভেদ ভাববে, তার কিছু হবে না—কিছু হবে না।" কোন ভক্তের মনে এসেছে ভেদভাব—আগে মা, তারপর ঠাকুর। সে মনে-মনে মাকেই দিয়েছে প্রাধান্য, কিন্তু মাতৃসন্নিধানে আসতে কেন পদে পদে জাগে বাধা? অবশেষে বহুকষ্টে মায়ের চরণে উপস্থিত হতেই, শুনি তার প্রতি জননীর মৃদু তিরস্কার: "আমি তো বলেছি, যা-কিছু সবই ঠাকুরের। ভুল করো ব'লেই তো বাধা পাও। ঠিক জানবে, মনের সঙ্গে সবই ঠাকুর গ্রহণ করেন।" "ঠাকুর তো করেন, কিন্তু—"। 'কিন্তু'র মোহটুকু তার আর কাটে না। জননী আবার দৃঢ়স্বরে ভেঙে দেন তার সব ভেদাভেদ: "আবার ভেদভাব কেন? দাহিকা কি ভাবতে পারে অগ্নি ছাড়া আপন অস্তিত্ব?" ঠাকুরের মাঝেই মা—মায়ের মাঝেই

ঠাকুর। তাই বলেছেন কোন কোন ভক্তকে : "যে ঠাকুর, সেই মা জেনে, জপধ্যান করবে।"

কিন্তু অবিশ্বাসের ঘন আঁধার—আকাশের সুনীল ছবিকে নিত্য রেখেছে ঢেকে। কালো পাথরের মতো অহংকারের গুঁড়ি রুদ্ধ ক'রে রেখেছে দেউল-দ্বারের পথ। তাই যুগের সারথি কম্বুকণ্ঠে শোনালেন মুক্তির বাণী ; ব'লে দিলেন—আজকের দীন জগৎকে বাঁচতে হলে, যে পথ তাকে বেছে নিতে হবে, সে পথ বিশ্বাস আর ব্যাকুলতার পথ। বললেন, "চাই বিশ্বাস—বালকের মতো বিশ্বাস। অবোধ শিশুর মাকে চাওয়ার অবুঝ কান্না।"

সেদিন মাতৃচরণে লুটিয়ে পড়েছে এক বালক-ভক্ত। দুঃখী আর্ত্ত ছেলে—শৈশবের মুখেই সে চিরতৃষিত, স্নেহের অমৃতপাত্রটি তার গেছে হারিয়ে—সে যে মাতৃহারা। আজ কিন্তু সে ঝাঁপ দিয়েছে অতল-ছোঁওয়া এক সুধার সায়রে। আবেশে অঙ্গ আর মনের প্রতিটি কোনা কানায় কানায় উঠেছে ভ'রে। শুধু তাই নয়, মনের অপূর্ব্ব অনুভূতির সঙ্গে, অর্দ্ধশায়িতা জননীর স্থানে হ'ল তার অপরূপ দিব্যদর্শন—প্রথমে রাসরস-মথিত দিব্য যুগলরূপের বিকাশ, পরক্ষণেই আলোর সায়রে যেন মিলিয়ে গেল অলকার সে মোহন-মাধুরী ; তার স্থানে ফুটে উঠলো নীলাদ্রি-কান্তি শ্যামামেয়ের অরূপ-সেঁচা রূপ, আর হেমগলিতকান্তি গদাধরসুন্দরের ভাব-বিলসিত তনুখানি। কিন্তু কালীরূপ-দর্শনে ভয়ে আকুল হয়ে ওঠে আজন্ম বৈষ্ণবধর্ম্মে পালিত বৈষ্ণব-বংশসম্ভূত বালক। ছেলের ভয় ভাঙাতে, অভয় হাতের কমল-ছোঁয়ায় মা দিলেন অভী-মন্ত্র ; চকিতে ঘটলো পটপরিবর্ত্তন—ভক্তের ভাববিহ্বল দৃষ্টির সামনে জননী প্রকাশিত হলেন তার ইষ্টদেবী শ্রীরাধিকারূপে। শিহরিত স্বর্ণচাঁপার মতো সে-অঙ্গ-লাবণ্য কৃষ্ণপ্রেমে ঢলঢল। বর্ণায়িত রূপশ্রীতে এক অবর্ণনীয় আনন্দ-স্পন্দন। অতৃপ্ত কর্ণে বালক শোনে : "তুমি বৈষ্ণববংশে জন্মেছ, সেই সুকৃতির ফলে এই দর্শন পেলে।" মনে পড়ে, পঞ্চবটের শ্যামরায়ের আকুল-করা কণ্ঠ-মুরলী : "রাধার দেখা কি পায়

সকলে, রাধার প্রেম কি পায় সকলে গো—সে যে সুদুর্লভ ধন!" আর সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে মা'র শ্রীমুখের স্বরূপ-প্রকাশঃ "আমিই রাধা"।

* * *

হরিময় এক সন্ধ্যা—ফাল্গুনের দুয়ারে একমুঠো বকুল ব'য়ে এনেছে হারানো রাতের সুরভি। তারি আবেশে বাতাস মন্থর। ভক্তগৃহে বসেছে কীর্ত্তনের আসর। আসর জমিয়ে বসেছেন পুরুষ-ভক্তেরা, আর চিকের আড়ালে লাজগুণ্ঠনবতী জননী বসেছেন স্ত্রী-ভক্তদের সাথে নিয়ে। কীর্ত্তনীয়া যতীন্দ্র মিত্র-তাঁর অপূর্ব্ব সুললিত কণ্ঠে ধরেছেন সুর। আজকের পালা 'মাথুর'। অর্থের বিনিময়ে লীলাকীর্ত্তন আর পরমার্থের আশায় কীর্ত্তন-কেলি, এ দুয়ের মাঝে আছে এক গভীর ব্যবধান। ভক্ত যতীন্দ্র মিত্র এই দ্বিতীয় শ্রেণীর। উচ্চ মৃদঙ্গ-করতালের ঝংকারের সাথে গৌরচন্দ্রিকার শেষে সুরু হ'ল মাথুর-লীলা—কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদিনী রাধার ভুবন-গালানো সেই বিরহগাথা। গান তো নয়, যেন ধূপের আত্মমথিত দহন-সৌরভ। বৈষ্ণব-পদকর্ত্তার হৃদয়-নিঙড়ানো গোপীশ্রেষ্ঠার সে বিলাপধ্বনি—গায়কের ভাবরসে সিঞ্চিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে শ্রোতাদের মর্ম্মে মর্ম্মে, আর বুঝি ঘা দেয় রুদ্ধ গোপন একটি স্মৃতির কুঞ্জদ্বারে—যেথায় অচন্দ্রিক রাত্রির একটি ব্যর্থতায় ধুলায় ঝ'রে পড়ে স্বল্পায়ু চামেলী। অর্দ্ধবাহ্য দশায় উপবিষ্টা মা—হারিয়ে গেছে মন সেই রথচক্রদলিত মথুরার পথে। আর তেমনি ক'রে বুঝি লুটিয়ে পড়েছে মূর্চ্ছিত তনু ছিন্নলতার মতো। ঘূর্ণিত ধূলিরাশির মাঝে ধূসর হয়ে গেছে কনক-অঙ্গ। সহসা একটা বেদনদিগ্ধ সুর-ছন্দে থেমে যায় গান। একটু আকস্মিক ভাবেই কীর্ত্তনীয়া শেষ করেন বিরহ-মাথুর। তাঁকে নাকি যেতে হবে স্থানান্তরে, সে লগ্ন এসেছে ঘনিয়ে; তাই জোর ক'রেই শেষ করতে হয় গানের পালা। কিন্তু বিরহান্তে লীলা-গাথা শেষ হলে যে, হবে রসাভাস। ভিতর থেকে আসে মাতৃ-আদেশ—গোলাপ-মা'র কণ্ঠেঃ "মা বলেছেন, মিলনে শেষ

করতে।” তাই হ’ল। মাতৃ-আদেশ পালন ক’রলেন কীর্ত্তনীয়া; যথারীতি মিলন-গীতিতেই সমাপ্ত হ’ল হরিবাসরের মধুর সম্মিলনী। তারপর বিদায়-মুখে ভক্ত কীর্ত্তনীয়া জানালেন প্রণাম মাতৃচরণে। কিন্তু কই, ফুটে ওঠেনা তো আশীর্ব্বাণী কল্যাণীর কণ্ঠে? কী হ’ল! নতশিরে বিদায় নিলেন কীর্ত্তনীয়া। কেউ বুঝলোনা এর কারণ কী—কেন মা স্তম্ভিত; বোঝেন নিত্যসঙ্গিনী গোলাপ-মা—শ্রীরাধার সখী ছাড়া, রাধার ভাব আর কে বুঝবে? ধীরে ধীরে আবেশ-বিভোর তনুখানি ধ’রে নিয়ে আসেন গাড়িতে, তারপর কোনরকমে মাতৃভবনে পৌঁছে, মাকে সযত্নে নিয়ে আসেন শ্রীঠাকুরের মন্দিরে। সেখানেও সেই পাষাণপ্রতিমা পলকহারা চোখে চেয়ে আছেন দেবদয়িতের প্রতিচ্ছবির পানে। কেটে চলে ক্ষণ—কত পুষ্প-বিভল লগ্ন; নিত্য-বৃন্দাবনে এখনও বুঝি নিত্য-মিলনের পালা হয়নি শেষ। তাই ধরার ধুলায় মন নামে না। কী হবে?—বিমূঢ় ভক্তদল ভাবে উপায়হীন হয়ে। সহসা মনে পড়ে ভক্ত সন্তানের—আছে, উপায় আছে—“মা যতই কাজে থাকুক-না কেন, ছেলের কান্নায় ছেলের ডাকে, তখনই ছুটে আসে”—এ যে মায়েরই কথা। আর কি, এই তো পথ। ভক্ত ডাকে—“মা! মা! মা গো!” কানের ভিতর দিয়ে সে-আহ্বান পশে যেন মরম-কোণে। যুগের প্রয়োজনে যে-ডাকে সাড়া দিয়ে ছুটে এসেছেন দূর অলকার অলখ-মেয়ে, সে ডাক কি ভুলতে পারেন এত সহজে? নিথরিত অঙ্গে জাগে শিহরন—নির্ব্বাণীর কণ্ঠে জাগে করুণামন্থ স্বর ··· কোন্ অতীতের মহাসায়রে দিয়েছিলেন ডুব, যেন আবার এলেন ফিরে; অস্ফুটে বলেন, “কেন, বাবা?” ছেলের সহজ আর সবচেয়ে সত্য-চাওয়া: “মা গো! খিদে পেয়েছে, ঠাকুরকে ভোগ দিন।” এতক্ষণে বুঝি মনে পড়ে—এবার যে বিশ্বের ছেলের ক্ষুধা মেটাতেই আসা; চকিতে হয় ভাব-সংবরণ। ধীর পদক্ষেপে উঠে গিয়ে মা যথারীতি শ্রীঠাকুরের ভোগ দিয়ে, খেতে দিলেন ক্ষুধায় কাতর ভক্ত ছেলেদের। কে বলবে, এতক্ষণ ডুব দিয়েছিলেন কোন্ অতলে!

সে অতল হতে একটি 'মা' ডাকই তাঁকে আনলো ফিরিয়ে। বলেন স্বামী সারদানন্দ, উৎসাহে আর আনন্দে, স্বভাব-সিদ্ধ স্বল্প ভাষায়ঃ "ঠিক করেছিস্। আমাদের জানা ছিল না।"

এমনি ক'রে ভুলের আড়াল নিজের হাতে সরিয়ে দিয়ে, জননী দেখান পথ। ছেলে যে অন্ধ, সে তো জানেনা কোথায় তার জীবন-মরণের দিশা।

দীক্ষালগ্নে ভক্তের মনে জেগেছে আলোছায়ার দোলা, সন্দেহে আর পুলকেঃ কোন্ দেবতা এসে বসবেন তার জীবন-দেউলে ইষ্টরূপে? জ্ঞানময়ী দেবেন কী নির্দ্দেশ? সহসা অঙ্গে লাগে তড়িৎ-শিহর জননীর স্পর্শে; মা বলেন, "এই ছাখ্।" দেববাণীর সঙ্গে সঙ্গে বহুদিনের আঁধার ঘরে যেন জ্বলে ওঠে হাজার দেয়ালী, চোখের সামনে তিমিরান্তক আনন্দে বিকশিত হয়ে ওঠে ইষ্টদেবতার জ্যোতিঃঘন রূপ। স্মিতহাস্যে শুধান মা—"এইতো তোমার ইষ্ট—কেমন? এঁকেই তো বরাবর ধ্যান ক'রে এসেছ?" ভাবের নেশায় বিভোর তখন ভক্ত—উত্তর দেবে কে? স্থাণুর মতন হয়ে গেছে। প্রহর গেছে কেটে, হুঁশ নাই। অবসন্ন বেলা কেটেছে আচ্ছন্নের ঘোরে। তারপর দিবসতীর্ণ অপরাহ্ণে যখন মঠের প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়িয়েছে, তখন তার পানে চেয়ে চম্‌কে ওঠেন স্বামী প্রেমানন্দ, এক মুহূর্ত্ত থমকে থেকে আনন্দ-উদ্বেল কণ্ঠে চীৎকার ক'রে ওঠেন—"তারকদা! তারকদা! দেখেছ, কী ক'রে ছেলেটাকে খেয়ে দিয়েছে, মা?" তারপর মাতৃপ্রেমে আকুল কণ্ঠে যুক্ত করে জানান নতি, সেই পরমাবিদ্যা মহাপ্রকৃতিকেঃ "মা—মা—মা!" শুধু কি চোখের দেখাই? স্বামী বিজ্ঞানানন্দ ব'সে আছেন 'উদ্বোধন'-এর নিচের তলায়। তখনও জননীর দর্শন-ধন্য হয়নি দুই নয়ন; আহ্বানের প্রতীক্ষায় আকুল হয়ে আছেন ব'সে। সহসা ফুটে উঠলো হৃদয়কমল; হৃদয়ের শ্বেতশতদল না ফুটলে, সারদার কমল-চরণ জাগবে কোথায়? আঁখি তো শুধু প্রহরী মাত্র। তাই চোখের সামনে এসে দাঁড়াবার আগে, জাগলো মায়ের কমল-আসন।

মায়ের কত কৃপা! তবু ছেলের মন ভরে না, সে ভাবে—কেন সে পাবেনা আধ্যাত্মিক রাজ্যের সব ঐশ্বর্য্য। সে যে রাজ-রাজেশ্বরীর ছেলে, মা'র ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারী। বোঝে না—সন্তান হলেও, যোগ্যতার প্রশ্ন চিরদিনই থাকবে; তাই অবুঝের মতো করে অভিমান, শত আবদারে বিব্রত ক'রে তোলে মাকে। কিন্তু তাদের জন্যেও জননীর সান্ত্বনার বাণী—অভয়বাণীর ছিলনা অন্ত। অশান্ত ছেলেকে ক্ষান্ত-করা সে-বাণী যেন সারা যুগের বুকে শান্তির ছায়া-মেলা পঞ্চবটী।

তাই দেখি, মানসিক অশান্তির তাড়নায় যে আত্মহত্যার সঙ্কল্পে হয়ে উঠেছে দৃঢ়সঙ্কল্প, সেও মাতৃচরণে আশ্রয় পেয়ে অশান্তির আঁধারে দেখেছে শান্তির কল্যাণের দীপশিখা—লোক-কল্যাণের ব্রতে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে।

অনুতপ্ত ছেলে কাঁদে: "মা গো! কিছু তো ক'রতে পারি না!" প্রকৃতি বুঝে বলেন জননী, "ঠাকুর যখন আশ্রয় দিয়েছেন তখন ভাবনা কি?" বলেছেন, "ত্যাখো, মুনিঋষিরা জন্ম-জন্ম তপস্যা ক'রে যা পায় নাই, তোমরা এবার অনায়াসে তা পাবে।" এ যুগ যে কৃপার যুগ। তারপর বললেন—"আমাদের যা-কিছু, তোমরাই তো তার মালিক।"

অশান্তির জ্বালা নিয়ে এসেছে কোন ছেলে, কাতর হয়ে জানাচ্ছে ব্যথা: "মা, এত সাধুসঙ্গ ক'রছি, আপনার কাছে আসছি. কিন্তু কিছুই উপলব্ধি ক'রতে পারছিনা কেন?" শান্তির তীর্থঘট যেন ভরাই আছে বিষাদ-খিন্ন হৃদয়ের জন্য। বলেন মা, "মনে করো, তুমি খাটের উপর আমার এই ঘরে ঘুমিয়ে আছ; তোমায় যদি ঘুমন্ত অবস্থায় খাটশুদ্ধ রাতারাতি সরিয়ে দেওয়া যায়, তোমার ঘুম ভাঙতেই কী মনে হবে? মনে হবে, যেখানে ছিলুম সেখানেই আছি। তারপর যখন ঘুম ভেঙে যাবে তখন দেখবে, কোথায় ছিলুম আর কোথায় এসেছি!" বুঝি বলেন জননী—পাবার যা, তা তো পেয়েছিস্, শুধু পেয়েছিস্ আঁধার রাতের ঘুমের মাঝে। সে ঘুম

ভাঙলে, বুঝবি। আপনি চোখে লাগবে প্রভাত-আলোর পরশ, সেই আলোয় দেখবি, কী অমূল্য ধন তোরা পেয়েছিস্। এখন তোরা আধো-ঘুমে থাক্ মায়েব কোলে শুয়ে। তাই বুঝি বলছেন, "আমার যা ক'রে দেবার, এক সময়ে ক'রে দিয়েছি; যদি সত্ত শান্তি চাও, তবে সাধন-ভজন করো। তা না হলে, দেহান্তে হবে।"

এই একটি আশ্বাস বারবার দিয়েছেন: "এখন কামনা-বাসনা থাকলেও, শেষে তা থাকবে না। শেষে ঠাকুরকে আসতেই হবে।"

ধুলা-কাদা অঙ্গে মেখে, মলিন মুখে এসে দাঁড়িয়েছে কত তাপিত পতিত সন্তান। নিঃশেষে যারা খুইয়েছে তাদের অন্তরের সমস্ত সম্পদ, সর্ব্বহারা ভিক্ষুকের মতো অনুতাপের শূন্য ভিক্ষাপাত্রখানি হাতে নিয়ে তারা এসে দাঁড়িয়েছে নত শিরে—শুধু কৃপা, শুধু করুণার দুটি ফোঁটা অমৃত-সিঞ্চন, তাতেই ভ'রে যাবে এই সর্ব্বগ্রাসী রিক্ততা—তারাও যায়নি ফিরে, হতাশা বুকে নিয়ে পেয়েছে অমূল্য সম্পদ, পেয়েছে আশ্বাস: "আমার ছেলেকে, ব্রহ্মা-বিষ্ণু এলেও, কিছু ক'রতে পারবে না।" পতিতা মেয়েকে টেনে নিয়েছেন আপন বক্ষে: "এসো মা, ঘরে এসো! পাপ কী তা বুঝতে পেরেছো, অনুতপ্ত হয়েছো; এসো, আমি তোমাকে মন্ত্র দেবো। ঠাকুরের পায়ে সব অর্পণ ক'রে দাও, ভয় কি?" এর জন্যে কত অশান্তিই না সয়েছেন, দেখেছেন সমাজের রক্তচোখ, শুনেছেন বিদ্রূপ, নিষ্ঠুর অনুশাসন—কিন্তু শান্তির সুমেরুর মতো নীরব প্রত্যাখ্যানে ফিরিয়ে দিয়েছেন পরিবাদীর সে নিষ্ঠুর আঘাত। ভ্রূক্ষেপের মধ্যে আনেন নাই কোন বাধা-বিপত্তির কথা। করুণা-ক্ষমার অটল প্রতিজ্ঞা-কঠোর সে রূপ। এর ফলে শুদ্ধসত্ত্বাভিমানী ভক্তদলে জাগে প্রচণ্ড বিক্ষোভ—তীব্র অভিমানে তারা জানায়, "মা'র কাছে অশুদ্ধ সন্তান যদি আশ্রয় পায়, তবে শুদ্ধাত্মাদের দূরে থাকাই ভালো।" রুদ্র জাহ্নবী যেন গর্জ্জে ওঠে; বলেন জননী, রূঢ় কঠোর অবহেলায়, "আমার কাছে যারা আশ্রয় নিয়েছে, তারা আসবে। একজন এলে, আর একজন যদি না আসে, আমি তার কী ক'রবো?"

আবার দেখি, দীন ভক্ত দূর থেকে জানিয়েছে অনুতাপ-জর্জ্জর হৃদয়ের একটি কুণ্ঠা-জড়িত প্রণাম—বিষয়ের কালো কলুষ যে জড়ানো তার অঙ্গে, তার মনে। কি জানি, যদি তার স্পর্শে মা'র দেব-অঙ্গের হয় কোন ক্ষতি? কী প্রয়োজন? তার চেয়ে, দূরে থেকে নাও জননী—দীনার্ত্তের আর্ত্ত-নতি। নাড়ীর টানে বেজে ওঠে দরদ—ছেলের চোখের অশ্রু যে মায়ের বুকে জমিয়ে তোলে ব্যথার পাষাণ, আবার ছেলেকে বুকে ধ'রে পাষাণ গ'লে নামে অশ্রুর অলকানন্দা। ধীরে ধীরে আপনি এগিয়ে এসে কমল-হাতখানি রাখেন মা ছেলের মাথে, আশীর্ব্বাদের পরম আকৃতিতে। আকাশগঙ্গাই তো আসে নেমে মাটীর অব্যক্ত আহ্বানে। অথচ দেবদেহ দিনে দিনে যেন হয়ে ওঠে অক্ষম। যেন কোনমতেই পারেনা সইতে শত শত মনের কলুষ স্পর্শ। এক এক বার অসহ যন্ত্রণায় শ্রীমুখের কথায় ফুটে ওঠে তার আভাস: "দয়ায় মন্ত্র দিই; ছাড়ে না, কাঁদে, দেখে দয়া হয়—কৃপায় মন্ত্র দিই, নইলে আমার কী লাভ? মন্ত্র দিলে, তার পাপ নিতে হয়। ভাবি, শরীরটা তো যাবেই, তবু এদের হোক।" তবু অশ্রুবিষণ্ণ মুখের 'মা' ডাকে সব ভুলে গেছেন, হয়ে গেছেন আপনহারা। নিজমুখে বলেছেন—"এমন-সব লোক আসে, যারা না ক'রেছে এমন কাজটি নাই। আমাকে এসে 'মা' ব'লে ডাকে, আমি ভুলে যাই—যে যার যোগ্য নয়, তার চেয়ে বেশী এখান থেকে নিয়ে যায়। কেউ পায়ে হাত দিলে, প্রাণ জুড়িয়ে যায়; আবার কেউ হাত দিলে, যেন বোলতায় কামড়ায়।"

সঙ্গে সঙ্গে কী যেন ভেবে সচকিত বেদনায় হয়ে উঠেছেন সন্ত্রস্ত; বুঝি মনে পড়ে গেছে দরদী সন্তান সারদানন্দের কথা, অতন্দ্র প্রহরায় যিনি আগলে আছেন মা'র মন্দির-দ্বার। এ কথা শুনলে হয়তো জননীর অবোধ সন্তানদের প্রতি তাঁর নিষেধাজ্ঞা হবে জারি—তাঁর দুয়ার হতে ফিরে যাবে দর্শন-ভিক্ষুর দল। তাই মুহূর্ত্তে করুণায় আর্ত্ত হয়ে ওঠা কণ্ঠে বলেন—"তা হোক,

তোমরা শরৎকে এ-কথা বোলো না—শরৎকে এ-কথা বোলো না।" যেন পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গা,—কত ভয়, কত ব্যাকুলতা, পাছে পাপী-তাপী ছেলেদের উদ্ধারের পথ যায় রুদ্ধ হয়ে।… প্রবল জ্বরে সমাচ্ছন্ন, শ্রীচরণে তীব্র ব্যথা—তারি মাঝে গভীর খেদে বলছেন, "আজ আর কেউ এলো না! ঠাকুর বলেছিলেন, কত কাজ করতে হবে—বাকী আছে। একটি দিন বৃথাই গেল!" কী আশ্চর্য, একটি প্রহরও বুঝি কাটে না, রাতের আঁধারেই তারার প্রদীপে পথ চিনে এসে দাঁড়ায় তিনটি কৃপা-ভিক্ষুক—জননীর ইচ্ছাকে পরিপূর্ণ করতে। সীমার কাছে অসীমের এখানেই বুঝি পরাজয়।

কিন্তু এত কষ্ট—তবু কেন এত ব্যাকুলতা? ছেলের কালি মুছিয়ে দিতে, সাধের কালি বরণ ক'রে নেওয়া আপন অঙ্গে? শুদ্ধাচারী ছেলেদের কাছ হতে হয় প্রবল আপত্তি—সকলেই বলে, "না, মা, এবার বন্ধ করো তোমার কৃপার দুয়ার, নইলে আমরা যে সব হারাবো, মা!" জগৎপাবনী তখনও করুণায় অটল; বলেন —"ভালো ছেলের মা তো সকলেই হতে পারে, বাবা—মন্দটিকে কে নেয়?" অশ্রুতে উদ্বেল হয়ে ওঠে সন্তান—আর বিদায়ী ভোরের মতো হেসে বলেন মা, "আমরা পাপ-তাপ না নিলে, আর নেবে কে? আমরাই পাপ-তাপ হজম করতে পারি, আমরা তো সেইজন্যেই এসেছি, বাবা! আমার ছেলে যদি ধুলো-কাদা মাখে, আমাকেই তো ধুলো ঝেড়ে কোলে নিতে হবে।" চরণ-তলে ব্যথার দাবি নিয়ে লুটিয়ে পড়ে ভক্ত—দৃঢ় প্রতিবাদে বলে, "না, না, আর কাউকে দীক্ষা নিতে দেবো না। যত লোকের পাপের ভোগ নিয়ে আপনার কষ্টভোগ!" শ্রীমুখে জাগে স্নেহের কৌতুক-হাসি, পতিতোদ্ধারিণী বলেন—"কেন গো, ঠাকুর কি এবার খালি রসগোল্লা খেতেই এসেছেন?" সারা যুগের বিষ কণ্ঠে তুলে নিয়ে নীলকণ্ঠের লীলা-সঙ্গিনীই ব'লতে পারেন এ-কথা।

মনে পড়ে, শুদ্ধতার প্রতিমূর্ত্তি স্বামী প্রেমানন্দের শ্রীমুখোক্তি: "যে বিষ নিজেরা হজম ক'রতে পারছি না, সব মা'র কাছে চালান

ক'রে দিচ্ছি। মা সকলকেই কোলে তুলে নিচ্ছেন। অনন্ত শক্তি —অপার করুণা!"

করুণায় আত্মহারা জননী—'কৃপা' এই দুটি আখরে যে লুকিয়ে আছে এক অসীম পারাবার, যুগের সঞ্জীবনী সুধার পারাবার। তার উজ্জ্বল জ্বলন্ত প্রমাণ বুঝি দিলো শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদার করুণাঘন আবির্ভাব—কৃপামথিত শ্রীরামকৃষ্ণ-যুগ।
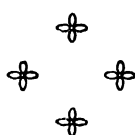
শুধু ধরার ধুলায় নেমে এসেই তো সারা হয়না কাজ—যেচে, দ্বারে দ্বারে সেধে, বিলোতে হয় করুণা। তাই যুগে যুগে দেখেছে জগৎ—শ্রীভগবানের তীর্থঙ্কর বেশ। ছুটে গেছেন গৌরচন্দ্র ভারতের এক প্রান্ত হতে আর-এক প্রান্তে, ছুটে গেছেন নিত্যানন্দ-জাহ্নবী—মৃতপ্রায় ভারতের তীর্থ যেন সোনার কাঠির ছোঁয়ায় জেগে উঠেছে নবজীবনের জয়গানে। আবার তীর্থের রাঙা ধুলে এসে দাঁড়িয়েছেন দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর। ভারত তীর্থ তো নয়, এ যেন তাঁর নিত্য-স্মৃতির তীর্থ। কত লীলা, কত খেলা—মনে পড়ে গেছে সবই। হেসে-কেঁদে একাকার ক'রেছেন। সে চোখের জলে আবার পল্লবিত, মুকুলিত হয়ে উঠেছে তীর্থের প্রাণতরু। তবু ভাববেপথু দেব-অঙ্গ। চিরদিনের মায়ের দুলাল—টলোমলো আধো-চরণ, চলতে গিয়ে যেন চলে না। তাই পশ্চিমাঞ্চলের তীর্থগুলি ছাড়া, আর বিশেষ কোথাও হয়নি যাওয়া। তাই বুঝি দক্ষিণাঞ্চলের তীর্থপথে এসে দাঁড়ালেন জননী সারদা—ফেলে-যাওয়া সব কাজই তো ক'রতে হয়েছে সম্পূর্ণ—অর্দ্ধনারীশ্বরের তিনি যে অর্দ্ধাঙ্গিনী। কিছুদিন পূর্ব্বে সারা হয়েছে বিষ্ণুপুর-দর্শন। বলেছিলেন ঠাকুর, "ওগো, বিষ্ণুপুর গুপ্ত-বৃন্দাবন। তুমি একদিন যাবে, গিয়ে দেখবে।" উত্তরে হেসে বলেন মা—

"আমি মেয়েমানুষ, কী ক'রে দেখবো ?"—সরলা পল্লীবালার এক-টুকরো লজ্জাভরা বাণী। ঠাকুর বললেন, "না গো—দেখবে, দেখবে।" সেই দেখার দিন যখন এলো ঘনিয়ে, কালের মন্থর-সঙ্কেতে, তখন দীর্ঘ বরষ গেছে কেটে। ঠাকুরের ইচ্ছা পূর্ণ তো হতেই হবে।

১৩১৭ সালের হিমলগ্ন অগ্রহায়ণে যাত্রা হ'ল সুরু। আনন্দ-বনশ্রীর দুই চোখে তখন কুহেলীর ক্লান্তি—শীতার্ত্ত জ্যোৎস্নায় পাণ্ডুর আকাশ। প্রথমে ভক্ত ছেলে বলরাম বসুর জমিদারি উড়িষ্যার কোঠারে কিছুদিন রইলেন মা। সেখানে মাঘীপঞ্চমীতে দেবীপূজার হ'ল আয়োজন জননীর শুভ অবস্থিতিতে। একটি দিনের পূজা তৃতীয় দিবস পর্য্যন্ত হ'ল অনুষ্ঠিত। ধনী ভক্তের পূজা, তার উপর সারদা-সরস্বতীর মূর্ত্ত আবির্ভাব—চিন্ময়ী আর মৃন্ময়ীর হ'ল যেন এক ঘটে আবাহন। আনন্দরসোৎসুক একটি দিব্য-প্লাবন যেন ব'য়ে গেল দিন-রাত্রির মিলন-সঙ্গমে। যাত্রা, গান, নৃত্য, বাদ্যে কোঠার-ভবন হ'ল যেন আনন্দের অমরাবতী। এইসঙ্গে অনুষ্ঠিত হ'ল আর-একটি শুভ অনুষ্ঠান, যে অনুষ্ঠানে চিহ্নিত হয়ে রইলো শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের বহুমুখী কল্যাণ-কর্ম্মের মধ্যে একটি বিশেষ কর্ম্মধারা—পদদলিত জাতিকে তুলে ধরার সুস্পষ্ট প্রচেষ্টা। কোঠারের পোস্ট-মাস্টার—নাম দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। সুউচ্চ ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ ক'রেও, সংস্কারের অপ্রতিহত গতিতে তাঁর একসময় ঘটলো মতিভ্রম। পিতৃপিতামহের পবিত্র ব্রাহ্মণধর্ম্ম পরিত্যাগ ক'রে তিনি গ্রহণ করলেন বিজাতীয় খ্রীষ্টধর্ম্ম। দেশের ছেলে দেশে থেকেও, হয়ে রইলেন যেন চির-পরবাসী—চির-বিদেশী। সে আজ অনেক-দিনের কথা। কই এতদিন তো কেউ তুলে নিতে চায়নি তাঁকে, বসাতে চায়নি তাঁর লুপ্ত গৌরবের সিংহাসনে? সকলে তো ঠেলেই রেখেছিল অস্পৃশ্যতার আবর্জ্জনার স্তূপে। একটি বারও ফিরে চায়নি সমাজ, শুধু ঘৃণাই ক'রেছে চিরকাল। তাঁরো জাগেনি ক্ষুধা, জাগেনি ধূলিসাৎ জাতিগৌরব ফিরে পাবার আকাঙ্ক্ষা। তবে কেন আজ সহসা বুক ওঠে নিঙড়ে—এ কার পুণ্য-দরশনের ফল? দেহ-মনে

যেন পরিস্ফুট মনে হয় ভ্রষ্টাচারের কশাঘাত। সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে চিহ্ন, সে চিহ্ন কি মুছবার নয়? ভাবেন, আর কি পাবোনা মঞ্জুমেখলার বন্ধনে গ্রথিত ব্রাহ্মণের রত্নহার? বহুদিনের সঞ্চিত বেদনা—ব্যাকুলতাব তপ্ত অশ্রু হয়ে ঝ'রে পড়ে অঝোর ধারে। আর বুঝি ভাবনা নাই। অশ্রুর অবিশ্রান্ত বর্ষণই তো ধুয়ে দেয় সঞ্চিত ধূলিমালিন্য। ব্যাকুলতার পথই তো পথ। ভক্তমুখে শোনেন মা সব কথা। সরস্বতীপূজার পূর্ব্বদিন বেদবিদ্যাদায়িনীর পুণ্যাদেশে শ্রীরাধাকৃষ্ণবিগ্রহের সম্মুখে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত ক'রলেন দেবেন্দ্রনাথ, আর গ্রহণ ক'রলেন বহুদিনের বঞ্চিত ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম; শুভ্র যজ্ঞোপবীতের বন্ধনে গায়ত্রীমন্ত্রে ফিরে পেলেন বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণত্বের অধিকার—নব কলেবরে পেলেন মা'র ব্যবহৃত একখানি দিব্য বস্ত্র আর তার সঙ্গে লাভ করলেন জীবনেব পরম পাথেয়—মূর্ত্ত ভারতীর শ্রীমুখোচ্চারিত পুণ্য-মন্ত্রদীক্ষা। ব্রহ্মবিজ্ঞানদায়িনীর কৃপাশুদ্ধ ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ফিরে পেলে, ব্রাহ্মণত্বের আর কী-ই বা থাকে বাকী? সে সম্মান দেখালেন জননী নিজে—শুভ্রবাসে আর যজ্ঞোপবীতে সজ্জিত হয়ে মুণ্ডিত নতমস্তক ব্রাহ্মণ যখন এসে দাঁড়ালেন জননীর চরণান্তিকে, ব্রহ্মণ্যদেব-জ্ঞানে জননী জানালেন তখন প্রতিনমস্কার। একটি আঁধার-নিবিদ মুহূর্ত্তে যেন নেমে এলো বৈদিক প্রভাত।

দক্ষিণাঞ্চলের পরমতীর্থ রামেশ্বর। "চলো মা, আমরা রামেশ্বর দর্শন ক'রে আসি"—প্রার্থনা জানায় ভক্ত ছেলে। রামেশ্বর? আহা, সে যে প্রাণের তীর্থ! জননীর শ্রীমুখে জাগে বালিকার আনন্দশ্রী; মনে পড়ে, সেইখানেই তো গিয়েছিলেন ক্ষুদিরাম—এনেছিলেন রামশীলা। আজও যে নিত্যপূজার সিংহাসনে বিরাজ-মান। মনে পড়ে সবই। বলেন জননী—"ঠিক বলেছ, বাবা—আমার শ্বশুরও গিয়েছিলেন, সেখান থেকেই রামশীলা এনেছিলেন। এখনো কামারপুকুরে নিত্য পূজা হয়—দেখেছ তো? আমি যাব।"

তাই হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে প'ড়ে যায় সাড়া—যাত্রালগ্নের অয়োজন-ব্যস্ততায়। আনন্দে কোলাহলে ভক্তদল বিভোর। মায়ের সঙ্গসুখ

আর পুণ্য-দেবভূমি-দর্শনাভিলাষে অনেকেই নেয় সঙ্গ—এমন সুলগ্ন আর কি জীবনে দু'বার আসে! তারপর সত্য-সত্যই একদিন দেখা যায়, ভক্তসঙ্গে চলেছেন মা দক্ষিণাভিমুখে। খুরদা রোড পার হয়ে নীলাক্ষি চিল্‌কার শান্ত ঢেউয়ের তীর ছুঁয়ে, দূর-নীলান্তের অগাধ উল্লাসের মধ্যে দিয়ে ছুটে চলেছে যাত্রিপূর্ণ মাদ্রাজ মেল, আর বাতায়ন-পথে দৃষ্টি মেলে দিয়েছেন আনন্দিনী মা শ্যামদুলালী—আয়ত দুটি চোখে উপছে পড়ছে শুকতারার আলো। জ্যোতিঃস্নাতা তপতীর মতো আলো-ঝলমল মুখে দেখছেন, বিদায়ী শীতের শীর্ণ মুখে এঁকে দিচ্ছে প্রকৃতি প্রথম-বসন্তের সোহাগ-চুম্বন। একদিকে দূর গিরিশৃঙ্গের শ্যামাভ কোল ঘেঁষে উড়ে চলেছে উধাও-বলাকার মুক্তা-পাঁতি—কোন্ মানস-সরের সন্ধানে, কে জানে! বিধূনিত ডানায় শিউরে উঠছে ভোরের বাতাস। আর একদল পাখা দুলিয়ে বেড়াচ্ছে কাজল-হ্রদের তীর ছুঁয়ে, ঝ'রে-পড়া মন্দারমালার মতো। কল্পনা যেন কথা ক'য়ে ওঠে—চোখে ভেসে ওঠে জননীর আনন্দ-উজ্জ্বল মূর্ত্তি। "ঐ দ্যাখো গো, ঐ দ্যাখো!"—বলতে বলতে হয়তো ডেকে দেখাচ্ছেন সঙ্গিনীদের রম্য প্রকৃতির আপন-মনে-খেলে-যাওয়া রূপের খেলা। নিজের সৃষ্টি দেখে নিজেই বিভোর। ঝিকিমিকি ভোরের আলো ডানায় মেখে নীল-বিজলীর ঝলক এঁকে দেয় নীল-কণ্ঠের দল। মোহনীয়া সে-ছবি। উল্লাসলীল বালিকার আবেগ-মুখরতা আনন্দময়ীর কণ্ঠে। আকুল দুটি কর তুলে করজোড়ে জানালেন প্রণাম শ্যামকণ্ঠের প্রতীককে। ধীরে ধীরে গাড়ি এসে বিশ্রাম নিলো গঞ্জাম জেলার বহরমপুর স্টেশনে। সেদিনকার মতো সেখানেই নেমে এলো বিশ্রান্তির ক্ষণ। কেল্‌নার কোম্পানির ম্যানেজার, তাঁরি আতিথ্য গ্রহণ করলেন জননী ভক্তসঙ্গে—স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের পূর্ব্বব্যবস্থা-মতো। দলে দলে আসে স্থানীয় অধিবাসী ফলের ভেট নিয়ে; দর্শন-তৃপ্ত হয়ে যায় ফিরে।

তারপর আবার চলার পথে দেখি জননীকে। আবার ছুটে চলেছে মাদ্রাজ মেল—তার বাতায়ন-পথে মুখখানি রেখে, মা আনন্দে

আত্মহারা ; বালিকার মতো সুখচঞ্চল দুটি আঁখির পর্ণপুটে টলমল ক'রছে প্রকৃতির উন্মুক্ত সুষমা, দেখছেন অরুণ-ছোঁয়ায় জেগে উঠেছে ওয়ালটেয়ারের ধূম্র-সুনীল পাহাড়পুরী। কুয়াসার জাল ছিঁড়ে, হেসে উঠেছে তার বুকে ধূপছায়া-মাখা ঘুমন্ত শহরখানি—মায়ের কোলে শিশুর মতো। কলকণ্ঠে বলেন জননী, "ছ্যাখো, ছ্যাখো, যেন ছবির মতন বাড়িগুলো পাহাড়ের গায়!" সারা দিনরাতের অবিশ্রান্ত গতি নিয়ে গাড়ি এসে দাঁড়ায় দাক্ষিণাত্যের সিংহদ্বার মাদ্রাজে। ছুটে আসেন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ—মাদ্রাজবাসীর গুরুমহারাজ, কিন্তু মায়ের কাছে ছেলে; বলেন, "ওরে, মা এসেছেন!" সেই দখিনাপুরের একটুখানি বালক শশী—আনন্দে আকুল, চরণ-দুটিতে মাথা রেখে লুটিয়ে পড়েন। দু'চোখের পুলক-অশ্রুতে কতদিন পরে মায়ে-ছেলেতে দেখা, তা কি বলা যায়! আদরের আপ্যায়নের যেন ত্রুটি না হয় এতটুকু, আজন্ম-সেবকের সেদিকে সুতীক্ষ্ণ নজর—নিয়ে এসেছেন মোটর। অবগুণ্ঠিতা পল্লীজননীর জীবনে এই প্রথম মোটর-যানে আরোহণ। যন্ত্রমুখর বিজ্ঞানের যুগে এ-কথা শুনতে সত্যিই লাগে নাকি বিস্ময়? গাড়ি এসে দাঁড়ায় শ্রীরামকৃষ্ণ-মঠ-ভবনে।

দাক্ষিণাত্য যেন ভারতের দক্ষিণ বাহু—কর্ম্মে, উৎসাহে, ভক্তিতে, জ্ঞানে সুউন্নত—সুপ্রসারিত, সুপুষ্ট। এই দক্ষিণের উৎসাহী তরুণ-দলেরই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে স্বামীজীর করুণা-কজ্জলিত বিশাল আঁখি ফিরেছিল পাশ্চাত্ত্যের অভিমুখে, প্রাচীর নবোষা-আলো ফেলেছিল প্রতীচীর অন্ধচোখে। যার ফলে সমস্ত জগৎ দেখলো বেদান্তের বৈজয়ন্তী। ঐক্যের মিলন-মোহনায় এসে দাঁড়ালো প্রাচ্য আর পাশ্চাত্ত্য—বিশ্বের দুটি প্রান্তকে এক ক'রে; কেন্দ্রীভূত ক'রে প্রতিষ্ঠিত হ'ল রামকৃষ্ণ-জগৎ, সাম্যের সামবাণীই যার প্রাণের মন্ত্র। জননীর আগমনে দর্শন-পিয়াসী দক্ষিণী সন্তানদল এসে ভিড় ক'রে দাঁড়ায় মঠের প্রাঙ্গণে—ভক্তি-অর্ঘ্যে পুষ্পিত হয়ে ওঠে মা'র চরণ-দুটি; কেউ বা শোনায় ওদেশের দুর্ব্বোধ্য ভাষায় ভজনাবলি বিদেশী

সুরের যন্ত্রসঙ্গীতে, হারানো কর্ণাটীর বীণা-বিপঞ্চির ঝঙ্কার—ছেলের ভাষা বোঝেন শুধু মা। তাই আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন সন্তানের কৃতিত্বে। বিশ্বজননীর দৃষ্টিতে কি থাকে দেশী-বিদেশী ছেলের পার্থক্য? সারা বিশ্ব সে-দৃষ্টিতে এক হয়ে নিত্য আছে ধরা। তা না হলে, বাংলাদেশের কোন্ নাম-না-জানা পল্লীর মেয়ে কেমন ক'রে বোঝেন ভিন্ন ভিন্ন ভাষা-ভাষীদের আকূতি—তাদের কথা? আরো বিস্ময়ের কথা যে, তারাও নাকি বুঝে নিয়েছে জননীর দেবভাষা। অন্তরের টানে ভাষা হয়ে গেছে সেখানে ভাবের প্রতীক, হয়ে গেছে সর্ব্বজনীন। মাঝে মাঝে দোভাষীর প্রয়োজন হলেও, বহু সময়েই মা-ছেলের কথায় দোভাষীর প্রয়োজন হ'ত না—অন্তরের যোগাযোগে চলতো তখন সব কথা। দাক্ষিণাত্যে পাশ্চাত্ত্যের সন্তানও এসে নিয়ে গেছে অভয়মন্ত্র। দীক্ষালগ্নে নির্জ্জন দেউলে কেবল জননী আর সন্তান—কত প্রশ্ন, কত মীমাংসা—সবই চলছে আপন-আপন ভাষায়। কিন্তু সহজ সাবলীল ছন্দের মতো সুবোধ্য হয়ে উঠেছে দুজনেরই কথা।

সেখানকার দর্শনীয়—প্রাচীন দুর্গ, মৎস্যাগার, শিবালয়, পার্থসারথির মন্দির দর্শনান্তে আবার সুরু হ'ল যাত্রা—রামেশ্বরের পথে।

সারারাত্রির ক্লান্তি নিয়ে শ্লথগতিতে গাড়ি যখন এসে দাঁড়ালো বাইগাই নদীর তীরে, ভারতের প্রাচীন শহর মাদুরায় তখন দিবসের শতপত্র তার সব-ক'টি দল মেলে দিয়েছে দূর-গগনে। সেখানে ভক্তসঙ্গে মা ধন্য করলেন মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান জনৈক মাদ্রাজী ভক্তকে, তাঁর বাসভবনে। তারপর আসে তীর্থের প্রসিদ্ধ স্থানগুলির দর্শনের পালা। ভারতীয় ভাস্বর্য্যের গৌরবপতাকা বহন ক'রছে যেন দাক্ষিণাত্যের এই প্রাচীন মন্দিরগুলি—বিশালত্বে, সূক্ষ্ম কারুকার্য্যে ভারতীয় শিল্পীর অতুলনীয় সৌন্দর্য্যবোধের দিচ্ছে কালবিজয়ী পরিচয়। দেখতে দেখতে সারদা-সরস্বতীর দুই চোখে জাগে শিল্পলক্ষ্মীর আনন্দ-তন্ময়তা। দিনমণি তখন অস্তনদীর

তীরে, দূরের মেঘশৈলে গোধূলির বিচিত্র বর্ণালী—মন্দিরের কারুকলার বক্ষে তারি প্রতিফলন। মীনাক্ষীদেবীর মন্দির, সুন্দরেশ্বর শিবের মন্দির, মর্ম্মরবক্ষ শিবগঙ্গা-সরোবর—সমস্তই দর্শন হ'ল। এমনকি শিবগঙ্গার স্বচ্ছ সরসী-নীরে স্নান ক'রে, ঐদেশীয় প্রথা অনুসারে তার শ্বেত-শান্ত নীরে দীপদানও হ'ল সারা। খসে-পড়া তারার আলোর সাথে তাল রেখে, ঢেউয়ের বুকে নেচে চলে দীপের শিখা। অপরূপ সে বর্ণ-শৈলী।

পরদিন মধ্যাহ্নে সেখান থেকে আবার রেলপথে আসা হ'ল মণ্ডপম্ স্টেশনে। স্টেশনটি হরবলা খাড়ির তটে। সেই বিস্তৃত খাড়িটি স্টীমারে পার হয়ে, পবন-বন্দরে নেমে আবার রেলপথে পাড়ি দিয়ে, সকলে পৌঁছালেন এসে বহুদিনের অভিলষিত রামেশ্বরে। তখন রাত্রি ১১টা—সাগর-সৈকতে নেমেছে বিদিশার অন্ধকার।

সেই রামেশ্বর—কামারপুকুরের রামশীলার আবির্ভাবভূমি—সেই নিত্যলীলাভূমি ··

রামেশ্বরের পাণ্ডাঠাকুর গঙ্গারাম পীতাম্বরের বন্দোবস্তমতো মিললো একখানি দ্বিতল বাড়ি। সেইটিই হ'ল কয়েকদিনের বাসভবন। আসার পথে দূর হতেই তীর্থরাজের উদ্দেশে সকলে জানান নতি। নীলাকাশশায়ী বিরাটের চোখে অতন্দ্র জাগরণ—অগণিত তারায় তারায় মৌন স্বাক্ষর রেখে কেটে যায় সেই পুণ্যরাত্রি। পরদিন ঊষাস্নান সমাপন হ'ল উদ্বেলিত নীলাম্বুবক্ষে। আবার সাগরবুকে নেচে ওঠে স্বর্ণসীতার প্রতিচ্ছায়া, অনবগুণ্ঠনের ক্ষণিক অবকাশে আকুল কেশ ঝাঁপিয়ে পড়ে তরঙ্গে। নীলায় কার নীলকমলের ঘুমভাঙা চোখ মনে পড়েছে, কে জানে! সে আঁখি ছাড়া, এ রূপের ছায়া আর কোথায় পড়বে? আকাশ হতে একরাশ আলোর ফুল ছড়িয়ে দিলেন উদয়-দেবতা—সে প্রথম-পূজার অঞ্জলি লুটিয়ে পড়লো জননী সারদেশ্বরীর চরণমূলে।

পুণ্যতীর্থের চতুর্দ্দিকে সারি সারি দেবদেবীর মন্দির—স্নানান্তে মা সমস্ত দর্শন করলেন ভক্তসঙ্গে; অবশেষে উপনীত হলেন

রামেশ্বরের দেবায়তনে। সুবিশাল প্রাচীন দেবালয়। একটি অনন্ত আত্মমর্য্যাদায় উন্নত তার শির, আকাশকে ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দৃপ্ত মহিমার আলো তার সর্ব্বাঙ্গে! মাটীকে সে যেন বলেছে, তার জন্য সে বহন ক'রে আনবে স্বর্গের আশীর্ব্বাদ; মাটী তার পানে চেয়ে কৃতজ্ঞতায় আকুল। সকলে প্রণাম জানালেন বালুকা-গঠিত অর্দ্ধহস্ত-পরিমিত রামেশ্বরকে—ক্ষুদ্র কুণ্ড তাঁর সিংহাসন, মাথায় স্বর্ণমুকুট। রঘুপতির শ্রীহস্তনির্ম্মিত মহাদেব—দর্শনমাত্র কেমন যেন একটা হারানো স্মৃতি জ্বলে ওঠে জননীর চোখে, মণিদীপের মতো অখণ্ড হয়েই জ্বলে বুঝি তার শিখা; অস্ফুটে বলেন জননী—"আহা, যেমনটি রেখে গিয়েছিলুম ঠিক তেমনটিই আছে।" চেপে ধরেন নিত্যসঙ্গিনী গোলাপ-মা—"কী বললে, মা—কী বললে?" অধরা মেয়ে আর কি দেয় ধরা? নিরুত্তর মুখে আর কোন উত্তরই যায়না পাওয়া। মনে প'ড়ে যায় সব কথাই। কেনই বা পড়বে না? রঘুপতি যেদিন স্বগঠিত শিবরূপ ক'রেছিলেন পূজা, সেদিন সদ্য-উদ্ধৃতা জানকীরূপে তিনিই তো ছিলেন পাশে।

যাই হোক, দর্শনের কোন অসুবিধাই হ'ল না—রামনাদের মহারাজার পূর্ণ আদেশে। মা'র সঙ্গে মায়ের ছেলেমেয়েরাও লাভ করলো বিগ্রহ-পূজা-স্পর্শের পূর্ণ অধিকার। মন্দিরে প্রবেশ ক'রে সকলেই পুণ্য-গঙ্গাবারিতে দেবাদিদেবকে ক'রলেন অভিষিক্ত। অথচ এ মন্দিরে, দূরদেশাগত যাত্রীদল তো দূরের কথা, পূজারী দক্ষিণী ব্রাহ্মণ ছাড়া আর্য্যাবর্ত্তবাসী ব্রাহ্মণেরও ছিলনা প্রবেশাধিকার। তিনদিন ধ'রে যথারীতি হ'ল পূজা-আরতি-দর্শন। ১০৮ সোনার বেলপাতা করিয়েছেন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ—ঠাকুরের আজন্মসেবক শশী। মা ক'রলেন সেই সোনার বিল্বপত্রে পূজা। তৃতীয় দিবসে বিশেষ পূজা, রামেশ্বরতীর্থের কথকতা-শ্রবণ, পাণ্ডা-ভোজন—কোন অনুষ্ঠানই রইলোনা বাকী; এমনকি ১৪।১৫ মাইল দূরে ধনুস্তীর্থেও মা পাঠালেন সমুদ্রদেবতার পূজা দিতে, সেখানকার প্রথামতো রূপার তীরধনুক দিয়ে। রামনাদের রাজার হুকুম: "আমার

গুরুর গুরু, পরম গুরু যাচ্ছেন—সব ব্যবস্থা ক'রে দিও।" তাই সেবা-যত্নের কোন ত্রুটিই হ'ল না। শুধু কি তাই, অন্তরের আকুল নিবেদন নিয়ে রামনাদরাজ একদিন খুলে দিলেন তাঁর মণিকোঠা; মা দেখতে এলেন ভক্তসঙ্গে ঐশ্বর্য্যের মণিমন্দিরে, যেন এসে দাঁড়ালেন ঐশ্বর্য্যলক্ষ্মী শত-বৈদূর্য্যের দীপ্তি নিয়ে! চম্‌কে উঠলো সে রত্ন-দেউল। রাশি রাশি মণি-মাণিক্যের মাঝে শুধু জ্বলছে একটি হৈমপ্রদীপ, শুধু তারি আলোয় আঁকা আরতির তৃষ্ণা। মহারাজের অভিলাষ-আবেদন নিয়ে এলো দূত: "জননীর যা ইচ্ছা তাই যদি গ্রহণ করেন এই রত্নভাণ্ডার থেকে, তাহলে মহারাজ হবেন ধন্য, হবেন কৃতকৃতার্থ।" কিন্তু হায়, কুবের যার ধনরক্ষী, বত্নাকরের যিনি আদরিণী দুহিতা, কৌস্তুভমণি-লাঞ্ছিত নারায়ণের হৃদয়ে যাঁর নিত্যবিলাস—ধরণীর ধনে তাঁর চোখে যে কোন মোহই জাগবে না, এ তো জানা-ই। আর, মা যে আমার নিজেই মনের মণি-কোঠার গোপন মানিক! তবু ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ ক'রতে একবার জিজ্ঞাসা করলেন আদরে-পালিতা মানসকন্যা রাধুকে, যদি তার কিছু থাকে প্রয়োজন। এদিকে অন্তরে চলেছে আকুল প্রার্থনা: "ঠাকুর, দেখো, রাধুর যেন বাসনা না হয়।" মহামায়াকে মায়ার ডোরে বাঁধতে যোগমায়া এই রাধু—সেও জানালো পরম বিতৃষ্ণা: "এতে আমার কী হবে? আমার লিখবার পেনসিল গেছে হারিয়ে, বাইরে গিয়ে তাই একটা কিনে দিও।" তৃপ্তির নিশ্বাসে ভ'রে ওঠে মা'র বুক।

সারা হ'ল রামেশ্বর-দর্শন। আবার জননী ফিরে এলেন মাদ্রাজের রামকৃষ্ণ-মঠে। সেখানে সম্পন্ন ক'রলেন শ্রীঠাকুরের শুভ-জন্মোৎসব। দক্ষিণের সাগর-ছোঁয়া আকাশে উড়লো পুবের বিজয়পতাকা—নারকেলের সবুজ কুঞ্জে শাখায় শাখায় রামকৃষ্ণ-নামের মধুগুঞ্জন। কৃপাপ্রার্থীরাও সেদিন ভিড় জমালো শুভলগ্নে, নিজেদের করলো কৃপাধন্য; জননীও অবিশ্রাম বিলিয়ে চললেন নাম। এমনি ক'রেই কেটে গেল ক'টি উৎসব-তন্ময় দিন। তারপর

এলো ডাক—মাকে যেতে হবে বাঙ্গালোর। নিতে এসেছেন বাঙ্গালোর-মঠের সেবক স্বামী নির্ম্মলানন্দ। সন্ন্যাসী-ভক্তের ডাক, সে ডাক তো প্রত্যাখ্যান করা চলে না। তারা যে ঠাকুরের নামে সব ছেড়ে প'ড়ে আছে। চললেন মা ভক্তসঙ্গে বাঙ্গালোর। সেখানে বাস করবেন তিন রাত্রি। বড় সুন্দর লাগলো মায়ের দয়িত-নাম-চিহ্নিত সেই মঠবাড়িখানি। মঠের জমিতে সুবাসিত চন্দনগাছ—মলয়জ সৌরভে ভরে তুলছে প্রাঙ্গণের স্নিগ্ধ সমীরণকে। নাম-না-জানা পাখির কলচ্ছন্দে নিত্য যেন বসন্তোৎসবের আয়োজন! শুধু কি তাই, মঠের পিছনেই আবার ছোট্ট একটি শৈলপীঠ, যার শিখর ছুঁয়ে গড়িয়ে পড়ছে সন্ধ্যা-উষার স্বর্ণছড়া। বালিকা শৈল-দুহিতার আনন্দে মা আত্মহারা—আনন্দের আধিক্যে প্রস্তরাসনে অতিবাহিত করেন একটি অনিন্দ্য সন্ধ্যা। ধ্যানমৌন মুহূর্ত্তে জ্যোৎস্না-মন্থর সে-গোধূলি—সে তো ভুলবার নয়। উধাও-গগনে মেঘবলাকার পাখায় ঝিলিক দিয়েছে অস্তায়ী সূর্য্যের রক্তরাগ—বিদায়-রশ্মির সে-আলো ছড়িয়ে পড়েছে বনশ্রীর বিরহ-সজল অধরে। আর সে-আভা জননীর আয়ত-মৌন নয়নে ফেলেছে ছায়ার মায়া, শুভ্র-সুন্দর ললাটে এঁকে দিয়েছে রক্তচন্দনের তিলকশ্রী। সে এক মহিমময়ী মূর্ত্তি। শত সন্ধ্যা যেন মিলিয়ে গেল একটি গোধূলিতে। সহসা জননী হলেন ধ্যানসমাহিতা। কমল-নিমীল দুটি-আঁখি, জ্যোতিঃস্নাত শ্রীমুখ,—বুঝি মূর্ত্ত হ'ল সায়াহ্ন-গায়ত্রী—সিতসৌম্যরূপ রবিমণ্ডলস্থা সরস্বতী। সে রূপ দর্শন ক'রে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন মা'র সন্তান রামকৃষ্ণানন্দ। বৈদিক ঋষির মতো তিনি সুরু করলেন মহাগায়ত্রীর স্তবগান, নতজানু হয়ে যুক্তকরে: "হে মাতঃ! তুমি সাক্ষাৎ জগদম্বা—তুমি সর্ব্বভূতে শক্তিরূপে বিরাজিতা। তুমি ভক্তজনে মুক্তিদান করো। আমাকে এবং তোমার চরণাশ্রিত অন্যান্য সন্তানকে আশীর্ব্বাদ করো, যেন আমরা সংসার-বন্ধন হতে মুক্তি পাই।" সেই অনাদি-ব্রহ্মাস্তুতিতেই যেন ভাঙলো মহামায়ার যোগনিদ্রা,—উন্মীলিত নয়নে করুণাস্নিগ্ধ

চাহনি—সন্তানের পানে ক্ষণিক চেয়ে থাকেন, তারপর ধীর ধীরে বরাভয়খানি নেমে আসে চরণ-লুণ্ঠিত ভক্তের মাথে। নেমে আসে সমাহিত সন্ধ্যা অরুন্ধতী—আলোয় জ্বলে ওঠে আরতির কর্পূর-দীপ।

এমনিভাবে দিনরাত্রির পদক্ষেপে সময় চলে কেটে। দলে দলে আসে কৃপাপ্রার্থী ভক্তদল, নিবেদনের অন্তর নিয়ে। এক এক দিন মঠের ঐ ক্ষুদ্র পাহাড়টির মতোই স্তূপীকৃত হয়ে ওঠে ভক্ত-নিবেদিত পুষ্পরাশি জননীর শ্রীচরণপ্রান্তে। এমনি ক'রেই দক্ষিণ-তীর্থের ধুলায় ধুলায় আনন্দের লগ্ন কুড়িয়ে, কাটলো কয়েকটি মাস। এবার ফেরার পালা।

প্রত্যাবর্ত্তনের মুখে ছু'-একদিন মাদ্রাজে, এবং পরে রাজ-মাহেন্দ্রীতে—সংস্কৃত-পণ্ডিত জনৈক ভক্ত জজের আতিথ্য-স্বীকার ক'রে, জননী এলেন সাগরতীর্থে শ্রীজগন্নাথক্ষেত্রে। সেখানে মাত্র তিন-চার দিন থেকেই, ফিরে এলেন জননী আপন লীলাতীর্থে। সেদিন ছিল ২৮শে চৈত্রের মঙ্গলবার। বাসন্তীসপ্তমীর সপ্তকলস আবার যেন পূর্ণ হ'ল আনন্দের তীর্থনীরে—মহানগরীর বুক-আলো-করা বেলুড়-মঠে সেদিন বাজলো নবতুর্গার বোধন-জয়ন্তী। বসন্ত-সমীরণ-উচ্ছল সুরধুনীর তীরে শতসহস্র মাতৃসন্তান প্রতীক্ষা-চঞ্চল চোখে চেয়ে আছে আগমন-পথপ্রান্তে। ধীরে ধীরে মায়ের রথখানি এসে দাঁড়ায় মঠপ্রান্তে। পর পর নয়টি তোপের গুরুগম্ভীর ধ্বনিতে ঘোষিত হ'ল জননীর শুভ স্বাগত-বার্ত্তা। সহস্র কণ্ঠে তখন জেগে উঠেছে কল্যাণীর বিজয়স্তুতি ঃ "সর্ব্বমঙ্গল-মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ-সাধিকে, শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে"। আর মা ?—নহবতের সেই গোপন কোণটির সারদেশ্বরী মা ?—সলাজ-মধুর মূর্ত্তিখানি—শ্বেতবস্ত্রাঞ্চলে আবৃত, মঙ্গলমালার মতো ঘিরে আছেন সেবিকার দল—চলেছেন সচল সর্ব্বাণী ধ্যান-উপশান্ত চরণে। আর দেহরক্ষীর মতো মায়ের তুলাল—রাখাল-মহারাজ ঘর্ম্মাক্ত-কলেবর, উদ্‌গ্রীব জনতাকে সাবধান ক'রছেন, "খবরদার, মা'র চরণ এখন কেউ স্পর্শ করতে পাবে না।"—মঠের 'রাজা'র

কড়া হুকুম—কারো ক্ষমতা নাই যে, অমান্য করে। এমন সময়ে ও কী! কার দুটি ক্ষিপ্র-চপল হাত সকলের অনবধানে করে জননীর শ্রীচরণ-স্পর্শ? চম্‌কে চেয়ে ছাখেন রাখাল-মহারাজ—আর কেউ নয়, তাঁদের সেই চিরদিনের অবুঝ খোকা—সুবোধানন্দ-মহারাজ স্বয়ং। 'ধর্' 'ধর্' ক'রে ওঠেন মঠের 'রাজা'। ধরবে কে? ততক্ষণে অমূল্যরতন চুরি ক'রে উধাও হয়েছেন খোকা-চোর। হাসির কলরোলে ভ'রে ওঠে মঠপ্রাঙ্গণ—আনন্দ-মধুর লীলায় হিল্লোলিত হয় সুরধুনী-বক্ষ। বিপুল জয়তূর্য্যে টলমল করে গগন-ভুবন।

দোতলায় একখানি কক্ষে বসলেন জননী ভক্তসঙ্গিনী-সঙ্গে, আর নিচে আঙিনায় সুরু হ'ল কালীকীর্ত্তন। সকলে আনন্দ-উন্মত্ত কণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে ক'রছেন মাতৃনাম—বুঝি প্রাণে প্রাণে হয়েছে সঞ্চারিত মাতৃশক্তি—অনুভব করেছে জগজ্জননীর মূর্ত্ত আবির্ভাব। একখানি বেঞ্চে উপবিষ্ট মঠের 'রাজা'—মায়ের ছেলে রাখাল-মহারাজ, আলবোলার নলটি মুখে দিয়ে পরমানন্দে শুনছেন মায়ের নাম। মা এসেছেন যে—স্বভাবতূষ্ণীক মঠাধ্যক্ষও আজ আপন-হারা, আনন্দ আর ধরে না! কীর্ত্তন চলেছে মহা উৎসাহে—সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী, গৃহবাসী কেউ আজ হার মানতে চায় না। বিপুল জনস্রোত এসে মিলেছে ত্যাগের গৈরিক স্রোতে। সহসা কীর্ত্তন যায় থেমে—সহস্র আঁখি অবাক-বিস্ময়ে ছাখে ব্রহ্মানন্দের পানে—তুষারমগ্ন হিমাচলের মতো দেহ হয়ে গেছে স্থির, মুদ্রিত নয়নে নিবিড় প্রশান্তি, হাত থেকে কখন খসে গেছে আলবোলার নল—মহারাজ সমাধিস্থ। মায়ের শিশু মাতৃরস পান করতে-করতে যেন হয়ে পড়েছেন বিভোর—যোগনিদ্রালীন। নিরুচ্ছ্বাস নিষ্পলক নয়নে চেয়ে ছাখে সকলে—একটি কান্তকম শিশুসুন্দর দিব্যমূর্ত্তি। মনে হয়, এই বুঝি চাইবেন ভাবসুন্দর চোখ-দুটি মেলে। কিন্তু মুহূর্ত্তের চঞ্চলতায় কেটে যায় ক্ষণ—কেটে যায় প্রহর, পার হয়ে যায় পুরো দুটি ঘণ্টা—হায়, তবু সে-সুখ-ঘোর আর ভাঙে না! ছুটে আসে সংবাদ মায়ের কাছে। ভক্তেরা আকুল উদ্বেগে

আর চুপ ক'রে থাকতে পারে না—ছেলের ঘুম-ভাঙানী গান মা ছাড়া আর কেই-বা জানে? প্রসাদ-প্রসন্নতায় শিখিয়ে দেন মা, কোন্ মন্ত্র শোনাতে হবে কর্ণমূলে, কোন্ মন্ত্রের আকর্ষণে ফিরে আসবে মন সমাধির গহিন লোক হতে। হ'লও তাই। মা'র দেওয়া মন্ত্র শ্রবণ ক'রতেই যেন ক্ষণিকের ঘুম-ঘোর হতে জেগে ওঠেন ব্রহ্মানন্দ; ব'লে ওঠেন, "হ্যাঁ, চলুক—চলুক—।" যেন কিছুই হয়নি। কে বলবে, সমাধির সপ্তসাগরে দিয়েছিলেন ডুব! ওদিকে ঠাকুরের বাল্যভোগ দিয়ে, মা পাঠিয়ে দিলেন প্রসাদ—সেই প্রসাদ নিয়েও আনন্দের হুড়াহুড়ি; কেউ প্রসাদের থালা নিয়ে সুরু করেন নৃত্য, ভক্তবীর গিরিশচন্দ্র কেড়ে নেন তাঁর হাত থেকে থালা: "ঠাকুরের প্রসাদ মা'র স্পর্শে হয়েছে মহাপ্রসাদ—আমি থাকতে এ মহাপ্রসাদ আর কাউকে বিতরণ ক'রতে দেবো না।" আবার এক হুড়োহুড়ির পালা; মাখামাখিও যে হয় না, তাও কি বলা যায়? এমনি ক'রে সারাটি দিন ধ'রে চললো ছেলের দলে আনন্দের মাতামাতি, সার্থক ক'রে জননীর বোধন-লগ্ন। অবশেষে বিদায়-নীল সন্ধ্যায় হ'ল সে-আনন্দের অবসান। শত শত ভক্তের দিনান্তের নতি নিয়ে জননী ফিরে এলেন মঠ হতে আপন শ্রীমন্দিরে। উৎসবের সমাপ্তি ঘোষিত হ'ল মুখরিত তোপধ্বনিতে, আর সুরধুনীর ওপার থেকে ভেসে এলো দক্ষিণেশ্বরের আরতির শঙ্খ। মনে পড়ে, ঠিক এমনি আর-একটি উৎসব-দিবস। সে-দিনটি ছিল শ্রীঠাকুরের সাধারণ উৎসবের পুণ্যতিথি। মঠের তোরণদ্বারে এসে দাঁড়িয়েছেন জননী; ভক্তসঙ্গে সুসজ্জিত তোরণমুখে অভ্যর্থনার বিপুল আয়োজন —ঠাকুরের রাখাল-রাজাই তার মধ্যে অগ্রণী। ভাবগম্ভীর কণ্ঠে তিনি দিলেন জয়ধ্বনি: "মহামায়ী কি জয়!" গঙ্গাবক্ষে উঠলো তার গুরুগম্ভীর প্রতিধ্বনি—সঙ্গে সঙ্গে সারিবদ্ধ সন্তান-সেনার কণ্ঠেও জাগলো সেই জয়নিনাদ, ধ্বনিত হ'ল স্বাগত-অভিনন্দন মঙ্গলশঙ্খের ধ্বনিতে। ধীরে ধীরে কল্যাণময়ীকে বরণ ক'রে আনা হ'ল মঠের অভ্যন্তরে। তারপর সে এক অপরূপ দৃশ্য। শ্রীঠাকুরকে প্রণাম

ক'রে এসে দাঁড়িয়েছেন মা—দক্ষিণামুখে বিশ্বের প্রসন্নতা দিয়ে গড়া আনন্দময়ী মূর্ত্তি, আর একদিকে শ্রীচরণতলে পুলক-রোমাঞ্চিত-কলেবর, নতজানু হয়ে উপবিষ্ট রাখাল-মহারাজ। পরিপুষ্ট দিব্যোজ্জ্বল তনুতে গৈরিকের দীপ্তি সিতশুভ্রা হিম-দুহিতার চরণান্তিকে যেন আদর্শ-মাতৃভক্ত ত্যাগব্রতী গণপতি—কম্পিত-হস্তে অঞ্জলির পর অঞ্জলি সচন্দন-পুষ্প তুলে দিচ্ছেন মা'র রাজীব-চরণে। মধ্যদিনের বেলা তখন বলাকার ডানা দিয়েছে মেলে—আকাশ আলোয় আলো। এর পরে স্নুরু হ'ল আরতি। ঘণ্টার মধুর নিনাদে, পঞ্চপ্রদীপের আলোয় জাগ্রতা পরমেশ্বরীর আরতি ক'রলেন মহারাজ নিজেই ; বিশ্বজোড়া বেলুড়-মঠের 'রাজা'র তখন সব পরিচয় গেছে হারিয়ে—মায়ের একান্ত সেবক, মায়ের সন্তান, মায়ের দাস—আর বেদমাতা ব্রহ্মাণীর মন্ত্রমূর্ত্তির মতো মায়ের ধ্যান-তন্দ্রিত রূপ। পূজা হয় শেষ ; পূজান্তে আসে ভক্তজনের অঞ্জলি দেবার পালা। সমবেত কণ্ঠের চণ্ডীস্তোত্র 'সর্ব্বমঙ্গল-মঙ্গল্যে' যেন প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরতে লাগলো মঠের রন্ধ্রে রন্ধ্রে মাঙ্গলিক শঙ্খের মতো। সে প্রগান-প্রবাহে বুঝি চমকে উঠলো সমাধির ধ্যান-তন্ময়তা। শত ভক্তের অশ্রু-অঞ্জলিতে শ্রীচরণে জমে ওঠে কুসুম-স্তবক। আধো-সমাধিলীন দেবীর পদতলে তখনও সেই একভাবেই উপবিষ্ট মহারাজ—নয়নে নেমে এসেছে মঙ্গল-জলধারা। সেদিন তাঁর সে এক অপরূপ ভাবান্তর। সেদিন যেন তাঁর সন্তান-রূপটি স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে ওঠে মূর্ত্ত হয়ে ক্ষণে ক্ষণে। পূজা ও প্রসাদ-পর্ব্বের অন্তে আসে বিশ্রান্তি-ক্ষণ ; কিন্তু মধ্যাহ্নের শয়ান-লগ্নে আবার জমে ওঠে ভিড়—জলস্রোতের মতো ছুটে আসছে জনস্রোত, বাঁধ-ভাঙা গতির আবেগে। দেখতে দেখতে দোতলার সিঁড়ির কাছে স্নুরু হ'ল বিপুল ভক্ত-জনতার ঠেলা-ঠেলি ঃ "আমরা মাকে দেখবো, একটিবার ছেড়ে দাও আমাদের ছুয়ার!" কিন্তু কী ক'রে তা সম্ভব? মা যে এখন পরিশ্রান্ত, তাঁর বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটবে যে। কিন্তু ভক্তির আতিশয্যে কেউ শোনেনা সে-কথা, সকলেই চায় সেই ক্ষুদ্র সোপান অতিক্রম ক'রে

মা'র মন্দিরে প্রবেশ ক'রতে, আর দীন প্রহরীর আকুলতায় মঠাধ্যক্ষ একা তাঁব পদগৌরব তুচ্ছ ক'বে আগলে থাকেন মা'র সোপান-পথ, দু'হাতে দেন বাধা ঃ "না, না, এখন না, এখন না—এখন কাউকেই ওপরে যেতে দেওয়া হবে না।" বিশ্বজোড়া রামকৃষ্ণ-মিশনের অধ্যক্ষ ও গুরুপদে অধিষ্ঠিত হয়েও মায়ের কাছে মায়ের দীন সেবক, দীন সন্তান ছাড়া যেন আর কোন পরিচয়ই তাঁর ছিলনা সেদিন। তাঁর সেই ঘর্ম্মাক্ত-কলেবর দ্বাররক্ষী রূপ দেখে, নবাগত ভক্তেরা পারেনা চিনতে ; তাই তারাও সমতালেই মহারাজের বাধাকে অতিক্রম ক'রতে হয়ে ওঠে সচেষ্ট, ফলে ঠেলাঠেলি ওঠে বেড়ে। সহসা এ দৃশ্য কোন-এক পরিচিত ভক্তের চোখে পড়তেই, বিস্মিত এবং ত্রস্ত হয়েই ছুটে আসেন তিনি ঃ "একি সর্ব্বনাশ, অবুঝ ভক্তদল যে এক গুরু অপরাধে অপরাধী হতে বসেছে!" তারা তো জানেনা মহারাজের পরিচয় ; বুঝিয়ে দিতে তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসেন ভক্তবর ঃ "কী ক'রছো—কী ক'রছো তোমরা ? কাকে ধাক্কা দিচ্ছো ?" চম্‌কে ওঠে সকলে। ভক্ত বলেন, "ইনিই যে মহারাজ।" মুহূর্ত্তে গোলমাল যায় থেমে, বিস্মিত লজ্জিত জনতার চোখে জাগে বিনম্র অনুতাপ। হায়, ক্ষমা চাইবার পথও যে নাই! স্থিতপ্রজ্ঞ সন্ন্যাসী তখন কাজ হাঁসিল হয়েছে বুঝে, সহজ পদক্ষেপে ফিরে গেছেন নিজের ধ্যান-মন্দিরে।·· সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে আর-একটি উৎসব-দিবসের কথা। বিদেশিনী মেয়ে নিবেদিতা, আইরিশের তুষার-কঠোর বলিষ্ঠতা নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন ভারতের সবুজ মাটীর সাড়া পেয়ে। বাংলার নারী-সমাজের অবরুদ্ধ চেতনাকে জাগাতে, গ'ড়ে তুলেছেন যে শিক্ষায়তন, অনেকখানি সার্থকতার পথে সে আজ এগিয়েছে। সেদিন বৈকালী-ফুল-ঝরা অপরাহ্ণে সেই বিদ্যায়তনেই এসেছিলেন জননী সারদেশ্বরী, অসহ সুখে উপছে পড়েছিলেন নিবেদিতা। মনে পড়ে সেই স্মৃতির আলপনা-আঁকা দিনটির কথা—আনন্দের সঞ্চারিণী দীপশিখার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছেন তিনি বাণী-ভবনের অঙ্গনে, খুশীর স্নিগ্ধ আলোটুকু ছড়িয়ে দিয়ে। মা আসবেন, তাই সকাল থেকে আয়োজনের শেষ নাই।

ছোট্ট সঙ্কীর্ণ গৃহখানি কেমন ক'রে সাজিয়ে তুলবেন সেই চিন্তায় আকুল। মায়ের মুখে ফুটিয়ে তুলতে হবে বেদ-হাসি; তাঁর মুখে শুনতে হবে প্রসন্নতায় ভরা দুটি প্রশংসাবাণী—মেয়ের বুক যে তখন গরবে উঠবে ভ'রে! কেমন ক'রে জানাবেন তাঁকে সাদর অভিনন্দন—সে বাণী কি আছে তাঁর মুখের ভাষায়? চেষ্টার ত্রুটি নাই, মেয়েদের দিচ্ছেন উৎসাহ-ভরা প্রেরণা: "মাতাদেবী আজ আমাদের স্কুলে আসবেন। তোমরা সকলে খুব আনন্দ করো।" ছোট্ট ছোট্ট কচি-মনে সে-আনন্দের ছোঁয়া লাগতে দেরি হয় না। তারাও প্রবল উৎসাহে পত্রপুষ্পে সাজিয়ে তোলে তাদের বাণী-মন্দিরটিকে। জাগ্রতা বীণাপাণির আবাহন-উৎসবে লিলিপদ্মের নিবিড় সমারোহে সুরভিত হয়ে ওঠে সারা প্রাঙ্গণ, আলপনার বকুল-ছড়া পথ চেয়ে থাকে। কোথা দিয়ে আয়োজনের কলরবে কেটে যায় মুখর সকাল আর মগ্ন মধ্যাহ্ন। একটু বেলা পড়তেই এসে দাঁড়ালো মা'র গাড়ি—গোধূলির কনক-আঁধার তখনও ঘনায়নি আকাশে। ভক্তসঙ্গে এসে দাঁড়ালেন মা, মঙ্গলকলসে সাজানো বাণী-মন্দিরের দ্বারে। আর নিবেদিতা? দেখা গেল, নিবেদনের কমলমালার মতোই তিনি লুটিয়ে দিয়েছেন তাঁর শুভ্রসুন্দর তনুখানি মা'র চরণে। ঠাকুরদালানে বসলেন মা—নিবেদিতা নিয়ে এলেন উপছে-পড়া ফুলের ডালি, ছোট্ট ছোট্ট মেয়েদের সাথে দিলেন পুষ্পাঞ্জলি ভারতীয় প্রথায়—কে বলবে আইরিশ-দুহিতা? তারপরে মহানন্দে দেন সব মেয়েদের পরিচয়—চেয়ে নেন মা'র প্রসন্ন আশীর্ব্বাদ। মেয়েদেরও উৎসাহ কি কম? তারাও মাকে শোনায় গান, কবিতা—আজ হৃদয়-ঢালা কৃতিত্বে তারা মুগ্ধ ক'রবে মূর্ত্ত সরস্বতীকে। তাঁর প্রসন্নতাই যে ছাত্র-জীবনের কাম্য। আর, সিস্টার—তিনি যেন পেয়েছেন আপন মাকে; ঘুরে ঘুরে মাকে নিয়ে তিনি দেখান তাঁর গ'ড়ে-তোলা মাতৃভবন—মায়ের পায়ের পদ্মরেখা বুঝি এঁকে নিতে চান তাঁর ভাগ্যলিপিতে। মেয়েদের হাতের শিল্পকলা, মেয়েদের শিক্ষা, সর্ব্বোপরি মেয়েদের গঠনমুখী জীবন—দেখে, মায়ের আনন্দ যেন উছলে পড়ে। শ্রীমুখে ছড়িয়ে

পড়েছে হাসির জ্যোৎস্না; বলছেন, "বেশ তো শিখেছে মেয়েরা!" শুনছেন নিবেদিতা, দেখছেন নয়ন মেলে—আর হৃদয়খানি কানায় কানায় উঠছে ভ'রে। তারপর নিবেদিতার নিজস্ব ঘরখানিতে একটু বিশ্রাম ক'রে, মা সেদিনকার মতো নিলেন বিদায় শ্রীচরণধুলায় ধন্য ক'রে সদ্য-গঠিত শিশু-প্রতিষ্ঠানটিকে। ভারতের নারীশিক্ষার জন্য মায়ের কল্যাণ-ইচ্ছা, আর নিবেদিতার শত-আশা-পোষিত অক্লান্ত পরিশ্রম হয়নি ব্যর্থ—আজ মহানগরীর বুকে গৌরবোজ্জ্বল চরণচিহ্ন মাথায় তুলে দাঁড়িয়েছে 'নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়'।

১৩১৭ সালের চৈত্রে জননীর প্রত্যাবর্ত্তনের আনন্দমেলা-শেষে এলো নববর্ষ—১৩১৮ সালের নববর্ষ। নূতন অধ্যায় যে কী নিয়ে আসে তার অলখ-অঞ্চলে ঢেকে, জানেন শুধু মহাকাল—মানুষের কাছে তা চির-অজ্ঞাত, অনাগত ভবিষ্যতের পানে চেয়ে-থাকা চির-ঔৎসুক্যই সম্বল; কখনো হয়তো সে পেলো আলো-ঝলমল নীল নভতল, আর কখনো হয়তো পেলো বজ্রগর্ভ ঘনঘটা। ১৩১৮ সালের ৪ঠা ভাদ্রের প্রথম শরৎ, ধরণীর ভাগ্যলিপিতে এঁকে দিলো দুঃখের মসীলেখা—সেদিন রামকৃষ্ণ-জগতের একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের এলো অস্তময় লগ্ন—ধুলার ধরণী থেকে চিরবিদায় নিলেন আজন্ম-সেবক স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, এই কয়েকটি মাস আগেও যিনি জননীর দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণে ছিলেন প্রধান পূজারী। অকুণ্ঠ সেবায় সে কী অসীম উৎসাহ! মা আসবেন, দয়া ক'রে চরণধূলি দেবেন—তাঁর বুকের রক্ত দিয়ে গড়া এই মাদ্রাজ মঠে, সেই আনন্দেই বিভোর। কোথাও রাখেননি এতটুকু কৃপণতা, এতটুকু ক্ষুণ্ণতা। সেখানকার সমস্ত সুবন্দোবস্ত হয়েছে তাঁর একাগ্র সাধনায়—সে কি ভুলবার? মায়ের সেই আদরের শশী বিদায় নিলেন ১৩১৮ সালের ভাদ্রের চতুর্থ দিনে। সে এক বিষাদ-বিধুর দিন—শেষ দর্শনের আশায় আকুল ছেলের নয়ন-সম্মুখে জননী এসে দাঁড়িয়েছেন, স্থূলে নয়—সূক্ষ্ম জ্যোতির্ম্ময়ী রূপে; সূক্ষ্মলোকের পথযাত্রীর দিশারী হতে হলে, মহামায়াকেও সূক্ষ্মরূপেই নিয়ে যেতে হবে রামকৃষ্ণলোকের দ্বারে,—

হঠাৎ নির্ব্বাণ-উন্মুখ দীপশিখার মতো আনন্দ-উদ্ভাসিত মুখে ব'লে ওঠেন শশীমহারাজ: "মা এসেছেন"। তারপর চির-আশ্রয় নিলেন মায়ের কোলে। একদিকে সূক্ষ্মরূপে খেলার শেষে ছেলেকে নিলেন মা বুকে তুলে, আর একদিকে জগৎ দেখলো পুত্রবিয়োগবিধুরা দেহধারিণী জননীর মূর্ত্তরূপ—যা নিত্যদিনের বাস্তব দিয়ে গড়া। জয়রামবাটীর সেই পর্ণকুটীরে কাঁদছেন মা আকুল হয়ে; বলছেন, "শশীটি আমার চলে গেছে, আমার কোমর ভেঙে গেছে ···"

কালচক্র যায় ঘুরে—চিরন্তন দিনরাত্রির গতিতে। তার আবর্ত্তন-বিলাসে জেগে ওঠে সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, বিরহ-মিলন। ঠিক একটি বছর পরে আকাশগঙ্গায় আলোর জোয়ার নিয়ে আবার আসে শরৎ – বাতাসে ভাসে বলাকার উর্ম্মিমালা, শিউলির সমারোহে মাটী হয়ে ওঠে সুরভি-মেদুর। ১৩১৯-এর মঙ্গল-শারদীয়া—বেলুড়ের মঠ-প্রাঙ্গণেও ছড়িয়ে পড়েছে কল্যাণ-দ্যুতি, সেখানেও যে আসবেন মহামায়া। ইতস্ততঃ আনন্দচঞ্চল পদক্ষেপে ঘুরছেন সেবকের দল—পূজার পূর্ণাঙ্গ অনুষ্ঠানের আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে। দেবীর বোধনক্ষণ সমাগত—এসেছে সবাই আনন্দময়ীকে বরণ ক'রতে। কিন্তু কই—যাঁর পূজা তিনি কই? মন্দির আলো ক'রে দাঁড়িয়ে আছেন দশভুজা—কিন্তু রামকৃষ্ণ-মঠের প্রাণ-প্রতিমা যে দ্বিভুজা সারদা, তিনি যে এখনও এলেন না! কেন, এত দেরি কেন? মঠবাসী হয়ে ওঠেন চঞ্চল। "মা আসেননি, মা আসেননি"—একটা অভাবের গুঞ্জন ফিরতে লাগলো মঠের দিকে দিকে। বাহিরের লোকে কী ভাবলো, কে জানে! তারা দেখছে, ঐ তো মা মন্দিরে। ছুটে আসেন চঞ্চল চরণে স্বামী প্রেমানন্দ। মা আসেননি কেন? মন্দির প্রতোলিতলে দাঁড়িয়ে ছাখেন, কী ত্রুটী রয়ে গেছে তাঁদের আয়োজনে? ফুলে, আলপনায়, ধূপে দীপে, নৈবেদ্যে—আয়োজনের কোন ত্রুটীই তো পড়ছেনা চোখে। তবে? সহসা কী যেন মনে হয়, ছুটে যান মঠের পুরদ্বারে—দেখেন শ্যামশিলীন্ধ্রে বন্দনমালায় সাজেনি সে-তোরণপথ; মঙ্গলঘটও হয়নি ভরা। ম্লান হেসে বলেন

প্রেমানন্দ, "এখনো কলাগাছ, মঙ্গলঘট রাখা হয়নি, মা আসবেন কি ?" পাতা হ'ল মঙ্গলঘট, স্থাপিত হ'ল কদলীবৃক্ষ, ওদিকে বেজে উঠলো বোধন-শেষের শঙ্খ—ধীরে ধীরে মঠের দ্বারে এসে দাঁড়ালো মা'র গাড়ি। গোলাপ-মা'র হাতে হাতটি দিয়ে নামলেন মহামায়া, আর রঙ্গ ক'রে বললেন, "সব ফিট্‌ফাট্‌, আমরা যেন সেজেগুজে মা-দুর্গাঠাকরুন এলুম।" বোধন-ঘট প্রতিষ্ঠিত না হলে, দেবীর পূর্ণ আবির্ভাব হবে কেমন ক'রে ? তাই বোধন-শেষেই হ'ল মা'র পুণ্য-আবির্ভাব, এ মঠে যে তাঁরই পূজা। মনে পড়ে স্বামী প্রেমানন্দের কথা। এই দুর্গপূজাতেই অষ্টমীর সন্ধিপূজার শেষে সেবকের হাতে দিয়েছেন একটি গিনিঃ "যা, এই গিনিটা মাকে দিয়ে, প্রণাম ক'রে আয়।" ভাবেন ব্রহ্মচারী, বুঝি দুর্গাপ্রতিমার কথাই বলেছেন স্বামীজী ; ভুল ভাঙে কিন্তু পরের কথায়। স্বামী প্রেমানন্দ ব'লে উঠলেন, "ও-বাগানে মা আছেন, তাঁর পায়ে গিনিটা দিয়ে প্রণাম ক'রে আয়। এখানে তো তাঁরই পূজা হ'ল।" এ শুধু মুখের কথা নয়, এ সত্যিকার অন্তরের কথা। তাই দেখি, কোনবৎসর দুর্গাপূজায় মায়ের ছেলে রাখাল-মহারাজ মহাষ্টমীর লগ্নে ১০৮ কমল-দলের অর্ঘ্য নিবেদন ক'রছেন মাতৃচরণে। অষ্টমীপূজার বিশেষত্ব যে এই শতাধিক পদ্মের অর্ঘ্য। আবার কোনবার হয়তো বিস্মিত-বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে ছাখেন ভক্তদল—মহাষষ্ঠীর পূজাতিথিতে এসে দাঁড়িয়েছে জননীর রথ ; অশ্বের বন্ধা খুলে দিয়ে, সে-রথ টেনে নিয়ে চলেছেন মা'র পাগল ছেলের দল। সে এক অপরূপ দৃশ্য ! শরতের স্বর্ণ-আলো-উদ্ভাসিত গঙ্গার শ্যামায়িত তটে চলেছে যেন এক গৈরিক-বাহিনীর বিজয়-অভিযান, মহামায়ীর জয়রথের রজ্জু ধ'রে ; আনন্দের নেশায় উন্মত্ত—ট'লে ট'লে পড়ছেন স্বামী প্রেমানন্দ, চোখে মুখে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে গৌরবের আনন্দদ্যুতি। কেটে যায় তিনটি দিন নির্ব্বিঘ্নে, ত্রুটীহীন সেবাপূজায়। মহানবমীর সমাপ্তি-পূজায় মা'র প্রসন্নতার আশিস্‌ বহন ক'রে নিয়ে আসেন গোলাপ-মাঃ "শরৎ, মাঠাকরুন তোমাদের সেবায় খুব খুশী হয়ে, তোমাদের তাঁর

আশীর্ব্বাদ জানাচ্ছেন।” চিরকালের গম্ভীরাত্মা শরৎ-মহারাজ, চিরকালের স্বল্পভাষী—হৃদয়ের উচ্ছল আনন্দ তাঁর কণ্ঠে হয়ে ওঠে সংহত-গভীর; বলেন, “বটে?” তারপর উজ্জ্বল চোখে ফিরে চান ভাই বাবুরামের দিকে: “বাবুরাম, শুনলে?” বাবুরামের চোখেও তখন বাঁধভাঙা আনন্দ; মৌন হাসিতে তারি সম্মতি। শেষে সুখের সাগরে কথা যায় হারিয়ে, তখন সুরু হয় মায়ের দুটি রত্ন-ছেলের আনন্দ-কোলাকুলি।
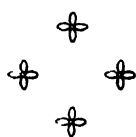
১৩১৯ সালের শারদোৎসব হ'ল সমাপ্ত—দূর-দিগন্তে মিলিয়ে গেল শরতের বর্ণচতুর ছায়া; দিনলক্ষ্মীর চোখে ধূপছায়া-তন্দ্রা, তবু সে-চোখে সোনালী দিনের ছবি। ফসলের গান-ঢালা পথে দাঁড়িয়ে আছে হেমন্তের একটি গুণ্ঠিত বেলা—কার প্রতীক্ষায়, কে জানে! এমনি এক দিনে আবার দেখি জননীকে তীর্থের পথে মুক্তিক্ষেত্র বারাণসী অভিমুখে। এই বারাণসী-যাত্রাই জননীর শেষ-তীর্থযাত্রা; দেহে অবস্থান-কালে আর কোনদিন কেউ তীর্থের পথে ছাখেনি জননী সারদেশ্বরীকে, সর্ব্বতীর্থের সার আপন লীলা-তীর্থ ছাড়া। ১৯শে কার্ত্তিক হ'ল শুভযাত্রা—পথের সীমা পথেই ফেলে, ছুটে চললো গাড়ি। দূর—আরো দূর—দেখতে দেখতে উষসী ও উষা দুটি মোহনায় হারিয়ে গেল একটি দিন, দিগন্তের পথ অতিক্রম ক'রে। পরদিন দিবসের মধ্যপ্রহরে মা'র গাড়ি এসে দাঁড়ালো শ্রীরামকৃষ্ণ-অদ্বৈতাশ্রমের নিকটস্থ লক্ষ্মীনিবাসে। বিপুল-ভক্তগোষ্ঠী-পরিবৃতা জননী এইখানেই কাটিয়েছিলেন আড়াইটি মাস। ভক্ত কিরণবাবুর নবনির্ম্মিত এই বাসভবন, প্রশস্ত আঙিনায় তার খোলা-আকাশের ডাক—প্রকৃতির দুলালী জননীর মনকে ক'রে

তোলে আকুল; বলেন, "ভাগ্যবান না হলে, এমন হয় না। ক্ষুদ্র জায়গায় থাকলে, মনও ক্ষুদ্র হয়; খোলা জায়গায় থাকলে, দিলও খোলা হয়।"

দর্শন হ'ল কাশীর বিশ্বনাথ, দর্শন হ'ল স্বর্ণকাশীর স্বর্ণ-অন্নদা। মায়ের মন এবার যেন অজানা আনন্দে ভ'রে উঠেছে—ধুলার বুকে হারানো পরশমণিটি খুঁজে দিতে তীর্থের বিশেষ বিশেষ স্থানগুলিতেও পড়ে তাঁর আতুল চরণ। শত তীর্থঙ্করের স্বপ্ন সার্থক ক'রে আবার জাগে তীর্থ-মাহাত্ম্য—দিব্য হতে হয় দিব্যতম।

২৪শে কার্ত্তিক বিশ্বজননী মহাকালীর পূজার তিথিতে এলেন মা, তাঁর বিশ্বজয়ী সন্তানদলের বুকের রক্ত দিয়ে তিল তিল ক'রে গড়া সেবাশ্রমে; ছ্যাখেন মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে তাঁর অন্তরদেবতা শ্রীঠাকুরের দেববাণী: "দয়া কি রে? সেবা—সেবা—শিব-জ্ঞানে জীব-সেবা"। বিরাট সেবাগারের প্রতিটি অঙ্গ হয় জননীর চরণধূলিতে ধূসরিত। ঘুরে ঘুরে ছ্যাখেন মা; ছ্যাখেন, পুষ্পবাটিকা-শোভিত বিরাট প্রাসাদোপম ভবন। এ যেন দীন, আর্ত্ত নারায়ণের পূজার দেউল—যার সেবায়, ত্যাগের গৈরিক-শিখায় দিয়েছে আত্মহুতি তাঁর শত শত সন্তান। গর্ব্বে আনন্দে মায়ের বুক বুঝি হয়ে ওঠে দশ-হাত! দ্বিভুজার হাতে যেন ঝ'রে পড়ে দশভুজার আশিস্-ধারা; বলেন, "এখানে ঠাকুর নিজে বিরাজ ক'রছেন, আর মা-লক্ষ্মী পূর্ণ হয়ে আছেন।" দীন নারায়ণের সেবায় লক্ষ্মীর ঝাঁপি তো চিরপূর্ণ থাকবেই। ছেলের গরবে গরবিনী মা শুধান, "আচ্ছা, এটি প্রথমে কী ক'রে আরম্ভ হ'ল?"

উত্তরে শোনেন আত্মন্ত সমস্ত ইতিহাস, কী ক'রে রিক্ত, প্রেমিক সাধু শুভানন্দের চোখের জল, আর চার আনা পয়সা নিয়ে গ'ড়ে উঠলো এই বিরাট সেবায়তন, যা কাশীর বুকে চির-অমর হয়ে আছে শ্রীরামকৃষ্ণ-নামের স্বর্ণস্তম্ভ হয়ে। পরমানন্দিতা জননী বলেন, "স্থানটি এত সুন্দর যে, আমার ইচ্ছে হচ্ছে কাশীতে থেকে যাই।" তারপর সেই সেবা-ভাণ্ডারের উদ্দেশে লক্ষ্মীস্বরূপিণী দিলেন কিছু লক্ষ্মীর ধন।

কিছুদিন পরে, ২৮শে অগ্রহায়ণের নীলাভ্র-অপরাহ্ণে তীর্থের দর্শনীয় স্থানগুলি করেন দর্শন ; বৈদ্যনাথ, তিলভাণ্ডেশ্বর প্রভৃতি দর্শনশেষে, মা এসে দাঁড়ালেন গঙ্গাতীরে। অস্তরাগরঞ্জিত বারাণসীর ভাগীরথী তখন নম্র-নত পূজারিণীর মতো শান্ত চরণে চলেছেন যেন দেবাদি-দেবের সান্ধ্য আরতিতে। তরঙ্গের মণিপদ্মে উঠেছে গুঞ্জন : 'শিব' 'শিব' 'শিব'। জননী এসে দাঁড়ালেন প্রশস্ত সোপান-তটে ; শিব-তীর্থে শিবানীর চরণ অভিষিক্ত ক'রে গেলেন জাহ্নবী—ভেসে-আসা দুটি পদ্মের দলে। কর্পূরের দীপের আলোয় একাকার হয়ে গেল সন্ধ্যাতারার আলো। তারপর কেদারনাথ-দেববিগ্রহ-দর্শন এবং আরতি-দর্শনও হ'ল সারা। বিগ্রহ দর্শন ক'রে ব'লে ওঠেন মা, "এ কেদার ও সেই কেদার এক—যোগ আছে ; এঁকে দর্শন ক'রলেই তাঁকে দর্শন করা হয়, বড় জাগ্রত।"

সারনাথের প্রাচীন কীর্ত্তি দর্শন ক'রতে আর-একদিন হ'ল যাওয়া। একটা সুনির্দ্দিষ্ট কালের স্তব্ধ ঐতিহ্যের মতো দাঁড়িয়ে আছে সারনাথ। কত লোকেই হয়তো সেদিন গেছে তার সেই বোধিকল্প মৌন নীরবতাকে স্পর্শ ক'রতে। কিন্তু সকলের মধ্যে কয়েকজন পাশ্চাত্ত্যবাসীকে দেখেই মায়ের কী মনে হ'ল, কে জানে ; বলেন, "যারা ক'রেছিল, তারাই আবার এসেছে। আর দেখে অবাক হয়ে বলছে, কী আশ্চর্য্য সব ক'রে গেছে।"

শুধু তীর্থের দেবতা, পাষাণ-মন্দির দেখেই ক্ষান্ত হয়না মা'র মন ; ছুটে যান দেখতে জীবন্ত চিন্ময় দেবমন্দির। দর্শন করেন সেইসব সন্তবৃন্দকে, যাঁদের দেহমন্দির দেবতার নিত্য আবির্ভাবে হয়ে আছে চির-অমৃতলোক। তাঁরা আছেন ব'লেই আজও মানুষ ছাখে তীর্থপীঠে শ্রীহরির চরণচিহ্ন—

"প্রায়েণ তীর্থাভিগমাপদেশৈঃ স্বয়ং হি
তীর্থানি পুনন্তি সন্তঃ।" (১।১৯।৮)

—ভাগবতের এ বাণী চিরন্তন।

কাশীতে দুইজন মহাত্মার দর্শন হ'ল মায়ের তীর্থ-দর্শনের

অঙ্গস্বরূপ। প্রথমে ভাগীরথী-তীরে জনৈক নানকপন্থী সাধুর দর্শন। বিশ্বজননী সাধারণ একটি পল্লীজননীর মতো গ্রহণ করেন তাঁর পদধূলি ; দেন কিছু প্রণামী। জানি না, সন্ন্যাসিবর বুঝেছিলেন কিনা, তার বহু সাধের অবিমুক্তক্ষেত্র কাশী—আজ কোন্ শুভক্ষণে মিলিয়ে দিলো মুক্তির দিশারীকে—মিলিয়ে দিলো মূর্ত্তিমতী কাশীশ্বরীর সচল বিগ্রহ !

তারপর দর্শন হ'ল সন্ন্যাসী চামেলীপুরীর। পুরীজীর পরিচয়—তিনি শ্রীঠাকুরেব শিবগুরু শ্রীমৎ তোতাপুরীজীর সম্প্রদায়-ভুক্ত। অনিকেত নিঃস্ব সন্ন্যাসীব চোখে-মুখে সেকি জ্বলন্ত দীপ্তি ! এদিকে দেহযষ্টি কালের দুর্লঙ্ঘ্য বিধিতে হয়ে পড়েছে জীর্ণ—দিনান্তের শেষ পৈঠায় এসে দাঁড়িয়েছেন পুরীজী, তবু নাই এতটুকু দুশ্চিন্তা ; শুধান গোলাপ-মা, "কে খেতে দেয় ?" চীরবাসধারী বৃদ্ধের কণ্ঠে নির্ভরতার অমিত তেজ : "এক দুর্গা-মাঈ দেতী হ্যায়, ঔর কৌন দেতা ?" চোখেব সামনে জীবন্ত ঈশানীকে দেখেই কি তাঁর কথায় এত নিশ্চিন্ত নির্ভরতা হয়ে উঠেছে আরো পরিস্ফুট, আরো দৃঢ়। ছেলের কথায় মায়ের হৃদয় ওঠে দুলে। ফিরে এসেও, ভুলতে পারেন না তাঁর সেই পরম বিশ্বাসের আলো-জ্বালা মুখখানি ; বলেন, "আহা, বুড়োর মুখটি মনে পড়ছে –যেন ছেলেমানুষটির মতো।" তারপর পাঠিয়ে দেন দুর্গা-মাঈ স্বয়ং—ফল, মিষ্টি, কম্বল। কত আদরে বলেন, "আবার সাধু কী দেখবো ? ঐ তো সাধু দেখেছি, আবার সাধু কোথা ?"

লীলার চিত্রে মাঝে মাঝে দরকার হয় রহস্য-ভরা দৃশ্যের অবতারণা। তা না হলে বুঝি হয়না লীলারসপুষ্টি। সেদিন মাতৃদর্শনে এলেন কয়েকটি কাশীবাসিনী—জগজ্জননী বুঝি রঙ্গচ্ছলে করেন স্বরূপ-গোপন। জনৈকা রমণী তাই পারেন না চিনতে। তাঁর কেমন যেন ধারণা হয়—গোলাপ-মা'ই বুঝি জননী সারদা, যাঁকে দর্শন ক'রতে তাঁরা এসেছেন ছুটে। গোলাপ-মা'র গাম্ভীর্য্যপূর্ণ প্রাচীন মূর্ত্তিই কি তার কারণ ? যাই হোক, তিনি এগিয়ে গেলেন গোলাপ-মাকে প্রণাম করতে। সেইখানেই বাধলো গোল। গোলাপ-মা

তাঁর ভুল বুঝতে পেরে, ব্যস্ত হয়ে করেন মা'র প্রতি অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ : "ঐ উনিই মা-ঠাকরুন।" রমণী তাড়াতাড়ি এসে মা'র চরণে নত হতে-না-হতেই, ভুলিয়ে-দেওয়া হাসি হেসে ঠিক তেমনি ক'রেই বলেন মা, "ঐ উনিই মা-ঠাকরুন।" রমণী আবার ছুটে আসেন গোলাপ-মা'র কাছে। আবার গোলাপ-মা দেন বাধা। মায়ের কাছেও সেই ভুলিয়ে-দেওয়া কথা আর হাসি। লীলার গোলকধাঁধায় প'ড়ে দিশাহারা হয়ে যান আগন্তকা। অবশেষে মহামায়ার মায়াই হয় জয়ী। ভুল ক'রে রমণী গোলাপ-মাকেই সাব্যস্ত করেন জননী ব'লে। তখন গোলাপ-মা নিরুপায় ; তীব্র ধমকে কাটতে হয় বিভ্রমের মোহজাল : "তোমার কি বুদ্ধি-বিবেচনা নেই ? দেখছো-না, মানুষের মুখ না দেবতার মুখ ? মানুষের চেহারা কি অমন হয় ?" তারপরের রহস্যটুকু আর পাওয়া যায়না লেখনী-মুখে। তবে মনে হয়, রমণীর অন্ধনয়ন গিয়েছিল খুলে, আর দুই চোখের বিস্ময় দিয়ে তিনি দেখেছিলেন, বুঝেছিলেন অনন্ত ঐশ্বর্য্য পেয়েছে লাজ, নিরাভরণা মায়ের অনৈশ্বর্য্যের রূপে—আর, তার সঙ্গে মনে পড়ে অমর কবির গানের দুটি চরণ :

"আভরণের কাজ কি বালাই,
সব রূপের গরব চরণধুলাই।"

এমনি ক'রে সোনার-হরিণ দিনগুলো যায় পালিয়ে, চোখে এঁকে পলাতকা স্মৃতি।

মাঝে মাঝে আসে একটি ভিখারিনী মেয়ে ; চোখের জলে বুক ভাসিয়ে সে গায়—পাষাণ-গলানো গান ! মায়ের একান্ত করুণার পাত্রী সে। প্রথম দিন সে এসেই গাইল :

"আমার মা কোথায় গেলে ?
অনেকদিন দেখি নাই, মা—
নে আমায় কোলে।"

মা শুধান পরিচয় : "কে মা তুমি ?" সে বলে, "আমি আপনার ভিখারিনী মেয়ে, মা!" কখনো অন্নপূর্ণার দুয়ারে, কখনো

দশাশ্বমেধ-ঘাটে সে থাকে প'ড়ে। ভিক্ষান্নতেই চলে দিন—অন্নপূর্ণার দুয়ারে কেউ তো থাকেনা উপবাসী।

কী ক'রে ভিখারিনী মেয়ে পেলো সন্ধান, সেই জানে! গোপন-মর্ম্মী ভক্ত কেমন ক'রে জানলো বারাণসীকে ধন্য ক'রতে আবার এসেছেন বিশ্বেশ্বরী? তাই কোনদিন-বা কিছু আনে হাতে ক'রে,—ভিক্ষায় হয়তো পেয়েছে একটি ফল, সেই রিক্তপ্রাণের নৈবেদ্যটুকুই সে নিবেদন করে—কত সঙ্কোচে কত লজ্জায়। মা-ও তার দেওয়া ফলটি আদর ক'রে করেন গ্রহণ: "আহা! দাও মা, ভিক্ষার জিনিস খুব পবিত্র, ঠাকুর বড় ভালবাসতেন।" সে কাঁদে; বলে, "মা, আমি আপনার ভিখারিনী মেয়ে—আমার ওপর এত দয়া!" তারপর প্রাণ ঢেলে দেয় তার স্বরের ডালি—এই তার পূজা—অশ্রুর আরতি! মা বলেন, "তোমার যখন ইচ্ছা হবে, এসো, মা।" আর, হাত ভ'রে দেন প্রসাদ। একটি বেদন-সুন্দর নিবেদন মা'র চরণে রেখে, চলে যায় ভিখারিনী। মায়ের ভুবন-ভরা ছেলেমেয়ের মাঝে এমনি গোপন-মর্ম্মী দীন ছেলেমেয়ে যে কত আছে গোপনে, তার খোঁজ কেই-বা রাখে?

দলে দলে আসে কৃপাপ্রার্থীর দল, কিন্তু তাদের যেতে হয় ফিরে। মা দেন না দীক্ষা; বলেন, "জয়রামবাটী কিংবা কলকাতায় গেলে, হবে।" জানিনা কী নিগূঢ় রহস্য লুকিযে আছে এর মাঝে। সেদিন এলেন এক মারোয়াড়ী রমণী—সাধারণ সংসারের গৃহিণী, কিন্তু উচ্চস্তরের সাধিকা; গৃহ, সংসার, পুত্রকন্যা কিছুরই নাই অভাব। কিন্তু সীমার পূর্ণতায় ভূমার অভাব বুঝি মেটে না। তাই তাঁর মনে নিরন্তর একটা অভাবের কাঁটা যেন জেগেই থাকে। এদিকে গো-মাতার সেবা, ধ্যান-ধারণা সবই করেন। শুধু তাই নয়, ধ্যানের সময়ে শুনতে পান বেদান্তের বেদ্য যে-মন্ত্র, সেই সোঽহং মন্ত্র,—অথচ চির-অশান্ত জীবন; কী যেন চাচ্ছেন, পাচ্ছেন না তার সন্ধান। সেই ভাগ্যবতী, সেদিন স্বপ্নলোকে পেলেন জননীর দর্শন-কৃপা; ভোর হতেই ছুটে এলেন, মা'র কাছে হৃদয় খুলে

জানালেন তাঁর অন্তরের সব বেদনা; বললেন গতরাত্রির স্বপ্ন-বৃত্তান্ত। সব শুনে বলেন মা, "ওর কুলকুণ্ডলিনী জেগেছে। এখন দীক্ষাটি হলেই, হয়ে যাবে। কাশীতে তো আমি দীক্ষা দিই না, এখানে শিব গুরু; জয়রামবাটী কি কলকাতা গেলে, হবে।" আবার অপর কোন ভক্ত-মেয়ে তাঁকে বলেন আর-একটি কারণ—তিনিও পেয়েছেন স্বপ্ন, মা যেন তাঁকে দীক্ষা দিতে উৎসুক; কিন্তু জননীর কাছে শোনেন সেই এক আপত্তি: "তোমাকে আমি কলকাতায় কি জয়রামবাটীতে মন্ত্র দেবো; কাশীতে মন্ত্র দিলে, সদ্যোমুক্ত হয়ে যাবে।" মহামায়ার অচিন্ত্য লীলা কে বুঝবে!

দেখতে দেখতে কেটে গেল আড়াইটি মাস। তীর্থের বিধি-নিয়ম সব-কিছুই সারা ক'রে, মা ফিরে এলেন আপন পিত্রালয়ে; তার নিবিড় বুকেই তো হাজার আলোর পাপড়ি মেলে ফুটেছিল মা'র লীলার কমল! সে দলগুলি যেন ভারতীয় নারীর এক-একটি আদর্শ—এ যুগের চারণ-বায়ু আজও বহন ক'রে ফিরছে তার স্নিগ্ধ সুরভি। জয়রামবাটী আর কামারপুকুরের সেই পর্ণকুটীর যেন ধরা-অধরার মিলনপ্রান্ত, এবং 'উদ্বোধন' বা অন্যসব লীলাপীঠের মূল উৎস যেন সেই পল্লীতীর্থ জয়রামবাটী। স্বজন-পরিবৃতা মা যেন সেখানে ধরা দিতে গিয়েও হয়ে পড়েছেন চির-অধরা—সাধারণের মাঝে একান্ত অসাধারণ। অলকার দেবী আবার মাটীর মানবী—নিত্যদিনের পরিচয়ে, নিত্যদিনের চেনায়—চির-অপরিচিতা, চির-অচেনা। তাই দেখি, কলকাতা যাবার পথে যখন কোন আত্মীয়া জানিয়েছেন পুনরাগমনের মিনতি: "সারদা, আবার এসো!"—পল্লীমাটীর মেয়ে দু'হাতে পবিত্র মাতৃভূমির ধূলি মাথায় স্পর্শ ক'রে সজল নেত্রে দিয়েছেন প্রতিশ্রুতি: "আসবো বইকি—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।" আবার যখন বহুদিন কলকাতায় হয়েছে থাকা, তখন পল্লীর মেয়েকে দেশের মাটী যেন দু'হাতে হাতছানি দিয়ে ডেকেছে, হাতছানি দিয়েছে নিস্পন্দিত দীঘির তট, তুলসীতলার সন্ধ্যাপ্রদীপ—শ্যামলীর সজল-পথ-চাওয়া। অথচ

কলকাতার ভক্ত-চক্র এড়িয়ে, দেশে যেতে হয়তো জাগছে পদে পদে বাধা, তখন সে কী করুণ মিনতি—ঠাকুরের পানে চেয়ে বলছেন, "জয়রামবাটী চলো। জয়রামবাটীর বড়-পুকুরের জল আর তুলসী কি মনে লাগেনা তোমার?" পিত্রালয়ের প্রতি অন্তরের এই নিবিড় টানটুকু উমামহেশ্বরীর যেন চিরন্তন। এরই আকর্ষণে তো একদিন বিমুখ শঙ্করকে স্তম্ভিত ক'রে রুদ্রপ্রিয়ার জেগেছিল ছিন্নমস্তার রূপ। মায়েরও এই টান দেখে কোন ভক্ত-ছেলে রহস্যচ্ছলে বলতে ছাড়ে না: "মা গো—বাপের বাড়ির প্রতি আকর্ষণ কি তোমার যুগে যুগে সাধা, মা!"

অথচ কী আশ্চর্য্য। বিশ্বের শত শত সন্তানকে অভয় আশ্রয় দিয়ে, আপন বিপুল স্বজনকুলের মাত্র ছয়জনকে দিয়েছিলেন মন্ত্রদীক্ষা। তার মাঝে একটিকে নিলেন মা, মানসকন্যা গৌরী-মা'র একান্ত অনুরোধে: "মা, একটি তোমার ব'লতে থাক্"। তিনি মা'র ভ্রাতৃজায়া সুবাসিনী দেবী। সত্যিই মায়ের প্রতি ছিল তাঁর গোপন দরদ। তিনি ছিলেন মায়ের একান্ত স্নেহের পাত্রী। এক এক দিন তিনি নিভৃতে জানান আকূতি: "মা গো, সাধন-ভজন তো কিছু জানি না।" জননীর মুখে ফোটে একান্ত আশীর্ব্বাদ ও আশ্বাস: "তুমি এই যে কাজ ক'রছো, এতেই সাধন-ভজন করা হচ্ছে, এর চেয়ে আর কী সাধন-ভজন? ঠাকুরকে জানাও—'আমার যেন ভক্তিলাভ হয়'।" তাঁরি কন্যা বিমলার হ'ল একবার কঠিন অসুখ। তখন শ্যামার কুটীরে এসেছেন জননী জগদ্ধাত্রী, তাঁরি পূজার আয়োজনে সকলেই ব্যস্ত। চারিদিকে আনন্দ-কলরব। এদিকে বিমলার তখন মুমূর্ষু অবস্থা—মরণের দুরন্ত বায়ে প্রাণপ্রদীপ এই বুঝি বা যায় নিভে। সুখকলরব সুবাসিনীর বক্ষে জাগায় ক্রন্দনের আর্ত্ত রোল। জননী তখন বাস ক'রছেন তাঁর নবনির্ম্মিত মন্দিরে—মাতৃভবনে। মা'র সেবক সারদানন্দের সজাগ দৃষ্টি ছিল কোথায় জননীর অস্বাচ্ছন্দ্য, অসুবিধা—তাই স্বজন ও ভক্তসংঘ পরিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পুণ্যপুকুরের পশ্চিম তটে পুষ্করিণী-সমেত ক্রয় ক'রলেন

একখণ্ড ভূমি। সেইখানেই নির্ম্মিত হ'ল মার নব দেবায়তন। সে-কাজে অর্থ সাহায্য করলেন মা'র অন্যতম কর্ম্মী ছেলে ললিতচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ১৩২৩ সালের প্রারম্ভেই হয়েছিল মা'র এই নবমন্দিরে অধিষ্ঠান। যাই হোক, সেইখান থেকে বরাভয়া এসে দাঁড়ালেন আর্ত্ত ভ্রাতৃজায়ার গৃহাঙ্গনে। মায়ের চরণ-দুটি ধ'রে আকুল হয়ে কাঁদেন সুবাসিনী দেবী, আর মা'র চরণধুলা দেন মেয়ের মুখে। মমতাময়ী আর কি পারেন স্থির থাকতে? মৃত্যু-পথযাত্রীর সাবা অঙ্গে দিলেন মরণ-হরণ অভয় পবশ, আর জল-ভরা চোখে দেবীপ্রতিমার দিকে চেয়ে বললেন, "কাল তোমার পুজো হবে, মা,—আর বড়বৌ হাউ-হাউ ক'রে কাঁদবে?" মায়ের আদরের ভ্রাতৃজাযাকে আর কাঁদতে হয় না। পূজার দিনে তাঁর মুখের আনন্দহাসি থাকে অম্লান। সেই রাত্রেই বিমলার জ্ঞান আসে ফিবে; ভয়েব সম্ভাবনাও যায় কেটে। ঘরের জনের কাছে নিত্যদিনের সঙ্গিনী হয়ে অনন্ত শক্তিকে এমনি ক'রেই রেখেছিলেন প্রচ্ছন্ন; তবু এমনি আমাদের নিরভিমানিনী জননী যে, শিষ্যের কাছেও প্রত্যাশা কবেননি গুরুব পূর্ণ দাবি। ভক্ত মেয়ে দেখেছেন স্বপ্ন—তাঁব অসুস্থ শিশুসন্তানকে ঠাকুর দিলেন ঔষধ, আর তাতেই সে আরোগ্যলাভ ক'রলো—জননীর কাছে বলতে গিয়ে ভক্ত পান বাধা: "আমাকে শুনিও না। স্বপ্নাছ্য ওষুধ; ব'লতে নাই।"

বাংলার মেয়ে পালন ক'রছেন গৃহধর্ম্ম—জগৎকে দেখাচ্ছেন গৃহীর চরম আদর্শ। আপন সন্তান শরৎ-মহারাজ, তাঁকেও দিচ্ছেন সন্ন্যাসীর মর্য্যাদা। সন্ন্যাসী যে বেদশীর্ষ। দূর হতে কোন ভক্ত দেখেছেন শবৎ-মহারাজের সদ্য-পরিত্যক্ত আসনখানি মা বার বার স্পর্শ ক'রেছেন আপন মাথে। বিস্ময়ে বিস্ফারিত চোখে ভাবেন ভক্ত—সহসা জননীর কেন এ ভাবান্তর? বলেন জননী, "বাবা, কত ভাগ্যে গেরস্তের দরজায় সাধুর পায়ের ধুলো পড়ে! সাধুর আসন তো মাথায়ই রাখতে হয়। আমরা গৃহী, আমাদের এই তো ধর্ম্ম।" কী আশ্চর্য্য। তীর্থ হতে আগত ছেলেকে বলছেন,

"আহা, পুণ্যতীর্থ সব! সাধু কি কম গা? কত সব জায়গা ঘোরে! যেখানে যেখানে গিয়েছ, আমাকে এক এক অঞ্জলি জল দিয়েছ তো? যেখানে যেখানে যাও, আমাকে তিন তিন অঞ্জলি জল দিও।" বলছেন আর বার বার জানাচ্ছেন সশ্রদ্ধ নতি—সুদূর তীর্থের উদ্দেশে। কত সময় বেদশীর্ষ সন্ন্যাসধর্ম্মকে শ্রদ্ধা দিতে গিয়ে, আপনাকে ক'রেছেন দীনাতিদীন। বেদশীর্ষ ধর্ম্মকে বেদমাতা ছাড়া, আর কেই-বা দেবে বিজয়মাল্য—সম্মানের মণিহার? "ঠাকুরের কৃপা যাঁরা পেয়েছেন, গৃহস্থই হোন আর সন্ন্যাসীই হোন, তাঁরা তো সকলেই সমান, সকলেরই তো একই গতি হবে?"—সন্তানের এই সংশয়সঙ্কুল প্রশ্নকে জননী ক'রেছেন তীব্র আঘাত: "সেকি ব'লছো! তা কি কখনো হয়? দেখতে পাচ্ছনা, আমি এদের সব নিয়ে আছি ব'লে, তাঁকে ডাকবার সময় পাচ্ছি না। সন্ন্যাসীতে গেরস্তে আকাশ-পাতাল তফাত। গেরুয়া প'রেছে, সংসার ছেড়েছে ভগবানের জন্য; আর এরা সব নিয়ে আছে ব'লে ভগবানের দিকে মন দিতেই সময় পায় না।" বৈধী তপস্যা ছাড়াও, জীবনের প্রতিটি ক্ষণ যাঁর দুঃখের তপস্যার দহন দিয়ে ভরা, তাঁর মুখে এ-কথা শুনে, তাঁর 'মহতো মহীয়ান্' আদর্শের দিকে চেয়ে থাকতে হয় অপার বিস্ময় নিয়ে। মহামায়া নিজে মান দিয়ে, দিলেন সমস্ত সাধু-সমাজকে এগিয়ে চলার মন্ত্র—সন্নাসী যেন পায় তার পবিত্র সন্ন্যাসমার্গের প্রতিষ্ঠা।

তাই বুঝি সন্ন্যাসিনী মেয়ে গৌরদাসীর কথাগুলি সহজে পারতেন না ঠেলতে। বহু কৃপাপ্রার্থীকে তাঁরই কথায় ক'রেছেন দীক্ষিত; এমনকি কত সময়ে তাঁকেই জিজ্ঞাসা ক'রেছেন—কৃপা-প্রার্থীকে কোন্ ইষ্টমূর্ত্তিটি নির্দ্দিষ্ট ক'রে দেবেন। দীনময়ী মা। গৌরীমাকে নিয়ে এই দীনতার লীলা কতবার যে হয়েছে, ইতিহাস বুঝি তার সব ছবিগুলি ধ'রে রাখতে গিয়ে, হারিয়ে ফেলেছে দিশা। মনে পড়ে—ভক্ত এসেছেন পূজা-ভোগের উপায়ন নিয়ে; জাগ্রতা জননীকে পাষাণ-প্রতিমার মতো বসিয়ে, কণ্ঠে দুলিয়ে দিয়েছেন শুভ্র

যূথীর মালা, আর শ্রীচরণে অর্ঘ্য দিয়েছেন রাশি রাশি গোলাপ আর জবা—তারপর কম্পিত হাতে মা'র শ্রীমুখে ধরেছেন নৈবেদ্যের থালা। কাছেই ছিলেন গৌরীমা। লীলারস উপভোগ ক'রতে গৌরীমা ছিলেন চিরদিনের বিদগ্ধ জন; হেসে বললেন, "এবার শক্ত ছেলের পাল্লায় পড়েছ, মা—এখন দেখা যাবে না-খেয়ে কী ক'রে ওঠো!" নিরুপায় বালিকার একটি অপ্রতিভ প্রসন্নতা ফুটে ওঠে মা'র দুটি সন্ধ্যায়ত চোখে; অবশেষে ভক্তের কাছে হার মেনে গ্রহণ ক'রলেন তার নিবেদিত ভোগের একটু কণিকা, তারপর মৃদু হেসে নিজের কণ্ঠের মালাখানি জড়িয়ে দিলেন গৌরীমার কণ্ঠে। তাঁকে নিয়ে দক্ষিণেশ্বরেও সে কত বুক-ভাঙা লীলা, সে তো ভোলা যায় না। আর গৌরীমা'র কাছে মা'র স্থান যে কোথায়—তা বোঝা যায় তাঁর কথায়, তাঁর ব্যবহারে।··· দখিনাপুরের একটি দিনের পটভূমি আমরা কল্পনায় আঁকতে পারি। লীলা-চঞ্চল তীর্থপীঠের এক লাজারুণ-বেলা। কূল আলো ক'রে দাঁড়িয়ে আছেন ঠাকুর, মা, আর গৌরীমা। বকুলের কুঞ্জে তখনও শোনা যাচ্ছে পরাগ-লাঞ্ছিত ভ্রমরের আনাগোনা, বৈরাগী দখিনাও আকুল, সুরধুনীর কূলে কূলে; শুধান ঠাকুর সুরসিকা গৌরীমাকে—"বল্ তো, মা, তুই কাকে বেশী ভালবাসিস্?" লীলাময়ের সঙ্গে লীলায় গৌরীমা'র কণ্ঠে জাগে গান; অবগুণ্ঠিতা মধুশ্রীর মতো পাশেই দাঁড়িয়ে-থাকা জননীর প্রতি মৃদু ইঙ্গিত হেনে তিনি বলেন—

"রাই হতে তুমি বড় নও হে বাঁকা বংশীধারী—
লোকের বিপদ হলে, ডাকে মধুসূদন ব'লে,
তোমার বিপদ হলে পরে, বাঁশীতে বলো
রাইকিশোরী।"

চতুর-চূড়ামণির মুখেও মিষ্টি চতুর হাসি; বলেন—"না বাপু, তোর সঙ্গে আর পারিনি!" আর মা তখন ব্রীড়ানত সলজ্জ বধূটি। কুণ্ঠায় আকুল হয়ে শুধু চেপে ধরেছেন গৌরীমা'র দুটি হাত—দু'চোখে অনুনয়ের নিবিড় তিরস্কার। এমনি কত লীলাই যে হয়ে

গেছে! যখনই বলেছেন এই সন্ন্যাসিনী মেয়ের কথা, বলতে গিয়ে যেন কথা হয়ে উঠেছে অফুরান : "এই যে গৌরদাসী, সন্ন্যাসিনী—মেয়েদের তো সন্ন্যাস নাই—গৌরদাসী কি মেয়ে? ও তো পুরুষ—ওর মতো ক'টা পুরুষ আছে? ঠাকুর বলতেন, 'মেয়ে যদি সন্ন্যাস নেয়, সে কখনও মেয়ে নয়—সেই তো যথার্থ পুরুষ'।"

সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশেও একবার গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন গৌরীমা জয়রামবাটীর দেউল-দ্বারে। তখন শীর্ণস্রোত আমোদরে নেমেছে তিমির-দিনান্ত। তারি আবছা আঁধারে ভিক্ষু-সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে গৌরীমা চাইলেন ভিক্ষা, তাঁর স্বভাব-পুরুষ-কণ্ঠে—সামনে পড়লেন বিকৃতমস্তিষ্কা ছোট মামী। চকিতে এক রঙ্গময় দৃশ্যের অবতারণা—পুরুষ-বেশী গৌরীমাকে গৃহাঙ্গনে দেখে. সভয়ে আর্ত্তনাদ ক'রে উঠলেন ছোট মামী—মূর্চ্ছা যান আর কি! চীৎকার শুনে ছুটে বেরিয়ে আসেন মা, চকিত দৃষ্টিতে থম্‌কে একবার ছাখেন গৌরীমা'র পানে, তারপর একমুখ হেসে বলেন—"ওমা, এ-যে আমার গৌরদাসী। তুমি কাকে দেখে ভয় পাচ্ছ গো?" পুরুষ-বেশের আড়াল দিয়ে জগতের বহু লোকের দৃষ্টি এড়ালেও, মায়ের সন্ন্যাসিনী মেয়ে কোনদিন মাকে পারেননি চাতুরিতে ফেলতে। তাই সে-চিনে-ফেলার আনন্দ-কলরবে সেই সন্ধ্যাও হয়ে উঠেছিল সন্ধ্যাতারার মতো।

* * *

খাঁটী সন্ন্যাসীর মর্য্যাদার আসন মায়ের কাছে ছিল মাথার মণি। তাই সেই সন্ন্যাসীর মাঝে এতটুকু কলুষের হাওয়া লাগলে, তা হয়েছে তাঁর অসহনীয়। জনৈক সাধুর মনে জমে উঠেছে বৃথা ক্রোধ—সহ্য হয়না জননীর। 'সম্যক্-ন্যাস' আদর্শের মাঝে একি অভিমানের কলঙ্করেখা? বিদ্যুৎ-জ্বালা ঘনিয়ে ওঠে নয়নে; বলেন মা, "বামুনের ছেলে সন্ন্যাসী হলে, হাতির দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো হয়। আর সন্ন্যাসীর রাগ-অভিমান থাকলে, বেতের রেক্ চামড়া দিয়ে বাঁধানো হয়। ছাখো-না, তার কী হয়!" মায়ের তীব্র

ভর্ৎসনা-বাণী হয় সফল—অপরাধী সন্তানকে ত্যাগের গৌরব-গৈরিক পরিত্যাগ ক'রে, ফিরে যেতে হয় সংসারের আবিল বক্ষে।

মনে পড়ে, কামারপুকুর শ্রীধামে এসেছেন উৎকল-দেশীয় এক প্রাচীন সাধু। তখন শ্রীঠাকুর ক'রেছেন লীলা-সংবরণ। জননী একাকিনী কামারপুকুর-বাসিনী। সত্যিকার সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী কিনা? তাই বুঝি মূর্ত্তিমতী জগন্মাতা নিজেই গ্রহণ ক'রলেন তাঁর সব ভার। বিস্মিত ভক্তদল ছাখে, সর্ব্বহারা রিক্ত-ছেলের জন্য পল্লীর ঘরে ঘরে সারদা অন্নপূর্ণা নিজেই ক'রছেন ভিক্ষা—নিত্য যোগাচ্ছেন তাঁর ক্ষুধার অন্ন; তাঁর যোগক্ষেম সব-কিছু ক'রছেন বহন। শুধু তাই নয়, পল্লীছুলালদেরও দিলেন সাধুসেবার প্রেরণা—দিলেন উৎসাহ। মায়ের বড় সাধ, ভিক্ষুক-সন্ন্যাসীর জন্যে বেঁধে দিতে হবে ছোট্ট একটি কুঁড়ে, যাতে নিশ্চিন্তমনে সন্ন্যাসীর দিনগুলি হয় অতিবাহিত একান্তে ভজন-আরাধনে। তাই হ'ল। সকলের উৎসাহ-চেষ্টায় নির্ম্মিত হ'ল ছোট্ট সুন্দর একটি পর্ণকুটীর। সেটুকুর জন্যেও দেখি, জননীর কী আকুলতা! একদিকে তৈরি হতে থাকে সাধন-কুটীর, আর প্রতিদিন আকাশ ভ'রে ছুলে ওঠে মেঘের জটা—গ'র্জ্জে ওঠে বজ্রভৈরবের কণ্ঠ, আর জননী সারদা ছুটি হাত জোড় ক'রে তিমির-ঘেরা মেঘের পানে করুণ-কাজল চোখ-ছুটি তুলে জানান অশ্রুসজল মিনতি: "রাখো গো ঠাকুর, রাখো—আগে সারা হোক তোমার চরণাশ্রিতের ঠাঁইটুকু, তারপর ঢেলে দিও যত খুশী।" সত্যিই দেখা যায়, এই মিনতিটুকুর শেষে ফিরে যায় মেঘের দল—একদিন নয়, ছু'দিন নয়, বেশ ক'টি দিন ধ'রেই চলে মেঘের আসা আর ফিরে-যাওয়া। দেখতে দেখতে কুটীরখানিও হয় সম্পূর্ণ, সন্ন্যাসীরও মেলে শেষের দিনের আশ্রয় জননীর স্নেহচ্ছায়ে। ছুটি বেলা মা খোঁজ নেন কুটীর-দ্বারে এসে: "সাধুবাবা, কেমন আছ গো?" তাঁরই তো দায়। সাধুবাবা কিন্তু কুশলেই থাকেন। আর দীর্ঘজীবন-শেষে একদিন সেই পরমাশ্রয়েই শেষনিশ্বাস রেখে, তিনি ধরণীর খেলাঘর থেকে নেন চিরবিদায়।

এমনি ক'রে চরম দুঃখের দিনেও মহিমময়ী জননীর সেবার রূপটি ছিল সমভাবেই সমুজ্জ্বল। সেখানে বিচারের ছিলনা কোন স্থান। সাধু-সন্ন্যাসী, পল্লীর দীনদরিদ্র সকলেই সন্তান, সকলেরই সেখানে সমান আসন—জয়রামবাটীর কত সন্ধ্যা এমনি এসে দাঁড়িয়েছে আকাশ-মাটীর মোহনায়। বাইরে দ্রোণকুন্দের ঝোপে জোনাক উড়ছে ঝাঁকে ঝাঁকে,—ঝিঁঝির একটানা ঘুম-পাড়ানী। জয়রামবাটীর মাতৃমন্দিরে প্রদীপের আধো-আলো-কাঁপা একটি গৃহকোণে বসেছে যেন একটি ছোট্ট সভা—সে-যুগের পল্লীমঙ্গলের আসর। বসেছেন পল্লীলক্ষ্মী জননী সারদেশ্বরী সারাদিনের কর্ম্ম-অবসরে, ছোট্ট একটি চৌকির ওপর চরণ-দুটি দুলিয়ে, আর পায়ের নিচে ঘিরে বসেছে গ্রামের যত কৃষক-মজুর ছেলে-মেয়ের দল। তারা কইছে খুঁটিনাটি যত দুঃখ-সুখের কথা, তাদের আপন মায়ের সাথে—আর মা-ও তাদের সুখে-সুখী দুঃখে-দুখী হয়ে, নিচ্ছেন তাদের ঘর-সংসারের খোঁজখবর। অসীম যে সীমার মাঝে এমন ক'রে হারিয়ে যেতে পারে, কল্পনাও যেন পায়না তার দিশা। হয়তো সেইদিনই কলকাতা থেকে এসেছেন ভক্ত—শহরের আলো চোখে মেখে—এসেছেন বিশ্বজননীর দর্শন-কামনায়। জানিনা তাঁর মানসলোকে মা'র কোন্ রূপটি আঁকা ছিল! কিন্তু এসে, স্তম্ভিত নয়নেই তিনি দেখেছিলেন জননীর সেই দীনার্ত্তিহারিণী রূপ, আর বুঝেছিলেন বিশ্বজননীর প্রকৃত রূপ কাকে বলে। বিশেষ ক'রে দীন ভারতের দরদী কল্পনা একে আর ছাড়িয়ে যেতে পারেনা যে, ভারতের অধিকাংশ সন্তানই চির-রিক্ত কৃষক, মজুর আর মধ্যবিত্তের দল। তাই শুনি জননীর মুখে : "ভগবান যখন আসেন, তখন শিশু আর গরীবের ভিতর দিয়েই আসেন।" জয়রামবাটীর অধিবাসীরা ভালোভাবেই জেনেছিল যে, তাদের গাঁয়ে আছে এই একটিমাত্র শান্তিনীড়, যেখানে মিলবে তাদের জীবনের প্রয়োজনীয় যা-কিছু—মিলবে রোগের ঔষধ, শোকের সান্ত্বনা, ক্ষুধার অন্ন, দুঃখের সমবেদনা—এক কথায়, বেঁচে-থাকার

স্বপ্ন এইখানেই হতে পারে সার্থক। তাই তো তারা ছুটে আসতো।

কোনদিন হয়তো এসেছে দীন-দরিদ্র মাঝিবউ। মায়ের দৃষ্টি এড়ায়না তার ব্যথাতুর হৃদয়টি; তার মলিন মুখখানিতে যে হৃদয়ের সজল ছায়া নিবিড় হয়ে পড়েছে, কেমন ক'রে লুকাবে তা? দরদী সুরে শুধান মা—“এতদিন আসনি কেন, মাঝিবউ?” সোহাগ-ছোঁয়ায় দুলে ওঠে মাঝি-মেয়ের শোকের সায়র; ডুকরে কেঁদে ওঠে সে, ভাঙা-ভাঙা গলায় জানায় তার ভাঙা-বুকের কথাঃ একটিমাত্র জোয়ান ছেলে--তার ভবিষ্যতের আশার প্রদীপ, দীনের একমাত্র সম্বল—অকালমৃত্যু নিষ্ঠুর হাতে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে তাকে, মাঝিবউ মাথা কুটেও আগলে রাখতে পারেনি তাকে! ··· আর শুনতে পারেন না মা।

কণ্ঠ ভেঙে জাগে আর্ত্তনাদঃ “বলো কী, মাঝিবউ!” তারপর মাঝিবউয়ের মতোই আকুল কান্নায় ভেঙে পড়েন মা, তার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে। সে এক অভাবনীয় দৃশ্য। সহসা মায়ের আর্ত্তক্রন্দনে গৃহবাসী সকলেই আসে ছুটে, বাণী-হারা মুখে চেয়ে ছাখে, শ্রাবণ-ভাঙা মেঘের মতো মায়ের সেই কান্না; ছাখে, আর বিস্ময়ে চোখের পলক ফেলতেও যায় বুঝি ভুলে। কেটে গেল ক'টি বেদন-বিধুর ক্ষণ। মাঝিবউ কাঁদলো বুক ভ'রে, আর কাঁদলো মায়ের সাথে। তারপর একসময় চুপ ক'রলো। কিন্তু কান্নার বদলে সে যে নিয়ে গেল গভীর সহানুভূতি দিয়ে গড়া একটি নিবিড় শান্তি, তার বুঝি তুলনা নাই। সেই শান্তিই হয়তো তার সারা জীবনের সব দুঃখের গ্লানিকেই দিলো ধুয়ে-মুছে। যাবার সময়ে সে পেলো হাত-ভরা প্রসাদ, আর পেলো মা'র করুণ কণ্ঠের আহ্বান ঃ “আবার এসো, মাঝিবউ!” বলা বাহুল্য, মাঝিবউ সেদিন ভরা-বুকেই গিয়েছিল ফিরে, শান্তির পরশমণি আঁচলে বেঁধে।

এমনকি ধনী-ভক্ত-বহুল কলকাতার ‘উদ্বোধনে’ও এই একই রূপ মা-জননীর। দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছে ভিক্ষুক, শূন্য ভিক্ষাপাত্র

নিয়ে। কোনদিন ফিরাতে পারেন না মা। সেদিন কিন্তু ঘ'টলো এক অঘটন। নিচে কোন সাধুর কঠিন তিরস্কারে আহত হয়ে ভিখারী গেল ফিরে—কেমন ক'রে জানতে পারেন মা। পথের ছেলে এসে চেয়েছে ক্ষুধায় অন্ন, আর তার পরিবর্ত্তে পেয়েছে অপমান আর তিরস্কার—সে ব্যথা কেমন ক'রে সয় মা'র প্রাণে? কঠোর আদেশ হ'ল ধ্বনিত—যেখান থেকে হয় ফিরিয়ে আনতে হবে ভিখারীকে। জনবহুল শহরে কে জানে কোথায় হারিয়ে গেছে সেই এক নামগোত্রহীন দীন ভিক্ষুক! কে তাকে চিনে রেখেছে? তবু আনতে হবে। চতুর্দ্দিকে অন্বেষণের প'ড়ে যায় সাড়া। না হলে, জননী হবেন রুষ্টা। অবশেষে বহু অনুসন্ধানে মিললো তার খোঁজ। সকলে মিলে যখন নিয়ে এলো তাকে মাতৃ-সন্নিধানে, মায়ের বুকেও তখন পরম তৃপ্তি—ক্ষুধার্ত্ত ছেলের মুখে অমৃতপাত্রটিকে ধ'রে দিয়ে।

* * *

জগদ্ধাত্রীপূজার দিন কোন দীনাতিদীন ভক্ত জানিয়েছেন প্রার্থনা—যদি মা কৃপা ক'রে অধম সন্তানের বাড়িতে একবার চরণধূলি দেন। সেখানেও ছুটে গেছেন জননী। অতি জীর্ণ একখানি ভাঙা ঘর—একান্ত স্থানাভাবে সেই সংকীর্ণ ঘরখানিতেই মা বসলেন ভক্তসঙ্গে—পরম প্রসন্ন মুখ, সন্ধ্যা-করুণ দুটি আঁখি। আবির্ভাবের আলোক-দ্যুতিতে ভ'রে ওঠে দীন মন্দির। দীন ভক্ত হয়ে যান কৃতকৃতার্থ চোখের জলে বুক ভাসিয়ে; জননীর শ্রীচরণ-দুটি তীর্থ-সলিলে অভিষিক্ত ক'রে, সেই পূত চরণামৃত রেখে দিলেন অতি যত্নে অতি আদরে। ভক্তটির বৃদ্ধা জননী জানান আকূতি: "মা, আশীর্ব্বাদ করো আমার ছেলেকে। ওর পূজা করবার বড় সাধ, কিন্তু বাড়িঘর তো কিছুই নেই।"—ইত্যাদি। চিরদিনের আন্তরিকতার বাণী জননীর শ্রীমুখে, তাতে মেলে দুই-ই—আশীর্ব্বাদ আর সান্ত্বনা। "আহা, তা বেশ ক'রেছে। মা যখন এসেছেন, তখন বাড়িঘর সব হয়ে যাবে। তোমার ছেলেটি বড় ভালো,

খুব ভক্তি আছে।” তারা আনে দীন উপচার—মাও প্রসন্নমুখে গ্রহণ করেন। তারপর কত প্রশংসা! “প্রতিমাখানি বড় সুন্দর হয়েছে। চমৎকার মুখের ভাব—ভক্তের পূজা কিনা।” দুঃখীর বুক ভ'রে ওঠে অপার করুণায়; ভাবে—দীনের পূজাকে এমন মান আর কে দেবে, দীনজননী ছাড়া? এমন ক'রে উপচারহীন আঁধার ঘরের উৎসবে আর কেই-বা এসে দাঁড়াবে—আলোর আলো ছাড়া? সে স্বীকৃতিও পাওয়া যায় জননীর মুখে: “মা-দুর্গা কৃপা ক'রে ওর বাড়িতে এসেছেন”। এই আমাদের বিশ্বজননী—পল্লীছেলের কাছে পল্লীলক্ষ্মী। আবার আপন গৃহে গৃহলক্ষ্মী। তখন দেখি অপূর্ব্ব কর্ম্মময় জীবন। স্বামী প্রেমানন্দের ভাষায়: “রাজরাজেশ্বরী সাধ ক'রে ঘর নিকুচ্ছেন, বাসন মাজছেন। সংসার যে কর্ম্মক্ষেত্র—সে আদর্শ পূর্ণভাবে দেখিয়ে গেলেন মা সারদা। মহামায়ার কাজের শেষ নাই!” ভক্ত মেয়েরা হয়তো চেয়েছেন—মাকে তাঁরা কোন কাজ ক'রতে দেবেন না; তাই ভোর না হতেই তাড়াতাড়ি এসেছেন কাজ সুরু ক'রতে। কিন্তু একটু স্থানান্তরে যেতেই ছাখেন, ক্ষিপ্র-তড়িৎ-হস্তে সে-কাজ ক'রে ফেলেছেন সম্পন্ন। শেষের দিকে দুর্ব্বল শরীরের ঘটে নাই তার ব্যতিক্রম। স্নান ক'রতে যাবেন, হঠাৎ যেন কোথায় চ'লে গেলেন। অনুসন্ধানরতা ভক্ত-সেবিকা সবিস্ময়ে ছাখেন—গোয়ালের পিছনে চুপি চুপি দাঁড়িয়ে ঘুঁটে দিচ্ছেন, অথচ শরীর তখন একান্ত অক্ষম। কী আকূতি—পাছে মেয়েদের হবে কষ্ট, তাই অক্ষম দেহেও ক'রেছেন তাদের কর্ম্মভার-লাঘব। ভক্ত মেয়ে দুঃখ জানালে, বলেন, “তা হোক, সবাই তো কাজে-কর্ম্মে আছে, মা, আমিই দিয়ে দি'।”

অলস জীবন ছিল জননীর একান্ত উপেক্ষার। বার বার বলেছেন: “কর্ম্ম—লক্ষ্মী”। এই তো এ-যুগের বাণী—এই তো এ-যুগের মন্ত্র। অতীতের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে ধ্যানতন্ময় বৈদিক যুগ। আজ মানবচিত্ত সংযমের-শৃঙ্খল-হারা। তাই বাহ্যিক নৈষ্কর্ম্য তাকে দেবে বৃথা-অলস-চিন্তার ইন্ধন মাত্র। তাই জননী নিজের জীবন

দিয়ে প্রতিষ্ঠা ক'রে গেলেন এ-যুগের মর্ম্মবাণী—বিশেষ ক'রে যে কর্ম্মের মাঝে গঠিত হবে আদর্শ মাতৃজাতি, তারি মূর্ত্ত প্রতিমা দেখি জননী সারদাকে। বলেছেন সরল গ্রাম্য ভাষায় ঃ "মেয়েমানুষের কাজই লক্ষ্মী। আমার মা বলতেন, যে খুব ভালো ক'রে রেঁধে-বেড়ে লোকজনকে খাওয়ায়, তার ঘরে মা-অন্নপূর্ণা অচলা হয়ে অবস্থান করেন। আমার মা লোকজনকে খাওয়াতে খুব ভালবাসতেন।" ভক্ত মেয়ে বল্‌লেন, "তাই বুঝি, মা, তুমি এসেছিলে তাঁর ঘরে?" গোপন-স্বরূপিণী একটু হেসে শুধু বলেন, "আমি কে, মা?—ঠাকুরই সব।"

এই আমাদের কল্যাণী মা—যে গৃহে যখন থেকেছেন, সেই গৃহই যেন হয়ে গেছে লক্ষ্মীর আবাহন-গেহ। গৃহের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিটি বস্তুকে দিয়েছেন তার যোগ্য আদর, তা-ই স্বল্পেই হয়ে গেছে পূর্ণতায় উচ্ছল। কখনও কেউ দ্যাখেনি মায়ের হাতে কোন-কিছুর বৃথা অপচয় -সে লক্ষ্মীমন্ত হাতে হয়নি কারো অমর্য্যাদা, হয়নি কিছু নষ্ট; বলেছেন, "যার যা প্রাপ্য, তাকে তা দিতে হয়।" বলেছেন, "অপচয়ে মা-লক্ষ্মী কুপিতা হন।" গৃহমার্জ্জনার অবশেষে সম্মার্জনীটিকেও যদি কেউ রেখেছে ছুঁড়ে নিতান্ত অবহেলায়, সে-অবহেলাটুকুও মা'র প্রাণে বেজেছে। তিরস্কার ক'রেছেন, কিনা "কাজ হয়ে গেল, আর অমনি তাকে ক'রলে অবহেলা"! সযত্নে তুলে রেখেছেন তাকে স্বস্থানে।

এমনি ক'রে সর্ব্বংসহা কল্যাণী হাসিমুখে ক'রে গেছেন স্বকার্য্য-সাধন। গভীর দুঃখ বরণ ক'রে নিয়েছেন, সহজ প্রাণের আনন্দ দিয়ে—গভীর হতেও গভীর, আবার সহজ হতেও সহজ। কত সময়ে ফুটে উঠেছে মায়ের এই সরল মধুর ভাবটি। নিজেই যেমন বলেছেন, ঈশ্বরের ভাবের উপমা দিতে গিয়ে ঃ "ঈশ্বর বালক-স্বভাব কিনা? কেউ চাচ্ছে, তাকে দিচ্ছেন না; আবার কেউ চাচ্ছে না, তাকে দিচ্ছেন।" মায়ের মাঝেও কখনো কখনো জেগে উঠেছে এই ভাবটি। সেবায় ইচ্ছুক ভক্তদের এড়িয়ে মাঝে মাঝে ঝোঁক পড়েছে

তাঁর দুষ্টু ছেলেদের প্রতি, যারা তাঁর সেবা করতে একান্ত অনিচ্ছুক। কত সময়ে দেখা গেছে, সকলকে ছেড়ে একটি ছোট্ট অবাধ্য ছেলেকে বলছেন—"দে বাবা, চারটি ফুল তুলে—লক্ষ্মী ধন আমার!" ছেলেটি কিন্তু নারাজ। তার মোটেই ইচ্ছা নাই মা'র কথা শোনবার। বলছে, "না, আমি পারবো না।" মা-ও নাছোড়ঃ "দে বাবা, চারটি ফুল তুলে দে।" ছোট্ট মেয়ের যেমন, যখন যা আবদার ধরবে সেইটিই হওয়া চাই পূর্ণ—তেমনি ক'রেই মা ধরেছেন আবদার। শেষে সেই আবদারই হ'ল জয়ী—ছেলেটি তুলে দিলো ফুল।

শ্রীচরণ-দুটি সেবা করতে ভক্ত-সেবিকার দলে হয়তো প'ড়ে যায় কাড়াকাড়ি। রঙ্গময়ীর কী রঙ্গ, কে জানে! তাদের না ব'লে, বলছেন গ্রামের জনৈকা বৃদ্ধাকে, "দে মা, পায়ে একটু হাত বুলিয়ে—পা-টা বড় কামড়াচ্ছে।" বৃদ্ধার কী মতিভ্রম—ঝাঁঝিয়ে ওঠে মায়ের কথায়ঃ "আমি পারবোনি, বাছা।" তবু মায়ের সেই এক মিনতি—আকূতি-ভরা সুরে বলছেন, "দে মা, পায়ে একটু হাত বুলিয়ে।" বৃদ্ধা দেয় জবাব, "সমস্ত দিন গেল, আর এই রেতের বেলা পায়ে হাত বুলিয়ে দাও? আমি আর পারিনি!" কিন্তু আজও মায়ের সেই এক আবদারের ভঙ্গীঃ "দে মা, একটু হাত বুলিয়ে,—কি আর ক'রবি বাছা, বল্।" অবশেষে বৃদ্ধার হাতেই আগ্রহভরে যেচে নেন তার হেলায়-ভরা একটুখানি সেবা। জানিনা ভাগ্যহতা, ভাগ্যবতী প্রাচীনা কে—যাকে অহেতুক কৃপা করবার জন্য বালিকা-স্বভাবা জননীর এত ব্যাকুলতা?

জননীর দেবজীবনে এমনি ছোট ছোট রঙ্গ-পরিহাসের মাঝেই হয়তো কত সময়ে প্রকাশিত হয়েছে কত ঐশীশক্তিভরা লীলামাধুরী! জননী তখন কোয়ালপাড়ার জগদম্বা-আশ্রমের কিছু দূরে একটি বাড়িতে। মানসকন্যা রাধু অসুস্থা, তাই তাকে নিয়ে আছেন নির্জ্জনে একান্তে। সেদিন সরলা বালিকার মতো বলছেন জননী, "আজকাল মনের কী যে হয়েছে—যা চিন্তা ওঠে, তাই উপস্থিত হয়, তা ভালোই হোক আর মন্দই হোক।" ভক্তেরা ছাখে সত্যই তাই।

তা না হলে, কোয়ালপাড়ার দিক-সীমান্তে কখনো কেউ ছ্যাখেনি বন্য জন্তুর আকস্মিক আবির্ভাব, আর সেই কোয়ালপাড়ার নির্জ্জন বাড়িখানিতেই সহসা একদিন মনে উঠলো মা'র অজানা ভয়ের সম্ভাবনা —কথায় কথায় প্রকাশও করেন ভক্তসকাশে—"যে জঙ্গল! কোনদিন ভালুক না বেরিয়ে পড়ে।" নির্ভয় বিশ্বাসে ব'লে ওঠেন সন্তান— "কই, মা, এদিকে তো কখনও ভালুক দেখিনি।" কিন্তু কী আশ্চর্য্য, মা'র শ্রীমুখে এ-কথা প্রকাশ হবার সঙ্গে সঙ্গে, সেখান হতে মাত্র এক মাইল দূরে দেশড়ায়, সত্যই সেদিন হ'ল বন্য-ভালুকের আবির্ভাব। মা'র কথা তো সত্য হতেই হবে।

আবার, সেদিন আষাঢ়ের মেঘসজল রাত্রি—স্তনিত আঁধার-মগ্ন প্রহর—নীরবে চেয়ে আছে দূরে, অনেক দূরে। জোনাকির পাখাও নিভিয়ে ফেলেছে আলো। ছায়া-ঢাকা সেই লগ্নে একটি বৃক্ষতটে ব'সে ছিলেন মা ভক্তসঙ্গে, কেমন যেন একটু আনমনে। সহসা ব'লে উঠলেন, "ছ্যাখো, সে পাগলটি কই অনেকদিন আসেনি। বদ্ধ-পাগল—গানটানগুলি কিন্তু বেশ গায়।" পাগল ছেলেকে স্মরণ ক'রেছেন মা, ভক্তদের মনে জাগে ভয়। সে ভীতিটুকুও এড়ায়না মা'র চোখে, তাই বুঝি নিজেও নারীসুলভ আতঙ্কে ব'লে ওঠেন— "তবে বড় ভয় করে বাবা, পাছে এখানে চেঁচিয়ে-মেচিয়ে ওঠে।" মা'র এই কথায় সেবিকা তার মনের ভাব আর চেপে রাখতে পারে না; শিউরে উঠে বলে, "আর তার নাম কেন, মা? যদি এখন এসে পড়ে এই রাত্রিবেলায়?" মা শুধু বলেন, "কে জানে, মা!" কথা শেষও হয় না, ঘটেনা একমুহূর্ত্ত বিলম্ব—সবিস্ময়ে আর সভয়ে ভক্তদল ছ্যাখেন সত্য-সত্যই পাগল এসে দাঁড়িয়েছে একেবারে মায়ের কাছে; হাতের নিচে এক-বোঝা সজিনা-শাক। মাকে বলছে, "তোমার জন্যে সজিনা-শাক নিয়ে এলাম।" ভক্ত-সেবিকা তো পালায় ছুটে। সেবক ভক্তদল অবাক, এই গভীর রজনীতে বর্ষার দুরন্ত নদী পাগল পার হ'ল কেমন ক'রে! যাই হোক, ভক্তদের মুখ চেয়ে মা তাকে অনুরোধ করেন স্থানান্তরে যেতে—"যা বাবা, এখন—

এই রাতের বেলায় আর গোলমাল করিস্‌নি।" পাগলের যেতে মন ওঠে না; বলে—"যাব কী ক'রে? নদীতে বান যে।" ভক্তেরা করে প্রশ্ন—"তবে এলি কী ক'রে?" সে প্রশ্নের উত্তর দেয় পাগল খুব সহজ কথায়ঃ "সাঁতরে পার হয়ে এসেছি।" কারো মুখে আর কথা সরে না—যেন মায়ের স্মরণের আকুল টানেই ছুটে এসেছে পাগল এই রাতে, বানের মুখে ভাসিয়ে দিয়ে তার জীবনের সব ভয়। সকলে চুপ। অবশেষে মায়ের মুখে "লক্ষ্মীটি গোল করিস্‌নি" এই মধুর কথাটি শুনে, পাগল তখনকার মতো চলে যায় স্থানান্তরে—কোথায় কে জানে! শুধু অন্ধকারে মিশিয়ে গেল তার কালো শরীরটা, আর ভক্তেরা বাঁচলো স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে।

* * *

এই কোয়ালপাড়া মঠে সেদিন হ'ল মায়ের এক অভিনব দর্শন। ছায়াচ্ছন্ন আশ্রমবক্ষে নেমে এসেছে নিঝুম মধ্যাহ্নের মায়া। চ্যুত-পুষ্পাকীর্ণ পথপ্রান্ত নীরবে শুনছে যেন কোন্ অচিন পথিকের পায়ের ধ্বনি। প্রোষিত-বধূর প্রতীক্ষায় চেয়ে আছে বন-বাতায়ন। আপন-মনে-থাকার এই নিরালা অবসরে সবাই আছে আপন-আপন কাজে। সহসা আঙিনা-বক্ষে শোনা যায় মা'র কণ্ঠ—কেমন যেন অস্ফুট আকুল স্বরে ব'লে ওঠেনঃ "ঠাকুর!" তারপর সব চুপ। ছুটে আসে আশ্রমবাসিনী জননীরাঃ কী হ'ল মা, কী হ'ল?" কিন্তু কে সাড়া দেবে? সকলে স্তম্ভিত নয়নে ছ্যাখে, এলায়িত দেহে মা লুটিয়ে পড়েছেন ধরণীর ধূলি-শয্যায়—বিস্রস্ত কেশভার ছড়িয়ে পড়েছে এদিক-ওদিক। মা বাহ্যজ্ঞানশূন্যা। আকুল হয়ে ঘিরে বসেন সেবিকার দল—একটা ব্যস্ততার সাড়া প'ড়ে যায় বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়ে আনার চেষ্টায়। শীতল জলের ঝাপটা, স্নিগ্ধ-ব্যজনে বেশ কিছুক্ষণ সযত্ন সেবার পরে ধীরে ধীরে ফিরে আসে মা'র লুপ্ত সংজ্ঞা। সকলে শুধায়, "কী হ'ল, মা, হঠাৎ এমন অসুস্থ হয়ে পড়লেন কেন?" একটু চুপ ক'রে থেকে মা বলেন, "ও কিছু না। ছুঁচে সুতো দিতে গিয়ে সামান্য মাথা ঘুরে অমন হয়েছিল।" কিন্তু মুখ্য রহস্যের প্রকাশ

হ'ল পরে। কোন মর্ম্মী ভক্তের কাছে জানিয়েছিলেন মা, সেদিন তপ্ত নিদাঘ-মধ্যাহ্নে জননীর নয়ন-সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছিলেন স্বয়ং ঠাকুর—সেই জয়রামবাটীর রাঙা বাটে বরবেশে-দাঁড়ানো কিশোর গদাই। সেদিনের মতোই সোনার-বরন তনুখানি ছিল স্বেদজলে উছল, মন্দানিলে দুলছে আকুল উত্তরীয়; শুধু নয়ন-জ্যোৎস্নায় জেগে আছে একটি নিষ্ঠুর অবসাদ। এসেই যেন কত শ্রান্তিতে ক্লান্তিতে দেহখানি লুটিয়ে দিতে চাইলেন সেই ধূলিধূসর আঙিনার একটি কোণে। তাই কি প্রাণে সয়? রাঙা-আঁচল-ঢাকা স্মৃতির কৈশোর যেন ঘুম ভেঙে চায়, লজ্জার আড়াল ঠেলে। হৃদয়-আসন তাঁর তরে তো নিত্য বিছানো—তবে কেন এ ছল? কে বুঝবে তাঁর লীলা! তাড়াতাড়ি ছুটে আসেন মা: "যাই, বিছিয়ে দি' আমার আচলখানি।" জানি না, বিছিযে দেওয়া হয়েছিল কিনা আধো-আঁচল; বুঝি তার আগেই আপন অঙ্গখানি বিছিয়ে দিয়ে মা লুটিয়ে পড়েছিলেন ভূমিতলে, হয়ে পড়েছিলেন সম্বিৎহারা। মরমীর চলার পথে তনুর তনিমা বিছিয়ে দেওয়া—প্রেমেব তীর্থে সে-যে চিরদিনের কামনা!—

যব পঁহু আধ চরণে চলি যাত
কাহে চরণক বিঘনি পরাণ না লেত॥

—স্বামী সত্যানন্দ

—প্রেমের এই আকৃতি যে চিরন্তন, আর শ্রীঠাকুর হয়তো যুগচক্র-পরিচালনার যে শ্রান্তি তা জুড়াবার ঠাঁই পেয়েছিলেন এই অচঞ্চলতলেই।

করুণ হতেও করুণ, কোমল হতে অতি কোমল প্রেম দিয়েই তো গড়া মরমীর দেবতনুখানি—সে তনুতে ফুলের আঘাতটুকু দিতেও যেন বাজে বুকে। তাই দেখি, ভারী গ'ড়ের মালা ঠাকুরের গলায় দিতেও মায়ের জাগে আপত্তি: "মতিকে বোলো—এত ভারী মালা যেন না দেয়, ঠাকুরের ভারী লাগবে।"

* * *

ধরণীর লীলা যতই আসে ফুরিয়ে, অধরার লীলা ততই হয়

ঘনীভূত। অবশ্য ঠাকুরের অদর্শনে বিরহের মাঝে নিত্যমিলনের ছোঁয়াটুকু ছিল চিরন্তন, এ কথা চিরসত্য। তা না হলে, কলকাতার মাতৃমন্দিরে প্রথম শুভাগমন-কালে শ্রীঠাকুরের মন্দিরের পার্শ্বে অবস্থিত তাঁর শয়ন-মন্দির দেখে কেন জানিয়েছিলেন আপত্তিঃ "ঠাকুরকে ছেড়ে আমি কি থাকতে পারি? আমাকে ঠাকুরঘরেই দাও।" তবু মনে হয়—যত দিন যায়, শেষের দিন যতই আসে ঘনিয়ে, ততই জ'মে ওঠে অলখদেবতার সাথে নিত্যলীলা—দর্শন, কথা, চাওয়া, পাওয়া—সবই হয়ে ওঠে অবাধ। প্রত্যক্ষ ছ্যাখেন, নিবেদিত ভোগ ঠাকুর নিলেন কিনা। ঠাকুর গ্রহণ না করলে, সে-বস্তু নিজেও করেন না গ্রহণ। পরে দেখা যায়, সত্যই সে-বস্তু-নিবেদনে আছে বিশেষ বাধা। কোনদিন হয়তো ভক্তকে দিতে এসেছেন খিচুড়ি-প্রসাদ, ভক্তটি হয়তো ক'রেছে আপত্তি—শুনে মা বলছেন, "একটু খাও, স্বয়ং ঠাকুর খেয়েছেন।" ভক্ত শুধান, "ঠাকুরকে কি দেখতে পাওয়া যায়?" বলেন মা, "হ্যাঁ, আজকাল মাঝে মাঝে এসে খিচুড়ি আর ছানা খেতে চান।" আবার কোন সন্ন্যাসী ছেলে হয়তো ক'রেছেন প্রশ্ন, "মা, ঠাকুরকে তো ভোগ নিবেদন করি, কিন্তু তিনি খান কিনা, কিছুই বুঝতে পারি না।" আশ্বস্ত করেন জননী, "খান বইকি, বাবা! প্রাণের ভিতর থেকে নিবেদন ক'ল্লে নিশ্চয়ই খান। আমি যখন গোপালকে খেতে দিয়ে আদর ক'রে ডাকি, তখনই দেখি গোপাল নূপুর-পায়ে ঝুনঝুন ক'রে এসে হাজির হয়, আর আবদার ক'রে খায়।"

বিদায়-মুখে চলে যেন অসীম সীমার জোয়ার-ভাঁটার খেলা। যত এগিয়ে আসে নিত্যলোকের আহ্বান, তত লীলার লোকে অফুরান হয়ে ওঠে কৃপার পাত্র—নিঃশেষে বিলিয়ে দেবার আকাঙ্ক্ষায় আকুল। পুণ্য-জন্মতিথি-দিবসেও ছিলনা কৃপাপ্রার্থীর আগমনের বিরাম। যে এসেছে, সেই পেয়েছে পবিত্র নাম—আর উদগার ক'রে দিয়েছে গুরুদক্ষিণা-স্বরূপ তাদের ভোগরাশি। মা'র শ্রীমুখে শুনি, কোনবার জন্মতিথির দিনের কথায়ঃ "দীক্ষা তো আর হ'ল না—

কাল জ্বর এসে গেছে, জ্বর ছাড়ে নাই। কাল সকাল থেকেই শরীরটা একটু খারাপ ছিল—মনে ক'ল্লুম স্নান ক'রবো না। তারপর ভাবলুম 'জন্মতিথি', স্নানটা করি, বাবা—প্রথম মনের কথা শুনতে হয়, সেই ঠিক বলে।" দীক্ষা দিতে না পারায় মনের এই উদ্বেগ, বিশেষ ক'রে অসুস্থ শরীরে—এ শুধু জগত্তারিণীর পক্ষেই সম্ভব।

১৩২৪ সালের ২০শে পৌষ জন্মতিথি-দিবসের জ্বর মা'র দেব-দেহকে ক'রে তোলে আরও শিথিল; তবু নাই বিশ্রামের অবকাশ—কি দৈহিক, কি মানসিক। সারাটি দিন কাটে ভক্তসেবায় আর ভক্তকে কৃপা বিলাতে; আর সারা-নিশি জাগরণ হয়, প্রতিটি ভক্তের হয়ে তাদের ইষ্টমন্ত্র-জপে, তাদের ইষ্টের ধ্যানে। তারা যে অক্ষম। ছেলে ঘুমাচ্ছে—ঘুমাক, তার শিরে জাগতে হবে মাকে। সেই আদর্শই যেন দেখাতে এবার আসা। কিন্তু কোমল দেবতনু আর কত পারে সইতে? ক্রমাগত প্রবল জ্বরে দেহ হয়ে আসে ক্ষীণ—আর তার ওপর একটির পর একটি নিভে যায় শ্রীঠাকুরের হাতে-জ্বালানো দ্বাদশ-দীপের দিশারী শিখা। সে ব্যথা যেন মাতৃহৃদয়কে ক'রে তোলে জর্জ্জরিত।

১৩২৫ সালের ১৪ই শ্রাবণ বিদায় নিলেন স্বামী প্রেমানন্দ। "একে একে নিবিছে দেউটী"। আকুল হয়ে কাঁদলেন জননী। হায়, ধুলার ধরণী কি-ই বা দিলো তাঁকে ঐ দুরন্ত ব্যথা ছাড়া!

দুঃখের পাষাণ-আঁকা পথে পা রেখে আরো একটি বছর গেল পার হয়ে। ১৩২৬ সালের ২৭শে অগ্রহায়ণের কৃষ্ণাসপ্তমীতে উদ্‌যাপিত হ'ল জননীর শেষ জন্মতিথি, পুণ্যতীর্থ জয়রামবাটীতে। শেষ শিখায় যেন হেসে উঠলো সেই তারা-ঝরা সন্ধ্যা। সেদিন স্নানান্তে জননী পরিধান ক'রলেন প্রিয়-সন্তান সারদানন্দের নিবেদিত কাপড়খানি; সীমন্তে এঁকে দিলেন ভক্ত মেয়েরা সিন্দুর-রেখা, ললাটে কুমকুম-চন্দন, গলায় দুলিয়ে দিলেন ফুলের মালা—হাজার জ্যোৎস্না যেন চকিতে দেখা দিলো গোধূলি-মগ্ন আকাশে। কোথায় লুকালো মা'র রোগক্লিন্ন দেহ—তার স্থানে মূর্ত্ত হয়ে উঠলো রূপে

অপরূপ কমলদলিত হৈমবতী! স্বর্গের সুষমা দিয়ে গড়া সে-দিব্যরূপে বুঝি চকিতে বিলীন হয়ে গিয়েছিল সমস্ত মানবত্ব। রোমাঞ্চিত অঙ্গে ছাখেন ভক্তদল প্রাণ ভ'রে—চোখের পলক আর পড়ে না! কিন্তু তাই বা কতটুকু? একটু পরেই আবার ফিরে এলো সহজ-সুন্দর দ্বিভূজা-রূপ।

সেই জন্মতিথি-দিবস থেকে আবার সুরু হ'ল বিরামহীন জ্বর—তার সাথে অবিরাম ধারায় চললো কৃপার বর্ষণ। শয্যালীন অবস্থাতেও অক্ষুণ্ণ রইলো সব-কিছু—তাঁর আদর্শ, তাঁর ভাব কিছুই হারালো না, একটি ক্ষণের জন্যও। শরীর ভালো থাকলে তো কথাই নাই,—শরীর খুব খারাপ থাকলেও, যথাসময়ে উঠে আবার হয়তো একটু শুয়ে নিতেন। নিজেই তো বলতেন—"রাত তিনটে বাজলেই, যেখানেই থাকি, কানের কাছে যেন বাঁশীর ফুঁ শুনতে পেতুম।" এমনকি রোগশয্যাতেও আজন্ম লজ্জাশীলা জননী মাথার লজ্জা-বাসটিকেও স্থানবিচ্যুত হতে দেননি কোন পুরুষ-ভক্তের সাক্ষাতে। কোনদিন যদি হয়েছে অন্যথা, সেবিকাদের ক'রেছেন তিরস্কার—কেন তারা মাথায় তুলে দেয়নি বাস। আজীবন ঘৃণাই ক'রে এসেছেন মেয়েদের নির্লজ্জ আচরণকে, ঘৃণা ক'রেছেন পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার অনুকরণে স্ত্রী-স্বাধীনতাকে, সমাজে তাদের নির্ব্বিচার অবাধ মেলা-মেশাকে; বলেছেন, "পুরুষজাতকে কখনও বিশ্বাস কোরো না। অপর কথা কি, নিজের বাপকেও না, ভাইকেও না; এমনকি স্বয়ং ভগবান যদি পুরুষরূপ ধাবণ ক'রে তোমার সামনে আসেন, তাঁকেও বিশ্বাস কোরো না।" এতখানি কঠোর বাণী না দিলে, এ যুগকে বাঁচানো বুঝি দায় হবে। বুঝেছিলেন, সভ্যতার নামে বর্ত্তমান আদর্শ-মাতৃসমাজকে নিয়ে যাবে ভোগের কুটিল পথে—নিয়ে যাবে ধ্বংসের অগ্নিগহ্বরে। প্রকৃত নারীশিক্ষার যে আদর্শ, তার প্রকৃতি হবে সম্পূর্ণ অন্যরূপ; জননীর দিব্যজীবন যার পূর্ণপ্রকাশ। মাতৃত্বের এই দিব্য আদর্শ গ্রহণ ক'রে, জগতে কবে হবে সত্যিকার মাতৃজাতির অভ্যুদয়?

* * *

ধীরে ধীরে নেমে আসে আঁধার যবনিকা। বহু কঠিন নিয়ম-নিগড় সত্ত্বেও গোপনে চলে কৃপা-বিতরণ। কখনো বা মন্ত্রদানে, কখনো সেবার অধিকার দিয়ে। দরিদ্রকুলের কোন গৃহকল্যাণী এসেছেন ছুটে, শ্রীমায়ের কৃপাপ্রাপ্তা—তখন কঠোর প্রহরায় মা'র দেউলদ্বার রাখা হ'চ্ছিল রুদ্ধ, যাতে না আসতে পারে বাইরের লোক, কিন্তু ভক্তের টানে আর ভগবানের আকর্ষণে বুঝি সবার ঘটেছে পরাজয়। তাই দৈবক্রমে সেইদিন থাকেনা কোন প্রহরী। ভক্ত নির্ব্বাধে এসে পৌছান জননীর চরণতলে, আর মা-ও জানান আহ্বান ঃ "মা, এসেছ—বোসো মা, বোসো।" তারপর দিলেন কৃপার সুযোগ ঃ "ভ্যাখো মা, ছেলেরা কখন এসে পড়বে, বলা যায় না। আমার পা-টা একটু টিপে দাও তো—কেমন ব্যথা হয়েছে।" আনন্দে অভিভূত ভক্তমেয়ে হয়ে পড়েন বিহ্বল, বুঝি মনে পড়ে, জননীকে প্রথম দর্শনের দিন ঠিক এমনি ছিল কঠিন প্রহরা; কিন্তু সেদিনও ঠিক এমনি ক'রেই মা দিয়েছিলেন পথের বাধা সরিয়ে—নিজে ডেকে দিয়েছিলেন দীক্ষা। সেই স্মৃতিই হয়ে আছে জীবনের পরম পাথেয়। এমনি একটি নয়, দুটি নয়, গোপনে-কৃপা-পাওয়া ভক্তদলের সংখ্যা ছিল অগণন। বিদায়-মুখেও কখনো হ'চ্ছে স্বরূপ-প্রকাশ, আবার কখনো বা হ'চ্ছে গোপনের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে ফেলা। তাই বুঝি শেষ রোগশয্যায় জনৈকা রমণী তাঁকে জগদম্বা ব'লে স্তুতি করায়, তীব্র কথার আঘাতে তাকে ক'রেছিলেন নিরস্ত। আবার রাধুর প্রতি জননীর শেষবাণী শুনি ঃ "তুই আমার কী ক'রবি? আমি কি মানুষ?" মায়াচ্ছন্ন রাধু সত্যই চেনেনি তার দেবমাতাকে। অথচ তার কাছে আর তার উন্মাদিনী জননীর কাছে কতবার হয়েছে মার স্বরূপ-প্রকাশ; বলেছেন, "কত মুনিঋষি তপস্যা ক'রেও আমাকে পায় না—তোরা আমাকে পেয়ে, হারালি।" তবু চেনেনি তারা। জানি না, মহামায়ার ইচ্ছা লীলার কোন্ পথ-অবলম্বনে হয় পরিপূর্ণ! যে রাধুকে অবলম্বন ক'রে চলেছিল

ধরণীর লীলা, সেই রাধুর ওপর থেকে যেদিন তুলে নিলেন সমস্ত মন, সেদিন ভক্তদের চোখে নেমে এলো আসন্ন বিদায়ের গোধূলি। ভক্তদের বহু চেষ্টাতে, বহু আকূতিতেও ফিরে এলোনা সে-মন। ঠাকুরের কথা ঃ "যোগমায়াকে অবলম্বন ক'রেই যে অবতার-লীলা।" তাই যোগমায়ার বন্ধনটুক্ ছিঁড়ে দিলেন মহামায়া—ধরণীর খেলাঘর থেকে বিদায় নিতে।

সে-দিনের কথা —১৩২৭ সালের ৪ঠা শ্রাবণের কথা বলতে গিয়ে, কথা হয়ে যায় কান্না। সেদিন সদ্য-মাতৃবিয়োগবিধুরা ক্রন্দসী ধরণী মাতৃহারা শিশুর মতো আকুল অশান্ত। মা'র চ'লে-যাওয়ার পথের পানে দু'হাত বাড়িয়ে ডাকে—ফিরে আয়, মা, ফিরে আয়! কিন্তু সে-ডাক কি সেখানে পৌঁছায়, যেখানে মর্ত্ত্যের রোদনকে ছাপিয়ে বেজে উঠেছে আগমনীর বোধন-বাঁশী? সেই নিত্যমিলনের বৃন্দাবন রামকৃষ্ণলোকে? শ্রাবণ-বিজয়ার আকাশ তবে এত কাঁদে কেন?

জননীর চির-আকাঙ্ক্ষিত সেই ধ্যানলোক—যেখানে বহুদিন পূর্ব্বেই হয়েছিল ক্ষণ-মিলনের অভিসার, আজ সে-লোক আলোয় আলোময়! সেখানে মা আমার আজ নিত্যলোকের নিত্য-লীলাময়ী—রামকৃষ্ণলোকের রানী। চিন্ময়ীর সেই রূপই তো শাশ্বত রূপ। তাই বুঝি সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের ঋষির ধ্যানময় স্বপ্নলোকে আবির্ভূতা, সনাতনী সারদা জ্যোতির্ম্ময়ী রূপে বলেছিলেন —"তুমি আমার দেহত্যাগ যা দেখেছিলে, সে দেহ মায়িক। এই ছাখো, আমি সেই রূপেই রয়েছি।" এরপর বহুদিন গেছে কেটে—দূরাগত স্মৃতির বাঁশীতে সুর আজো আসে ভেসে। মনে পড়ে একটি দিনের কথা, সেদিন জয়রামবাটীর ভাঙা পথের রাঙা বুক ভেঙে জেগে উঠেছে শুভ্র-সুন্দর এক মন্দির-শীর্ষ—ধরণীর স্বপ্নসার্থক সেই দেবারাম, উৎসবমুখর তার প্রশস্ত প্রাঙ্গণ—দূরদূরাগত সহস্র সহস্র ভক্তকণ্ঠে ধ্বনিত হ'চ্ছে জগজ্জননীর জয়নিনাদ। 'দীয়তাং ভুজ্যতাং' রবে দিক মুখরিত—রাজরাজেশ্বরী অন্নপূর্ণার অন্নভাণ্ডারের দ্বার সেদিন লক্ষ লক্ষ ভুখারী শিবের জন্য উন্মুক্ত। হঠাৎ সেই মুখরিত

উৎসব-সন্ধ্যা যেন হয় সুরস্নরভিত—এক দীন ভিক্ষুকের কণ্ঠঝঙ্কারে। একতারার তারে ঘা দিয়ে সে গেয়ে উঠেছে হারানো প্রাণের প্রেরণায় ঃ

"সেদিন ভিক্ষু শিবের সঙ্গী হতে
শিবানী তোর বাজেনি কি প্রাণে ?
আজ একি দেখি ওমা শুভঙ্করী
বিশ্বেশ্বরী তুমি বিশ্বেশ্বর বামে ॥"

একি অভিমান না আনন্দ ? কে গায় ? চম্‌কে ওঠে ভক্তদল, চেয়ে ত্যাখে, এক আপনহারা বাউল নেচে-নেচে তন্ময়—ব্যাকুল কণ্ঠে সে গেয়ে চলেছে তার নিভৃত মনের কথাগুলি। মুহূর্ত্তের তরে থেমে যায় সব কলরব—সমাগত ভক্তের লক্ষ-আঁখি বুঝি হয়ে ওঠে অশ্রু-উছল—কী ভেবে, কে জানে! হয়তো মনে হয়, আজ যে প্রশস্ত উজ্জ্বল মর্ম্মর-প্রাঙ্গণে নেমেছে তাদের মাতৃনামের পরমোৎসব-রাতি —একদিন তারি ধূলিধূসরিত জীর্ণ বাটে জননীর কোমল চরণ বারবার হয়েছে ব্যথাহত—ধুলায় এসে, চরণ ভ'রে শুধু ধুলাই নিয়ে গেছেন! আর আজ ? অলকার স্বর্ণ-সিংহাসনে মা রাজ্যেশ্বরী— তাই ধুলার বুকেও বুঝি তারি স্বর্ণচ্ছবি। সেদিন শত-ভক্তের প্রণাম-মাঙ্গলিকে যেন এক হয়ে গেল স্বর্গ আর মাটী!

* * *

বাংলার এক অখ্যাত পল্লীবক্ষে শান্তির পুঞ্জীভূত তুষারে গঠিত ঐ মাতৃমন্দিরে সেদিন উড়েছিল যে বিজয়-নিশান—শুচিশুভ্র হংসদূতের মতো তার বিধূনিত পক্ষ বিস্তার ক'রে, সে একদিন ছায়া মেলে দাঁড়াবেই—সারা বিশ্বের অশান্তিকে আড়াল ক'রে। ঘোষণা ক'রবে মাতৃনামের বৈজয়ন্তী—শোনাবে আলোর দেশের কথা— জননীর বীর সন্তান, বীর সন্ন্যাসীর কম্বুকণ্ঠের মহাভারতী : "হে ভারত! ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ—সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী। ভুলিও না, তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য

বলি-প্রদত্ত। ভুলিও না, তোমার সমাজ—সে বিরাট মহামায়ার ছায়া মাত্র।"

একদিন সকলকে এসে দাঁড়াতে হবে—সকলকে এসে মিলিত হতে হবে এই কল্যাণ-ছত্রচ্ছায়াতলে, আর শত যুগের অন্ধকার ঠেলে উন্নত শিরে বলতে হবে, বীর সন্ন্যাসীর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে ঃ "হে গৌরীনাথ! হে জগদম্বে!—আমায় মনুষ্যত্ব দাও, মা—আমার দুর্ব্বলতা, কাপুরুষতা দূর করো, আমায় মানুষ করো!"

আর, উপনিষদের প্রথম উষার উমা-হৈমবতীর মতো ক্ষণ-প্রকাশিত ব্রহ্মবিদ্যা-স্বরূপিণী আমাদের মা'র চরণে আমাদের প্রার্থনা জানাতে হবে যুক্তকরে, অশ্রুসিক্ত নয়নে ঃ

"আয়াহি বরদে দেবি ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি
গায়ত্রি ছন্দসাং মাতঃ 'ব্রহ্মময়ি' নমোঽস্তু তে॥"

সমাপ্ত

আর কি আসিবি ফিরে
তারা-ঝিমঝিম পৌষালী রাতে
জননীর মতো ঘিরে।

সাঁঝালো দীপেরে দেখি
মনে প'ড়ে যায় জননী গো তোর
কুহেলী-জড়ানো আঁখি।

মনে প'ড়ে যায় ওমা
সন্তান-তরে বুক-ভাঙা কত
দুঃখ-বেদনা সোনা।

অলকার আঁখি মেলে
মনে কি পড়েনা ক্ষণিকের তরে
সন্তানে গেছ ফেলে।

জীবনের এই পারে
শত বাধা আর জর্জ্জর হিয়া
চেয়ে-দেখা বারে বারে।

সীমা-অসীমায় মিশা
'এ-ঘর ও-ঘর' কভু নয় ভুল
অকূলে মিলায় দিশা।

স্বপনের চুমা আঁকি
জাগরণে যেন দাঁড়ায়ো জননী
তেমনি সোহাগ মাখি।

জীবন-তীর্থ-তীরে
মরণ-পাত্রে অমিয়া উছসি
এস গো জননী ফিরে॥

—স্বামী সত্যানন্দ

সারদা-মায়ের বাণী

১। যার আছে ভয়, তারই হয় জয়।

২। বিশ্বাস কি সোজা কথা, বাবা? বিশ্বাস শেষের কথা। বিশ্বাস হলেই তো হয়ে গেল।

৩। বাসী, পচা জিনিস খাবে না। যা খাবে, মনে-মনে ঠাকুরকে নিবেদন ক'রে খাবে। তাতে রক্ত পরিষ্কার হবে, মন পবিত্র হবে, দেহ নির্ম্মল হবে।

৪। যে জিনিস ঠাকুরকে নিবেদন করা হয়, সে জিনিস যেমনই হোক, আর তা থাকে না, প্রসাদ হয়ে যায়। কিন্তু প্রসাদ হলেও, লোভ ক'রে কখনো খাবে না।

৫। এই যে খুঁটিটি দেখছো, এর ভেতর ভগবান আরোপ ক'র্ত্তে পারলেও, ভগবান লাভ হতে পারে।

৬। মন দিয়েই সব হয়।

৭। পৃথিবীর মতন সহ্যগুণ চাই। পৃথিবীর উপর কত রকমের অত্যাচার হ'চ্ছে, অবাধে সব সইছে। মানুষেরও সেইরকম চাই।

৮। কৃষ্ণপক্ষ-শুক্লপক্ষ যেমন আছে, মনেরও সেইরকম অবস্থা হয়—কখনো ভালো, কখনো মন্দ। এ প্রকৃতির নিয়ম। মনের যেমন অবস্থাই হোক-না কেন, সকাল-সন্ধ্যায় বসতে ছাড়বে না। মন ভালো অবস্থায় থাকলেও, সকল সময় বেশ বসতে চায় না; আবার চঞ্চল অবস্থার মধ্যেও কখনো কখনো বেশ ব'সে যায়। কোন্ মুহূর্ত্তে যে হবে, তা বলবার জো নাই।

৯। তীর্থভ্রমণ খুব ভালো, ওতে মন পবিত্র হয়। তবে দীক্ষা নিয়ে তীর্থদর্শনে যাওয়া ভালো।

১০। 'বকল্‌মা' মানে—মনে-মনে ভগবানকে সমস্ত ভার অর্পণ করা। বকল্‌মা দেওয়ার পরেও ইষ্টমন্ত্র-জপ, কিংবা দিনান্তেও ভগবানকে একবার স্মরণ ক'রতে হয়।

১১। সব একসময়ে সৃষ্টি হয়েছে। যা হয়েছে, সব এককালে হয়েছে ; একটি একটি ক'রে হয়নি।

১২। মানুষের আর কতটুকু বুদ্ধি—কী চাইতে কী চাইবে। তবে ভক্তি ও নির্ব্বাসনা চাইতে হয়।

১৩। এই কাঁচা শরীর দিয়েই পাকা শরীর লাভ ক'র্ত্তে হয় ; সেইজন্যে এই শরীরটাকে যত্ন করা চাই।

১৪। শরীর-ধারণে কিছুমাত্র সুখ নাই। দুঃখপূর্ণই জগৎ। সুখ কেবল একটি নাম মাত্র। ঠাকুরের কৃপা যার উপর হয়েছে, সেই কেবল তাঁকে ভগবান ব'লে জানতে পেরেছে ; এবং তার সেইটুকুই সুখ জানবে।

১৫। পূজা-পদ্ধতির অত দরকার নেই। ইষ্টমন্ত্রেতেই সব কাজ হয়।

১৬। ভয় কি ? সর্ব্বদা জানবে, তোমাদের পিছনে একজন আছেন।

১৭। শোনো নাই ?—নিত্যকৃষ্ণ—নিত্যভক্ত। সে ভাবে তারা থাকবে। তোমাদের ভয় কি ? তোমাদের জন্যে ঠাকুর রামকৃষ্ণ-লোক তৈরি ক'রেছেন।

১৮। ব্যাধি ও তপস্যা একই জিনিস। তপস্যার মতো ব্যাধিতেও কর্ম্মক্ষয় হয়।

১৯। মন্ত্র না নিলে, সে কী পূজা ক'রবে ? সে তো ছেলেখেলা।

২০। ঠাকুরের নাম ব্রাহ্মণ হতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকলকেই দেওয়া যেতে পারে।

২১। যা কিছু দেখছো—সব ঠাকুরের।

২২। ঠাকুরের ইচ্ছাই বলবতী। তোমার যেটুকু দরকার, তিনি তাই দিচ্ছেন। এর জন্যে মনে দুঃখ না ক'রে, আনন্দ করো।

২৩। কিছু না করলে, শরীর-মন পবিত্র হবে কিসে? দশের সেবা করো।

২৪। আমার কাছে চাইবে না?—আমি মা।

২৫। তিনি সব করাচ্ছেন বটে, কিন্তু সেরূপ বোধ থাকলে তো হয়? লোকে অহংকারে মত্ত হয়ে মনে করে, আমিই সব ক'রছি; তাঁর ওপর নির্ভর করে না। যে তাঁর ওপর নির্ভর করে, তিনি তাকে সকল বিপদ হতে রক্ষা করেন।

২৬। মন যদি এক স্থানে শান্তিতে থাকে, তবে তীর্থভ্রমণের কী দরকার?

২৭। ঠাকুরের কাজ ক'রবে আর সাধন-ভজন ক'রবে। কিছু কিছু কাজ ক'রলে, মনে বাজে-চিন্তা আসে না। একাকী ব'সে থাকলে, অনেকরকম চিন্তা আসতে পারে।

২৮। 'সাধন' মানে—তাঁর পাদপদ্ম সর্ব্বদা মনে রেখে তাঁর চিন্তাতে মনকে ডুবিয়ে রাখা। তাঁর নাম জপ ক'রবে।

২৯। জীবনের উদ্দেশ্য—ভগবান লাভ করা ও তাঁর পাদপদ্মে সর্ব্বদা মগ্ন হয়ে থাকা।

৩০। সাধুর রাগদ্বেষ থাকবে না; সব সহ্য করা সাধুর দরকার।

৩১। মন যদি আপনিই স্থির হয়, তবে প্রাণায়ামের আর কী দরকার?

৩২। মন বসুক, না বসুক, জপ ক'রবে।

৩৩। তিনি জীবজন্তু সবই হয়েছেন বটে, তবে সংস্কার ও কর্ম্ম অনুসারে সকলে নিজ নিজ কর্ম্মফল ভোগ করে। সূর্য্য এক, কিন্তু জায়গা ও বস্তু ভেদে তার প্রকাশ ভিন্ন ভিন্ন রকমের।

৩৪। সর্ব্বদা সদসদ্ বিচার ক'রবে।

৩৫। সন্ন্যাসীর গৃহস্থের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখা অত্যন্ত খারাপ। বিষয়ী লোকদের বাতাস-লাগাও খারাপ।

৩৬। আসন, প্রাণায়াম ক'রলে সিদ্ধাই হয়। সিদ্ধাই লোককে পথভ্রষ্ট করে।

৩৭। সাধুর রাস্তা বড় পিছল। পিছল পথে চলতে হলে, সর্ব্বদা পা টিপে চলতে হয়। সন্ন্যাসী হওয়া কি মুখের কথা? সাধু মেয়ে-মানুষের দিকে ফিরেও তাকাবে না। চলবার সময়ে পায়ের বুড়ো-আঙুলের দিকে লক্ষ্য রেখে চলবে। সাধুর গেরুয়া-কাপড় কুকুরের বগলসের মতো তাকে রক্ষা ক'রবে—কেউ তাকে মারতে পারবে না। সাধুর সদর রাস্তা—সকলেই তার পথ ছেড়ে দেয়।

৩৮। সৎ ইচ্ছাগুলিই পূর্ণ হয়।

৩৯। মন্দ কাজে মন সর্ব্বদা যায়। ভালো কাজ ক'রতে চাইলে, মন তার দিকে এগোতে চায় না। সেজন্য ভালো কাজ ক'রতে গেলে আন্তরিক খুব যত্ন ও রোখ চাই।

৪০। ধ্যান না হয়, জপ ক'রবে। 'জপাৎ সিদ্ধি'। জপ ক'রলেই সিদ্ধিলাভ ক'রবে।

৪১। যখন গাছ চারা থাকে তখন চারিদিকে বেড়া দিতে হয়। বড় হলে, ছাগল-গরুতেও কিছু ক'রতে পারে না। নির্জ্জনে সাধন করা খুব দরকার। যখন মনে কোন বিষয় উদয় হবে, জানবার ইচ্ছা হবে—তখন একাকী কেঁদে-কেঁদে তাঁর নিকট প্রার্থনা ক'রবে। তিনি সমস্ত মনের ময়লা ও কষ্ট দূর ক'রে দেবেন, আর বুঝিয়ে দেবেন।

৪২। ভোগের জিনিস সব নিয়ে থাকলে, তার ভোগের উপকরণও সব এসে থাকে। বাবা, কাঠেরও যদি মেয়েমানুষ হয়, তবে সেদিকে চাইবে না—সেদিক দিয়ে যাবে না।

৪৩। মা'র পথের সঞ্চয় করবার সাহায্য ক'রতে পারো, তবেই তো ঠিক ছেলের কাজ ক'রলে। তাঁর বুকের রক্ত খেয়ে যে এত বড় হয়েছ, কত কষ্ট ক'রে তোমায় মানুষ ক'রেছেন, তাঁর সেবা করা তোমার সবচেয়ে বড় ধর্ম্ম জানবে। তবে তিনি যদি ভগবানের পথে যেতে বাধা দেন, তখন অন্য কথা। কিন্তু সাবধান, মা'র সেবা ক'রছি ভেবে, বিষয় নিয়ে মেতো না।

৪৪। জগতের যত অনর্থের মূল টাকা। তোমাদের কাঁচা-বয়স, হাতে টাকা থাকলেই মন লোভ দেখাবে। সাবধান!

৪৫। ঠাকুরের একখানি ছবি নিজের কাছে রেখো, আর জানবে, তিনি সত্য। ঠাকুর তোমার কাছে রয়েছেন--তাঁর কাছে কেঁদে-কেঁদে বলো, 'ঠাকুর! আমায় তোমার দিকে নাও, আমায় শান্তি দাও।' এরকম ক'রতে ক'রতে, তোমার প্রাণে শান্তি আপনি আসবে। ঠাকুরে ভক্তি রেখো। যখনই কষ্ট হবে, ঠাকুরকে জানিও।

৪৬। কৃপা বড় কথা।

৪৭। সত্যের চেয়ে কিছুই নাই।

৪৮। যে সময়ে বলে, সে বান্ধব। অসময়ে 'আহা' ক'রলে কি হয়?

৪৯। তোমাদের ভয় কী? তাঁর শরণাগত হয়ে থাকবে, আর সর্ব্বদা জানবে যে, ঠাকুর তোমার পিছনে আছেন।

৫০। কলিতে মনের পাপ- পাপ নয়।

৫১। যেখান দিয়ে যাবে, তার চতুর্দ্দিকে কী হ'চ্ছে-না-হ'চ্ছে সব দেখে রাখবে। আর, যেখানে থাকবে সেখানকারও সব খবরগুলি জানা থাকা চাই; কিন্তু কাউকে কিছু বলবে না।

৫২। সব বাঁশ, শিমুলগাছ—চন্দনের কাছে থাকলে কী হবে? সারবান বৃক্ষ হওয়া চাই।

৫৩। যেভাবে ও যেমন ইচ্ছা হয়, ঠাকুরে একটু মন রেখে ক'রবে। তাতেই সব মিলবে।

৫৪। প্রথম মনের কথা শুনবে। প্রথম মনই গুরু।

৫৫। এই তিনটির সম্বন্ধে খুব সাবধানে চলতে হয়। প্রথম ঃ নদীর তীরে বাসস্থান; কোন্ সময় নদী হুস ক'রে এসে বাসস্থান ভেঙে নিয়ে চ'লে যাবে। দ্বিতীয় ঃ সাপ; দেখলেই খুব সাবধানে থাকতে হয়—কখন এসে কামড়ে দেবে তার ঠিক নেই। তৃতীয় ঃ সাধু; তাঁদের কোন্ কথায় বা মনের ভাবে গৃহস্থের অমঙ্গল হতে পারে, তা তুমি জান না। তাদের ভক্তি করতে হয়; কোনও জবাব ক'রে অবজ্ঞা দেখানো উচিত নয়।

৫৬। যে যত বেশী সাধন-ভজন ক'রবে, সে তত শিগ্‌গির দর্শন পাবে।

৫৭। সর্ব্বদা সাধন-ভজন ক'রতে পারোনা ব'লেই, ঠাকুরের কাজ ভেবে কাজ করা দরকার।

৫৮। ঠাকুর সাক্ষাৎ ভগবান।

৫৯। আমার কাজ ক'রছো, ঠাকুরের কাজ ক'রছো -এ কি তপস্যার চেয়ে কম হ'চ্ছে ?

৬০। অসুখ হলে, ঠাকুরদের মানত ক'রলে বিপদ কেটে যায়; আর, যার যা প্রাপ্য, তাকে তা দিতে হয়।

৬১। সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর নাম ক'রবে।

৬২। দেশাচার মানতে হয়।

৬৩। বিপদ যে তোমাদের আসবে না, তা নয়; ও তো আসবেই—তবে ও থাকবে না; দেখবে, পায়ের তলা দিয়ে জলের মতন চলে যাবে।

৬৪। ঠাকুরকে আপনার ভেবে বলবে, 'এসো, বোসো, নাও, খাও।' আর ভাববে, তিনি এসেছেন, বসেছেন, খাচ্ছেন। আপনার লোকের

কাছে কি মন্ত্রতন্ত্র লাগে ? ওসব হ'চ্ছে, যেমন কুটুম এলে তাদের আদর-যত্ন ক'রতে হয়, সেইরকম। আপনার লোকের কাছে ওসব লাগে না। তাঁকে যেমন ভাবে দেবে, তেমনি ভাবেই নেবেন।

৬৫। তাঁর নাম যেটুকু পেয়েছ, ঐটুকুই করো দেখি। ঐটুকু ক'রতে পারলে সব হবে।

৬৬। দোষ তো মানুষ ক'রবেই। ও দেখতে নেই। ওতে নিজেরই ক্ষতি হয়। দোষ দেখতে-দেখতে শেষে দোষই দ্যাখে।

৬৭। শরণাগত হয়ে পড়ে থাকতে হয়, তবে তো তাঁর কৃপা হয়।

৬৮। ঠাকুর একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা এটি সর্ব্বদা মনে রাখবে। এটি ভুললে, সব ভুল।

৬৯। অবিশ্বাস তো আসবেই। সংশয় আসবে, আবার বিশ্বাস হবে। এইরকম ক'রেই তো বিশ্বাস হয়। এইরকম হতে হতে পাকা বিশ্বাস হয়।

৭০। ভক্তি—ক'রতে ক'রতে হবে।

৭১। শুধু তাঁর কৃপাতে ভগবান লাভ হয়। তবে ধ্যান-জপ ক'রতে হয়। তাতে মনের ময়লা কাটে। পূজা, জপ, ধ্যান—এসব ক'রতে হয়। যেমন ফুল নাড়তে-চাড়তে ঘ্রাণ বের হয়, চন্দন ঘষতে-ঘষতে গন্ধ বের হয়, তেমনি ভগবৎতত্ত্ব আলোচনা ক'রতে-ক'রতে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়। নির্ব্বাসনা যদি হতে পারো, এক্ষুনি হয়।

৭২। যারা পরমার্থ খুব চিন্তা করে—তাদের মন খুব সূক্ষ্ম, শুদ্ধ হয়ে যায়। সেই মন যা ধরে, সেটাকে খুব আঁকড়ে ধরে। তাই আসক্তির মতো মনে হয়। বিদ্যুৎ যখন চমকায়, তখন সারসিতেই লাগে, খড়খড়িতে লাগে না।

৭৩। মনই শুচি—অশুচি। বাইরে অশুচি ব'লে কিছু নেই।

৭৪। যো-সো ক'রে আগে উদ্দেশ্য-সাধন ক'রে নিতে হয়।

৭৫। আগের কাজ আগে ক'রতে হয়।

৭৬। শুধু পড়লে কি আর বিশ্বাস হয়? বেশী পড়লে গুলিয়ে যায়।

৭৭। ধ্যান-জপের একটা নিয়মিত সময় রাখা খুব দরকার। কারণ, কখন যে ক্ষণ বয়, বলা যায় না। ও হঠাৎ এসে উপস্থিত হয়—টের পাওয়া যায় না। সেজন্য যতই গোলমাল হোক, নিয়ম রাখা খুব দরকার।

৭৮। সন্ধিক্ষণেই তাঁকে ডাকা প্রশস্ত। রাত যাচ্ছে দিন আসছে, দিন যাচ্ছে রাত আসছে এই হ'ল সন্ধি। এই সময়ে মন পবিত্র থাকে।

৭৯। যেমন ঝড়ে মেঘ উড়িয়ে নেয়, তেমনি তাঁর নামে বিষয়-মেঘ কেটে যাবে।

৮০। মহামায়া পথ ছেড়ে না দিলে, কার কী সাধ্য? হে জীব! শরণাগত হও, কেবল শরণাগত হও। তবেই তিনি দয়া ক'রে পথ ছেড়ে দেবেন।

৮১। সামান্য কাজটিও শ্রদ্ধার সঙ্গে ক'রতে হয়।

৮২। মাথা যে গুরুর স্থান, মাথায় কি পা দিতে আছে?

৮৩। কাজকর্ম্ম ক'রবে বইকি। কাজে মন ভালো থাকে। তবে জপ-ধ্যান, প্রার্থনার বিশেষ দরকার। অন্ততঃ সকাল-সন্ধ্যায় একবার বসতেই হয়। ওটি হ'ল যেন নৌকার হাল। সন্ধ্যাকালে একটু বসলে, সমস্ত দিন ভালোমন্দ কী ক'রলাম, না ক'রলাম—তার বিচার আসে। তারপর গতকালের মনের অবস্থার সঙ্গে আজকের অবস্থার তুলনা ক'রতে হয়। পরে জপ ক'রতে-ক'রতে ইষ্টমূর্ত্তির ধ্যান ক'রতে হয়। ধ্যানে প্রথমে মুখটি আসে বটে, কিন্তু পা থেকে সমস্ত অঙ্গটি সাক্ষাৎ ধ্যান ক'রতে হয়। কাজের সঙ্গে সকাল-সন্ধ্যা জপ-ধ্যান না ক'রলে, কী করছো, না করছো—বুঝবে কী ক'রে?

৮৪। ভালবাসাই তো আমাদের আসল—ভালবাসাতেই তো তাঁর সংসার গ'ড়ে উঠেছে।

৮৫। এক কথায় বলতে গেলে, নির্ব্বাসনা প্রার্থনা ক'রতে হয়। কেননা বাসনাই সকল দুঃখের মূল, বারবার জন্মমৃত্যুর কারণ, আর মুক্তিপথের অন্তরায়।

৮৬। সেবাপরাধ একটা আছে বটে। সেটা হ'চ্ছে—সেবা ক'রতে-ক'রতে অধিকার পেয়ে অহংবুদ্ধি বেড়ে গেলে, সে তখন পুতুলের মতো নাচাতে চায়। উঠতে, বসতে, খেতে সব-তাতেই কর্ত্তা। সেবার ভাব আর থাকে না। যারা নিজের দেহসুখ ভুলে, তার সুখদুঃখ নিজের সুখ-দুঃখ জ্ঞান ক'রে সেবা করে, তাদের ওরূপ হবে কেন?

৮৭। মানুষের প্রত্যেক খুঁটিনাটি কাজটিতে শ্রদ্ধা দেখলে, ঠিক-ঠিক মানুষটি চেনা যায়।

৮৮। সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর সন্ধ্যার সময় একটু কিছু খেয়ে জল খেলে, শরীরটা বেশ স্নিগ্ধ হয়। তারপর জপে-তপে বা যে-কোন কাজে মনটি বেশ স্থির হয়ে বসে।

৮৯। ভগবানে মতি হওয়াই আসল।

৯০। ঠাকুর এবার এসেছেন ধনী, নির্ধন, পণ্ডিত, মূর্খ সকলকে উদ্ধার ক'রতে। মলয়ের হাওয়া খুব বইছে। যে একটু পাল তুলে দেবে, শরণাগত হবে, সেই ধন্য হয়ে যাবে। এবার বাঁশ ও ঘাস ছাড়া, যার ভিতরে একটু সার আছে, সেই চন্দন হবে। তোমাদের ভাবনা কি? তোমরা আমার আপনার লোক। তবে কি জান, বিদ্বান সাধু—যেন হাতির দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো।

৯১। আমাদের যা কিছু, সবার মূল ঠাকুর। তিনিই সব। যা কিছু করোনা কেন, তাঁকে ধ'রে থাকলে কোন বেচাল হবে না।

৯২। জপ-সংখ্যা, কর-গণনা—এসব শুধু মন আনবার জন্য। মন এদিক-ওদিক যেতে চায়, তবু ঐসবের দ্বারা এদিকে আকৃষ্ট হয়। যখন জপ ক'রতে-ক'রতে ভগবানের রূপ-দর্শন হয়, ধ্যান হয়—তখন জপও থাকে না। ধ্যান হ'ল তো সবই হ'ল।

৯৩। মানুষ তো ভগবানকে ভুলেই আছে। তাই যখন-যখন দরকার, তিনি নিজে এক এক বার সাধন ক'রে পথ দেখিয়ে দেন। এবার দেখালেন ত্যাগ। তিনি শতবর্ষ ছেলেপুলে নিয়ে থাকবেন বলেছেন।

৯৪। মন চঞ্চল, তাই প্রথম-প্রথম মন স্থির করবার জন্য একটু একটু নিশ্বাস বন্ধ ক'রে ধ্যানের চেষ্টা ক'রতে হয়। তাতে মন স্থির হবার সাহায্য করে। কিন্তু ওভাবে বেশী ক'রতে নাই; মাথা গরম হয়। ভগবান-দর্শন বলো, ধ্যান বলো—সবই মন। মন স্থির হলে, সবই হয়।

ঐ পৌষের মেঠো সাঁঝ চলে কিষাণ-বধূর মতো।
দুই কানে তার রূপশালী মঞ্জরী
তার কাছে শোনো এ-গাঁয়ের রূপকথা
এই বেণুবন আজো ওঠে মন্থরি।

ভীরু কিশোরীর লজ্জা-জড়ানো ঐ-যে নিটোল তারা
দিপ্ দিপ্ করি দিগন্তিকার তুলসীর মূলে কাঁপে
মনে কি হয়না চাঁদ-ভাঙা কারো জোছনা-রঙীন হাতে
পরশ পেয়ে ও টলমল খুশী চাপে।

গোলাপের বুকে বন্দী ভ্রমরে কাঁদানো যে তার মুখ
জয়রামগাঁর সেই ত্রয়োদশী বালা
তার হাসি নয় আলেয়ার মোনালিসা
তারে কমলিনী ডাকে চুপে মধুমালা।

ফল্গু বুকের উচ্ছাস লুকায়ে ঐ-যে তটিনী কাঁদে
শোনো ওগো কবি আমোদর ওর নাম
রাখালী বাঁশীতে আজো বাজে তার ছায়া-নামা বালুতটে
সে বিরহিণীর গাগরী-ভাসানো গান।

দয়িত যে তার মানিক-বনের উদাসীয়া অভিমানী
একটি রাতের মালার শপথ ভুলে
চ'লে গিয়েছিল পলাতকা ছায়া ফেলে
দু'চরণে দলি একটি স্মৃতির ফুলে।

সেই কিশোরীর ভ্রূলতার দোলে দুলিত গো বনলতা
সে চাহিলে ফিরে ভাঙিত অলির মান
সে বিছালে কেশ মেঘল সেতারে ধরিতো গো দিগ্‌বধূ
রেবার ছন্দে রূপমল্লারী তান।

সে চলিত ঘাটে আলতা-জড়ানো মঞ্জু-চরণ ফেলে
ভাবিত মরাল হবো নাকি মঞ্জরী
তার জলডুরী আঁচলের বাস পেলে
যত ঢেউ এসে কূলেই জমাতো ভিড়।

হোথা বুঝি ছিল কাপাসের ক্ষেত মাঠ-ভাঙা চাঁপা-রোদে
সে তুলিতো তূলা অচিন সখীর সাথে
ছুই সহেলীর মনে-মনে-কওয়া হারানো দিনের কথা
মুকুতার মতো জমিতো গো আঁখি-পাতে।

ঐ-যে শ্যামার মেঠোল আঙিনা সজিনার ফুলে ধোওয়া
হোথা বসি মেয়ে কাটিতো কাপাস-সুতা
কোন্ ভাবনার রাঙা সুতাগুলি মনে
জড়ায়ে বিবশ করিতো গো তনুলতা।

ভাঙা বাতায়নে নিভায়ে পদীপ চাহি সে আকাশ-পানে
প্রিয়জন-কথা কহিতো মনের সাথে
ছায়াপথে কত ছুটে-আসা তারা থমকি দাঁড়ায়ে চুপে
তার অনুলিপি লিখে নিতো জোছনাতে।

আঁচল বিছায়ে সে লুটাতো ভুঁয়ে দীঘল শ্বাসের ঘায়ে
প্রবাসী দখিনা ফিরিতো গো বৈরাগী
সে ঢাকিলে মুখ ব্যর্থ শবরী নিশি
উছসি কাঁদিত তার পায়ে মুখ ঢাকি।

এইখানে তার মিলন-বিরহ গোধূলি-ঊষার মতো
ছুটি দিগন্ত রাঙায়ে দিয়েছে চুপে
হাসি-কান্নার ছুটি ঢেউ শুধু জোয়ার-ভাটার টানে
স্মৃতির প্রবাল জমায় গহিন বুকে।

সে সাগরে তবু ছিলনা উচ্ছাস ক্ষোভের উপলাঘাতে
তার হিয়া ছিল নিটোল ধৈর্যে আঁকা
এ রূপকথার রূপকার হতে তাই
কাঁদে লেখনীর মৌন বলাকা-পাখা।

মরাল-দূতেরে ফিরায়েছিল সে ছিলনা ভ্রমর-দূত
তার অশ্রুর দূতীরও ছিলনা ভাষা
বিরহ-পাথার ঠেলিয়া সে শুধু রেখে যেতো প্রিয়-দ্বারে
প্রতিদান-হীন একখানি ভালবাসা।

বিষয়-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রার্থনা : আমায় নিখাদ করো	১
স্বামী যোগানন্দ	১
শ্যামাসুন্দরীর দর্শন	২
শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন	৩
জয়রামবাটীর বর্ণনা	৩
মায়ের আবির্ভাব	৭
মায়ের শৈশবকাল	৮
শিশু সারদার বর-নির্ব্বাচন	১১
দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সাধনা	১৩
কামারপুকুর আসা, 'কুটো-বাঁধা' কনের ইঙ্গিত	১৫-১৬
বিবাহ স্থির	১৭
বিবাহে মাঙ্গলিক-সুতা ভস্মীভূত	১৮
বধূর গয়না খুলে নেওয়া ; নীলমাধবের রোষ	২০
গদাধর ফিরে যান দক্ষিণেশ্বরে	২১
জয়রামবাটীতে মা নিত্যকর্ম্মে লীন	২২
মায়ের অনুরূপ দিব্যকুমারী	২৩
বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষে	২৪
কামারপুকুরের ডাক	২৫
স্নানলীলা ; আটটি দিব্যকুমারী	২৬
কামারপুকুরে ঠাকুর ও কিশোরী জননী	২৭
ঠাকুরের পাগল খ্যাতি	২৯
দক্ষিণেশ্বরের পথে পিতার সাথে মা	৩২
পথে জ্বর ও পান্থশালায় কালো-মেয়ের দর্শন	৩৩
দক্ষিণেশ্বরে মায়ের প্রথম আসা	৩৬
মায়ের সম্বন্ধে ঠাকুরের উক্তি	৩৮
মাকে ষোড়শী-পূজা	৩৯
শ্রীরামচন্দ্রের মৃত্যু	৪২
শম্ভু মল্লিক, বিশ্বনাথ উপাধ্যায়	৪২
সিংহবাহিনীকে জাগানো	৪৪
শ্যামাসুন্দরীর স্বপ্নে জগদ্ধাত্রী-দর্শন	৪৬
দেবী-মূর্ত্তি-গড়ার নির্দ্দেশ	৪৭
পরপর তিনবার জগদ্ধাত্রীপূজা	৪৮
জগদ্ধাত্রী ও সারদা-মাকে 'এক' দর্শন	৪৯
জনৈকা কাশীবাসিনী	৫০
দক্ষিণেশ্বরে হৃদয়-এর দুর্ব্ব্যবহার	৫২
সারদা-মা দক্ষিণেশ্বরের পথে	৫৪
তেলোভেলোর ডাকাত-বাবা	৫৬
দেওয়ানগঞ্জে ভক্ত মোদকের গৃহে ঠাকুর ও মায়ের আকস্মিক আগমন	৬০
অচেনা ভৈরবী—সরমা-ভাবের সাধিকা	৬৩
জননীর ভাবের উচ্ছল প্রকাশ	৬৬
কুমীরের পিঠে পা	৬৯
আঁধার ঘাটে জ্যোতিধারা	৭০
বালবিধবা নন্দিনী	৭১
নন্দিনীর ঝুলন-লীলা মায়ের সঙ্গে	৭২
নরেন ও অন্য ভক্তদের আবদার ও সেবা-তৃপ্তি	৭৪
প্রথমদিকে ঠাকুরের জন্মোৎসব	৭৬

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
যোগীন-মা'র শয্যারচনা	৭৬	বৃন্দাবন-পরিক্রমা শেষ ও খাজাঞ্চী কর্তৃক টাকা বন্ধ	১১৩
ত্রিগুণাতীতের জন্য চার পয়সা চাওয়ার আগেই রাখা	৭৭	শ্রীঠাকুরের দর্শন	১১৪
অন্তরে অন্তরে গোপন লীলা	৭৭	বুড়োগোপাল সঙ্গে গয়াধামে	১১৭
লাটুকে ঠাকুরের নির্দ্দেশ	৭৮	মঠের জন্য আকূতি	১১৭
ঠাকুরের স্বীয় পটমূর্ত্তি-পূজা ও উক্তি	৮০	নীলাম্বরবাবুর বাসায় মায়ের সমাধি	১১৮
লক্ষ্মীদিদির কথা	৮১	পুরী-দর্শন	১১৮
স্ত্রীভক্তের বিভ্রান্ত অবস্থা ; রঙ্গলীলা	৮৩	বলরাম-মন্দিরে মায়ের সমাধি	১২০
শোকগ্রস্তা গৌরের মাকে শান্তিদান	৮৪	ঘুস্থুড়ির বাড়িতে মায়ের কাছে বিবেকানন্দ	১২১
শতদলবাসিনীকে কৃপা	৮৫	গিরিশের মাতৃচরণ-দর্শন	১২১
মায়ের মর্য্যাদার আসন ঠাকুরের চোখে	৮৬	নীলাম্বরবাবুর বাসায় অবস্থানকালে গঙ্গাবক্ষে ঠাকুরের দর্শন	১২১
রূপদর্পিতা কুলবধূ	৮৭	নাগমহাশয়ের কথা	১২৩
লছমীনারায়ণ মারোয়াড়ী	৮৯	পঞ্চতপা অনুষ্ঠান	১২৬
গৌরীমা'র দূতিয়ালি	৯০	গোপালবিগ্রহের পূজা-প্রতিষ্ঠা	১২৮
গোপালের মা	৯২	মায়ের চরণে বিবেকানন্দ	১২৯
গিরিবালা দেবী	৯৪	বেলুড়ের প্রাণপ্রতিষ্ঠা	১৩১
পেনেটীর উৎসবে মায়ের না-যাওয়া	৯৬	'নিবেদিতা বিদ্যালয়'-প্রতিষ্ঠা ও নিবেদিতার সঙ্গে কথা	১৩২
শ্রীঠাকুরের অসুস্থতা	৯৮	স্বামী ত্রিগুণাতীতের অপূর্ব্ব সেবা	১৩৫
'কল্পতরু' দিবসে	৯৯	রাধুর ভার নিলেন মা	১৩৭
মা তারকেশ্বরে	১০০	নীলমাধবের প্রয়াণ	১৩৯
বিরহলীলা	১০১	জননী শ্যামাসুন্দরীর কথা	১৪০
বৃন্দাবনে মা	১০৪	গিরিশের চণ্ডীমণ্ডপে দুর্গাপূজা— সন্ধিক্ষণে মায়ের আগমন	১৪৩
বৃন্দাবনে গৌরীমা'র সঙ্গে	১০৬	'উদ্বোধন'-এর প্রতিষ্ঠা	১৪৬
যমুনায় ঝাঁপ দিতে উদ্যতা,— 'আমিই রাধা'	১০৮	মায়ের দ্বারী শরৎমহারাজ	১৪৬
ব্রজধামে সন্ন্যাসীর উক্তি	১০৮	কোয়ালপাড়া মঠ ; কেদার দত্ত	১৪৭
শ্রীমন্দিরে রাধারমণের দর্শন	১০৮		
যোগানন্দের দীক্ষা	১০৯		
মায়ের মধ্যে ঠাকুরের আবেশ	১১১		

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভক্ত ছেলেদের সেবা : 'আমি সত্যি মা'	১৪৯
রোদে হেঁটে-আসা ভক্তের জ্বালা মায়ের অঙ্গে	১৫৩
জনৈক সন্ন্যাসী ছেলেকে চলে যেতে নিষেধ করা	১৫৪
সন্তানের মাথার গুরুভার-লাঘব	১৫৫
গৌরীমা'র বসন্ত-উপশম	১৫৬
বিদেশিনীর প্রার্থনা-পূরণ	১৫৭
সন্তানের জন্য প্রসাদ রোদে শুকানো	১৫৯
দীন ব্রাহ্মণের নৈবেদ্য	১৬১
উড়িষ্যাবাসী ভক্তকে দোল-উৎসবে কৃপা	১৬১
মা'র হাতে জল সুধাতুল্য	১৬২
ঝড়বৃষ্টির মধ্যে ভক্তের আগমন মা স্বপ্নে জানতে পারেন ; ভুক্তাবশিষ্ট পাতে প্রসাদ দিলেন	১৬৩
কোয়ালপাড়ায় কৃষক-ভক্তকে কৃপা	১৬৩
চাকরের চুরির অপরাধের ক্ষমা	১৬৫
ডাকাত আমজাদকে স্নেহকৃপা	১৬৫
অনাবৃষ্টিতে প্রার্থনা	১৬৭
ডাঃ হ্যালক, মিস্ গ্রে মায়ের কাছে	১৬৯
ডাঃ কাঞ্জিলালের পত্নীর প্রার্থনা	১৬৯
সন্দিগ্ধ সন্তানকে স্বরূপের পরিচয়	১৭০
ভক্ত সুরেন্দ্রকুমার সেনকে কৃপা	১৭১
হরিশ উন্মাদকে দমন	১৭৪
মায়ের রুদ্ররূপ	১৭৬
ভক্ত নিশিকান্তকে সরস্বতীরূপে দর্শন-প্রদান	১৭৭
বিষ্ণুপুর স্টেশনে কুলী রমণীকে কৃপা	১৮১
নেপালী সন্ন্যাসিনীর নিকট মায়ের সন্তানের আসা	১৮২
ভক্ত দুর্গেশচন্দ্রের স্বপ্নে সুরেনের চিঠি	১৮৫
দীনার্ত ভক্তকে দর্শন-দান ও কৃপা	১৮৬
অন্তর্যামিনীর করুণাময়ী রূপ	১৮৮
পাগলী গায়িকার কণ্ঠে গান শুনে মায়ের প্রেমাশ্রু	১৯০
পদ্মবিনোদের কথা	১৯১
দিব্য উন্মাদিনী	১৯৫
নামগোত্রহীনা ভৈরবীর মাকে দেখে গান	১৯৬
নহবতে মায়ের গান	১৯৭
দুটি দীক্ষাপ্রার্থী ছেলেকে ত্রিরাত্রি-বাসের নির্দেশ	১৯৮
ঢাকের আওয়াজে ভক্ত কেদারের বিরক্তি	১৯৯
মা ও ঠাকুর অভেদ	১৯৯
মাতৃহারা বালক-ভক্তের মাকে দর্শন-- যুগলরূপে, কালীরূপে ও রাধারূপে	২০০
যতীন্দ্র মিত্রের কীর্ত্তন	২০১
দীক্ষালগ্নে ইষ্ট-নির্দেশ	২০৩
অশান্ত ছেলেকে শান্ত করা	২০৪
তাপিত পতিতদের প্রতি মায়ের আশ্বাসবাণী ও কৃপা	২০৫
দেবেন্দ্রনাথকে দীক্ষাদান ও পুনঃ ব্রাহ্মণত্ব-প্রদান	২০৯
রামেশ্বরের পথে পাড়ি	২১০

জননী সারদেশ্বরী

বিষয়	পৃষ্ঠা
মাদ্রাজে মায়ের অবস্থান	২১১
মাদুরায় মাদ্রাজী ভক্তের গৃহে	২১৩
রামেশ্বরতীর্থে মা	২১৪
রামনাদরাজের রত্নদেউলে	২১৬
বাঙ্গালোর-মঠে	২১৭
মায়ের ধ্যানমগ্ন মূর্ত্তি ও রামকৃষ্ণানন্দের স্তুতি	২১৭
বেলুড়-মঠে মায়ের আগমনে আনন্দ	২১৮
রাখাল-মহারাজের সমাধি	২১৯
ভক্তের স্রোত ও রাখাল-মহারাজ	২২১
নিবেদিতার শিক্ষায়তনে মা	২২২
রামকৃষ্ণানন্দের শেষলগ্নে	২২৪
মঠে দুর্গাপূজা	২২৫
বারাণসী-তীর্থে মা	২২৭
নানকপন্থী সাধু ও চামেলীপুরীকে দর্শন	২৩০
গোলাপ-মাকে সারদা মা ভাবলেন কাশীবাসিনী	২৩০
ভিখারিনী মেয়ের নিবেদন-গ্রহণ	২৩২
জয়রামবাটীতে ফিরে এলেন মা	২৩৩
মায়ের ভ্রাতৃজায়া সুবাসিনী	২৩৪
সন্ন্যাসীকে মর্য্যাদা-দান	২৩৫
গৌরীমা'র রসিকতা	২৩৭
ভিক্ষুক সন্ন্যাসীর কুটীর-নির্ম্মাণ	২৩৯
মাঝি-বউয়ের প্রতি সহানুভূতি	২৪১
দীন ভিখারীকে ফিরিয়ে এনে	২৪২
দীন ভক্তের গৃহে চরণধূলি	২৪২
মা ঘুঁটে দিচ্ছেন ; কর্ম্মলক্ষ্মী	২৪৩
বালক-ভাব ; রঙ্গময়ীর রঙ্গ	২৪৪
কথা ফ'লে যাওয়ার ঘটনা	২৪৬
কোয়ালপাড়ায় দর্শন ও সমাধি	২৪৭
শেষ জন্মতিথি	২৫০
মাতৃত্বের দিব্য আদর্শ	২৫১
অসুস্থ শরীরে কৃপা-বিতরণ	২৫২
রাধুর নিকট স্বরূপ-প্রকাশ	২৫২
বিদায়-গোধূলি	২৫৩
সারদা-মায়ের বাণী	২৫৭

—